

প্রকাশক : দেবকুমার বসু
বিশ্বজ্ঞান। ৯/৩, টেমার লেন কলকাতা-৯
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৮৯
আশ্বিন ১৩, ১৩৯৬
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা-আকাদেমির গ্রন্থপ্রকাশ-প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্য-সরকারের অর্থানুকূল্যে (আংশিক) প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ : গণেশ বসু
মুদ্রক : ননী বসাক। বসাক প্রিন্টার্স
১৯, প্রসাদ নিয়োগী লেন, ভদ্রেশ্বর, হুগলি

উৎসর্গ

নিপীড়িত লাঞ্ছিত অত্যাচারিত

কৃষক ও শ্রমিকদের

উদ্দেশ্যে

আমাদের কথা

বহুদিনের প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনা, সুষ্ঠু ও সুন্দর করার প্রয়াসে সামান্য পিছিয়ে আসতে হল নানাকারণে। ১. স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে আরও কিছু গুণিজনেব রচনা প্রত্যাশিত ছিল কিন্তু বারংবার পত্রপ্রেরণ ও সাক্ষাৎকথন সত্ত্বেও তাঁদের নিকট হতে প্রতিশ্রুত লেখা পাওয়া যায়নি। ২ কলেবর বৃদ্ধির বাস্তব দিকটি বিবেচনা করে, পরিশিষ্টের কিছু মূল্যবান অধ্যায় বাদ দেওয়া। দুটি বিষয়ই আমাদের কাছে বেদনার কারণ।

আমাদের সীমিত সাধ্যে, পুস্তকটিকে নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। প্রাণতোষদার সৃষ্টিশীল বিপুল রচনাসমূহের আবৃত দিকটি আমরা উন্মোচন করতে চেয়েছিলাম, পান্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল, ভাবীকালের গবেষকদের কাছে সেই তথ্যসমূহ গবেষণার কাজে লাগত এই গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব হল না ওই একই কারণে। সাহিত্য ব্যতীত, প্রাণতোষদার রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি এত ব্যাপক যে তার চিত্রটিও সমগ্রভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর সমগ্র জীবনের ইতিহাস লেখা একটি গ্রন্থের পরিসর যথেষ্ট নয়।

সরকারী অনুদান ব্যতীত, আমরা এ-কাজে অগ্রসর হতে পারতাম না যদিও প্রার্থিত অনুদানের অর্ধাংশও লাভ করিনি। এজন্য পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত হয়েছে।

এই পরিকল্পনাটিকে সার্থক করতে অনুজপ্রতিম স্নেহভাজন বসুমিত্র মজুমদার যেন কমপিউটার—প্রাণতোষদার বিপুল সংগ্রহশালা হতে অনায়াসে ও অল্পসময়ে তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় আরেক কমপিউটার—পৃথুল কলেবর এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বহুশ্রমে দ্রুতগতি অনুলিপি করে না-দিলে আমাদের কজের অসুবিধা হত। কাঞ্চন চৌধুরী হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় স ভদ্রা অধিকারী গৌতম ভড় ও বর্ণালী দত্ত স্বতোপ্রবৃত্ত সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন। প্রকাশক দেবকুমার বসুর সাহায্য ও পরামর্শ আমাদের পাথেয়-স্বরূপ। শিল্পী গণেশ বসুর আঁকা প্রচ্ছদ পুস্তকটিকে গৌরবদান করেছে। এঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

মুজফ্ফর আহমদের পত্রগুলির জন্য 'প্রাকৃত' পত্রিকার সৌজন্য স্বীকার করি ও সম্পাদক সত্রাজিৎ গোস্বামীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। পত্রগুলি বর্তমানে প্রাণতোষদার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। ছাপাখানার ভূতেরা মিছিলে বেরুলে এবং তাদের দাবি মানতে হলে, যেরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় তার ফলশ্রুতি পুস্তকটির স্থানে স্থানে দুর্লক্ষ্য নয়। শুদ্ধিপত্র না দেওয়ার কারণ, সুধী-পাঠক সেগুলি নিজগুণে সংশোধিতরূপে পাঠ করতে পারবেন—এই বিশ্বাস।

প্রচার-বিমুখ, নজরুল-সহচর, মুজফ্ফর আহমদের স্নেহধন্য, বিপ্লবী ও কবি প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে নানান দিক হতে আলোকিত করার সামান্য প্রয়াসই আমরা করেছি। তাঁর সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য সংগ্রহে ছিল—ভবিষ্যতে যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে সেগুলি সন্নিবিষ্ট করার বাসনা রইল। আমরা শুধু শ্রদ্ধা ও প্রণাম রাখলাম এই আজীবন সংগ্রামী আপোষহীন দৃঢ়চেতা উদার-হৃদয় ঋষিপ্রতিম মানুষটির চরণে।

যদিচ পুস্তকটির সঙ্গে জড়িত নয়,—আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। ৮৫-তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাতে আরেকটি আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা। এই অনুষ্ঠানে পুস্তকটির সাথে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের একটি আবক্ষ মূর্তি ওঁকে উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন অনেক মহৎ-হৃদয় ব্যক্তি। বিনা পারিশ্রমিকে মূর্তিটি নির্মাণ করেছেন শান্তিনিকেতনের সৌম্যেন অধিকারী। প্রাণতোষদার উপর তাঁর এই প্রগাঢ় শ্রদ্ধার প্রকাশে আমরা মুগ্ধ। উংঙক প্রামাণিক যাদব দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছেন সহযোগিতায়। এঁদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা বীজ রেখে গেলাম। ভাবীকালের গবেষকগণ তাকে মহীরূহ করে তুলুন। এ এক জাতীয় কর্তব্য। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় দেশের ও দশের কাছে সমধিক পরিচিত হোন, তাঁর জীবন ও চরিত্র ভাবী প্রজন্মের নিকট শিক্ষা ও আদর্শ হোক এই প্রার্থনা। তিনি আমাদের গর্বের মানুষ, ভবিষ্যকাল তাঁকে নিয়ে গর্বিত হোক। প্রাণতোষদার জয় হোক।

—সম্পাদকমণ্ডলী

সূচিপত্র

O সঙ্গসুধা O

O জীবন-চরিত O

'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।'

চিঠিপত্র

☐ অন্তর-অঙ্গণ ☐

☐ মুক্তোমাল' ☐

পরিশিষ্ট

☐ বিবিধ রতন ☐

বিপ্লবী প্রাণতোষ

☐ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ☐

প্রখ্যাত সাংবাদিক

এই বইতে যাঁর জীবনকথা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে, সৌভাগ্যক্রমে সেই প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার ছোটবেলা থেকেই পরিচয় ছিল। বর্তমানে তিনি একজন বিপ্লববাদী লেখক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত। অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গে ঘটনাচক্রে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে প্রাণতোষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি ভাগ্যান্বেষণে হুগলী চুঁচুড়াতে আমার কোন আত্মীয়ের বাড়িতে আসার পর প্রাণতোষের সঙ্গে আবার দেখা। সেটা আমার জীবনেও একটা ছোটখাটো অধ্যায়ের মতো, কেননা সেই সময় হুগলী চুঁচুড়াতে থাকতেন কাজী নজরুল ইসলাম। অবশ্য আমি নিজে তা জানতাম না। কিন্তু হুগলীতে প্রাণতোষের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পর প্রাণতোষ একদিন জিজ্ঞেস করলেন, কাজীদার কাছে যাবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজীদা? প্রাণতোষ জবাব দিলেন, কাজী নজরুল ইসলাম। আমি সবিস্ময়ে প্রাণতোষের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কেননা নজরুল ইসলাম তখন বাংলার যুবজন-চিত্তে প্রচন্ড ঝড় তুলেছেন। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নজরুল ইসলাম এখানে থাকেন নাকি? প্রাণতোষ বললেন, হ্যাঁ। আমার মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল এবং কিছুটা সংশয়ও আমার মনে দেখা দিল। কেননা, সদ্য গ্রাম থেকে আসা আমি একটি সাধারণ ছেলেমাত্র। বিদ্যে ছিল আমার ম্যাট্রিক পাশ করা পর্যন্ত। সেই আমি যাব নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করতে? প্রাণতোষ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনোভাব বোধহয় কিছুটা অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বললেন, চলো দেখা করে আসি। আমি প্রাণতোষের সঙ্গে চললাম। হাঁটতে হাঁটতে দূরে গিয়ে একটা দোতলা (কিন্তু দেড়তলা বলাই সংগত) বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। প্রাণতোষ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কাজীদা আছেন? উপর থেকে জবাব এল, কে? উত্তরে

প্রাণতোষ বললেন, আমি প্রাণতোষ। একবার নিচে নেমে আসুন। কাজী নজরুল ইসলাম নিচে নেমে এলেন। তাঁর বড় বড় চুল, বড় বড় চোখ, প্রতিভাদীপ্ত মুখের গড়ন দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মুগ্ধতাবোধের আরো কিছু বাকি ছিল। কারণ প্রাণতোষ জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো, আমার সঙ্গে কে এসেছেন? নজরুল ইসলাম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। আমি এতদূর হতভম্ব হয়ে গেলাম যে আজও আমার সেই বিহ্বলতা মনে আছে। যাঁর সঙ্গে আমার জীবনে কখনো দেখা হয়নি এবং আমি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত একটি বালকমাত্র তাকে কি করে নজরুল ইসলাম চিনতে পারলেন?

পরে অবশ্য আমি এই বিস্ময়কর ঘটনার কারণটা বুঝতে পেরেছিলাম। সেই সময় নজরুল ইসলামকে নিয়ে চারদিকে প্রচন্ড চাঞ্চল্য। উদ্‌বোধন পত্রিকার (রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত) প্রথম পৃষ্ঠায় আমার একটি কবিতা বেরিয়েছিল। ছাপার অক্ষরে সেইটি আমার প্রথম লেখা। আমার নাম বিবেকানন্দ এবং উদ্‌বোধন রামকৃষ্ণ মিশনের কাগজ। সুতরাং কিছুটা চাঞ্চল্য এবং ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হল। সেই সংখ্যাতে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়ে একটি প্রশংসামূলক আলোচনাও ছিল। ফলে স্বভাবতঃই নজরুলের দৃষ্টি সেই প্রবন্ধের উপর পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার কবিতাটিতেও। প্রাণতোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন, আমি এই লেখককে জানি। সেই সূত্র থেকেই বুদ্ধিমান কবি প্রাণতোষের সঙ্গে আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন, ওর নাম বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। সেদিন থেকে নজরুল ইসলামের আড্ডায় আমি প্রায় রোজই যেতাম। এরকম স্নেহশীল, উদার ও প্রাণবন্ত মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। নজরুলের কাছ থেকে কেউ লেখা চাইতে এলে তিনি আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন, ওর কাছ থেকে লেখা নাও না। ও তো Morning Sta (প্রভাতের শুকতারা)। কতবড় বিরাট হৃদয় হলে একজন অজ্ঞাত-পরিচয় কিশোর বালককে এতখানি স্নেহের দ্বারা গ্রহণ

করা যেতে পারে সে কথা ভেবে আজও বিস্ময় বোধ করি। তারপর থেকে আমি অবশ্য সাহিত্য, কবিতা ও সংবাদপত্র জগতে প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমি চিরকাল ঋণী থাকব এই রোম্যান্টিক ঘটনার জন্য। এই রোমাঞ্চকর কাহিনীর কথা আমি বহু সভায় বলেছি এবং লিখেছিও।

আমি জীবিকা ও জীবনের তাগিদে সংবাদপত্রে যোগ দিয়েছিলাম এবং আজও সাংবাদিকতার সঙ্গে কোন না কোন সূত্রে জড়িত আছি। আমার কবিতার বইও বেরিয়েছে। তবে সে সব কথা এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। কিন্তু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমি নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনার জন্য চিরকাল ঋণী থাকব। প্রাণতোষ পরবর্তীকালে একজন প্রচন্ড স্বদেশ-প্রেমিক ও দুঃসাহসী স্বাধীনতা-যোদ্ধা রূপে পরিচিত হয়েছেন। সেই প্রাণতোষবাবুর সম্পর্কে যে বইটি প্রকাশ করা হচ্ছে, আমি সেই বইয়ের লেখক ও উদ্যোক্তাদের এজন্য আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। আমার বয়স পাঁচ বছর আগেই আশি অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সংগলাভ ও পরিচয় আমি জীবনে কোনদিন ভুলব না। তিনি দেশের জন্য নির্যাতন ভোগ করেছেন, লড়াই করেছেন এবং নিজের লেখনীকে বিপ্লবমুখী করে পরিচালিত করেছেন। প্রাণতোষ আমার বন্ধু এবং সমবয়সী। তাঁর এই জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার উদ্যোগ দেখে আমি খুব আনন্দিত। আমরা দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন চাই। সেই পরিবর্তন যাঁরা আনতে চাইছেন, প্রাণতোষ সেই বিপ্লবীদের অন্যতম। আমি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে প্রাণতোষকে অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি, তাঁর এই জীবনী-গ্রন্থ এই প্রজন্মের বহু যুবককে প্রেরণা দেবে। উদ্যোক্তা-দের উদ্যম সার্থক হবে এই বিশ্বাস আমি রাখি।

আমার দাদা

☐ পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় ☐

সর্বভারতীয় কৃষকসভার পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহ-সভাপতি, কৃষক নেতা

১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের জনসভায় মাইকেল ডায়ারের পরিচালনায় নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ শ্রোতাদের সতর্ক না করে নৃশংস গুলিবর্ষণে ব্যাপক হত্যাকান্ড এবং তারপর সপ্তাহব্যাপী রাস্তায় রাস্তায় পথচারীদের বুকে হাঁটান, উলঙ্গ করে বেঁধে চাবুকে চাবুকে রক্তাক্ত করার চিত্রসহ বিবরণ, দাদা প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় "জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড" পুস্তিকা আমাকে আট বৎসর বয়সে পড়তে দেন। সেদিন থেকেই দাদার নেতৃত্বে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমি সাথী হই।

১৯২১ সালে দাদা গান্ধিজীর এক বছরেই স্বাধীনতা-লাভের আহ্বানে বিদ্যালয় ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পরিবারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে পৈতে ফেলে দেন। তখন তিনি হুগলী জেলার কংগ্রেসের আন্দোলনের এবং জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান হুগলী বিদ্যামন্দিরের একনিষ্ঠ কর্মী। বিদ্যামন্দির তখন সর্বক্ষণের কর্মী সিরাজুল হক, হামিদুল হক প্রভৃতি প্রধান স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠক। হুগলী বিদ্যামন্দিরে শিক্ষক দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সেন প্রভৃতির সঙ্গে বিপ্লবী অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ– সকলের "মাষ্টার মশাই", যাঁকে ঘিরে যুবক ও কিশোরের দল গোপনে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিশ্বস্ত যাদবপুর কলেজের কৃতী ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র হুগলীর বিজয় মোদক। বিজয় মোদক-এর বাবা বিনয় মোদক সরকারী ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তখন হুগলী জেলা-কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক।

১৯২২-এ বিপ্লবী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু' পত্রিকা, অগ্নিক্ষরা কাব্য ও প্রবন্ধে যুবকদের মাতিয়ে তুলেছে। দাদা

সেই কাগজ পাড়ায় পাড়ায়, পথসভায়, আবৃত্তি ও প্রচারের ব্যাপক বিক্রয়ের মধ্যে দিয়ে ছেলেদেরও স্বাধীনতা-সংগ্রামে আকৃষ্ট করতে থাকেন। ইতিমধ্যে বিজয় মোদকের পরিচালনায় মাস্টারমশাই ও ভূপতি মজুমদারের নেতৃত্বে হামিদুল হক, সিরাজুল হক, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন ঘোষ (এরিয়ান্স ক্লাবের স্বনামখ্যাত ইন্টার-ন্যাশনাল ফুটবল খেলোয়াড়) প্রভৃতিকে নিয়ে 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। দাদার পরিচালনায় কঠোর শৃঙ্খলা ও বহু পরীক্ষা দিয়ে আমি ১৩ বছরে 'যুগান্তর' দলে স্থান পাই।

১৯২৩ সালে কাজীদা (কাজী নজরুল ইসলাম) হুগলীতে এলে দাদা তাঁর সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হন। হুগলী-চুঁচুড়া বহু এলাকায় ও পরিবারে কাজীদার সঙ্গে কাজীদার বিপ্লবী কবিতা আবৃত্তি করার মধ্য দিয়ে, পরবর্তী যুগে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কাজীদার কবিতা আবৃত্তি করে বাংলার যুব-সমাজকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আকৃষ্ট করায় দাদা প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সে যুগে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। কবি জসীমুদ্দিন-সহ বহু কবি ও প্রগতিশীল সাহিত্যিক বন্ধুও তাঁর জুটেছিল। এসব তাঁর স্মৃতিকথা ছাড়া জানার উপায় নেই।

১৯২৮ সালে বিজয় মোদক-সহ উত্তরপাড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত, বিপ্লবী কর্মীর একদল মিলে হুগলী থেকে জাঙ্গীপাড়া পদযাত্রায় অনেকগুলি সুনির্দিষ্ট স্থানে ব্যায়াম প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত করা হয়। সেই যাত্রাপথে দাদার লেখা গান—

"ঘরে যে আর রইতে নারি
দিল যে ডাক বাইরে,
আমরা হেঁটে কাঁটার বনে
পথ করে দিই আয়রে।"

সেই ডাকে আজ পর্যন্ত পথ করে দেবার জন্য 'কাঁটার বনে' হেঁটে চলেছি ভবিষ্যতে সাফল্যের দৃঢ় আস্থা নিয়ে।

দাদা আত্মভোলা মানুষ, সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধে, ৮৩ বছর বয়স পূর্ণ হতে চলল, বিপ্লবী মানসিকতা অব্যাহত। অব্যাহত সকল

মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ দরদ। ছেলেবেলায় দেখেছি রাস্তার ধারে শীতে কাঁপছে একজন দুস্থ লোক। তাকে গায়ের চাদর দিয়ে এসেছে। আবার একদিন গরম কোট-টি কাউকে পথের মোড়ে অসহায় দেখে গায়ে চাপিয়ে দিয়ে এসেছে। বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজনে মাকে অনেক বুঝিয়ে সোনার আংটিটা দিয়ে এসেছে।

বিপ্লবী কর্মী হিসাবে কঠোর শৃঙ্খলা মানা, সময় সম্পর্কে ঘড়ির কাঁটার মত সুনির্দিষ্ট কাজ করা, কথা দিলে, বা দায়িত্ব পড়লে শত ঝড়-ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও দায়িত্ব পালন করার কাজে তাঁকে যে আদর্শরূপে দেখেছি, আমার জীবনে তার প্রভাব অবর্ণনীয়। সেই প্রেরণা আজও অব্যাহতভাবে পাওয়ার সৌভাগ্যে আমি গর্বিত।

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাণতোষ ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয়জন। প্রাণতোষ কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক হলেও, তাঁর দলের সক্রিয় কর্মী ও সদস্য না থাকলেও, প্রাণতোষ ও পরিতোষকে তিনি 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন। এটা ছিল ব্যতিক্রম। কারণ তিনি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, কর্মী ও সাধারণ ছোট-বড় সকল বয়সের ছেলে-মেয়েদের কাউকেও 'আপনি' ছাড়া বলতেন না। এরকম আরও দু-চার জন হয়ত ব্যতিক্রম ছিলেন।

সর্বশেষ, দাদা নিজের একমাত্র ভাইকে বিপ্লবের বেদীমূলে শুধু টেনে আনেননি, নিজের পরিবারের মধ্যে মা, মাসীদের বিপ্লবী কাজের মধ্যে টেনে এনেছিলেন। ভাইঝি, ভাইপো শহীদ প্রতিভা গাঙ্গুলী গণতান্ত্রিক মহিলা-সমিতির রাজ্য-কমিটির প্রভা চ্যাটার্জি, গীতা ঘোষাল ও তাদের ভাইয়েরা একটা বিপ্লবী পরিবেশে তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে কর্মজগতে আজও সক্রিয় কর্মী।

প্রিয় বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবী ও কবি প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও সংগ্রামের বিষয় নিয়ে পুস্তক রচনা করেছেন তার জন্য বিশেষ আনন্দিত। এই সঙ্গে তাকে আমার অভিনন্দন জানাই।

জন্ম : ১২ই চৈত্র, ১৩১৯ (ইং ১৯১২) মৃত্যু : ১লা চৈত্র, ১৩৯৫

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীগ্রন্থের জন্য

□ কনক মুখোপাধ্যায় □

সংসদ সদস্যা (রাজ্যসভা), গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী

জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রাণতোষদার একখানি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য কয়েকজন উৎসাহী তরুণ কর্মী উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রধান স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবি-সাহিত্যিক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের জীবন দেশপ্রেম, ত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা, সাহিত্যানুরাগ ও মহত্তর জীবনবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর মত মানুষের জীবনালেখ্য সাহিত্যের পৃষ্ঠায় বিধৃত করে রাখা আমাদের পক্ষে শুধু প্রয়োজনই নয়, একটি রাজনৈতিক কর্তব্যও।

প্রাণতোষদা অন্যান্য অনেক তরুণ দেশপ্রেমিকদের মতই একদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে, তারপর সামিল হয়েছিলেন কংগ্রেসের আন্দোলনে। দীর্ঘদিন তিনি কারাবাস করেছিলেন। অনেক দুঃখ কষ্ট, দায়িত্ব ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের আদর্শকে তিনি নিজের মধ্যে জাগ্রত রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মার্কসবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকে তিনি অন্তর থেকে নিজের গুরু বলে মনে করেছেন। তিনিই প্রথম নজরুল জীবনীকার।

প্রাণতোষদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৬০ সালে। পরিচয় হয় তাঁর ছোটভাই আমাদের পার্টির অন্যতম নেতা শান্তিদার (পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়ের) মাধ্যমে। তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপেই আমি তাঁর ভাবপ্রবণ আদর্শ-নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। তাঁর মুখে নজরুলের 'ঝড়' কবিতার আবৃত্তি শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। আমি

তাঁর শেওড়াফুলির বাড়িতে গিয়েও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হই। সেখানে দেখেছি তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে বিবিধ জ্ঞান-ভাণ্ডারের মূল্যবান সঞ্চয় আর তাঁর অসাধারণ অধ্যয়ন স্পৃহা। তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী সুষমা-বৌদি প্রাণতোষদার মানবিক আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করে চলেছেন।

বর্তমানে সামাজিক অবক্ষয়ের মুখে আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রাণতোষদার মত একজন আদর্শনিষ্ঠ মানুষের জীবনালেখ্য তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন। জীবনীগ্রন্থ হিসাবেও বইখানি বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারে মূল্যবান সংযোজন হবে বলে মনে করি। প্রাণতোষদার জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই। বইখানির যোগ্য সমাদর ও বহুল প্রচার কামনা করি।

কলিকাতা
১৬/৯/১৯৮৮



সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নাই কিরে কেউ সত্য-সেবক বুক ফুলিয়ে আজ দাঁড়ায়?
শিকলগুলো বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়,
বজ্রহাতে জিন্দানের (জেলখানার) এই ভিতটাকে নাড়ায়?

—নজরুল

প্রাণবান প্রাণতোষ ও তাঁর 'কাজী নজরুল'

□ শাহাবুদ্দীন আহমদ □

নজরুল গবেষক, প্রকাশক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় সংস্করণ "কাজী নজরুল" বইটির প্রচ্ছদের ৪র্থ পৃষ্ঠায় লেখক-পরিচিতির শেষ তিনটি বাক্য এমনি--

"নজরুলের কবিতা এঁর মর্মভেদ। দেখতে
মানুষটি ছোটখাট কিন্তু একটি জ্বলন্ত অগ্নি-
শিখা—এই সঙ্গে রয়েছে প্রাণখোলা উদাত্ত
অট্টহাসি। ভাবের সাধক, গানের বাউল।"

১৯৭৪-এ হুগলীতে তাঁর বাসাতে তাঁকে যখন দেখলাম তখন এই কথাগুলি আমার নতুন করে মনে হ'ল। আমার পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে যেভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাতে মনে হ'ল তিনি তাঁর এক হারানো-ভাইকে যেন খুঁজে পেয়েছেন। অনাত্মীয় প্রথম-দেখা মানুষকে সম্ভবতঃ নজরুল ইসলাম এমন ধরণের আন্তরিকতা ও নিবিড়তায় আলিঙ্গন করতেন। আমি এই উচ্ছ্বসিত ব্যবহারে আদৌ অবাক হইনি। আমার নিজের ব্যবহারে এত উচ্ছ্বাস নেই, এত আবেগ নেই। আমি তবু তাঁর আবেগের উত্তাপে প্রায় উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিলাম।

১৯০৫ সালে তিনি জন্মেছিলেন। উনিশশ' চুয়াত্তর সালে তাঁর বয়স ছিল উনসত্তর। বাঙালীর বয়স হিসেবে এটা কম নয়। এ বয়সে অনেকে কুঁজো হয়ে যায়, ন্যুব্জ হ'য়ে যায়। স্থবির হ'য়ে যায়, নিস্তেজ হয়ে যায়। কিন্তু প্রাণতোষদা'কে দেখলাম বৃদ্ধত্বে ঘাড় ধরে তিনি সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বৌদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে আমার ছোট ভাই সোলমউদ্দীন ছিল। আমাদের দু'জনকে পরোটা ডিমকারী

খাওয়ালেন। নজরুলের 'ঝড়' কবিতা মুখস্থ আবৃত্তি করে শোনালেন। প্রফুল্লতা, প্রাণোচ্ছলতা, উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতা সবকিছু যেন নজরুলের চরিত্র থেকে তাঁর চরিত্রে সঞ্চারিত হ'য়েছে। তিনি যেন নজরুলের চারিত্রিক প্রতিবিম্ব।

আমাদের কাছে সব কবিতা সমান আবেদন ও সমান আকর্ষণ নিয়ে উপস্থিত হয় না। কোন কোন কবির কোন কোন কবিতা উত্তাপ ও আস্বাদ নিয়ে হাজির হয়। চারিত্রিক মেজাজের জন্যে এই ব্যাপারটা ঘটে। অনেক সময় অনেক বড় কবির অনেক মহৎ কবিতা আমাদের আনন্দ দিতে নাও পারে অথচ কোন মাঝারি মাপের কবির কবিতা আমাদের আনন্দে উদ্বোধিত করে।

নজরুল ইসলামের কবিতা যে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মর্মভেদ করে উঠেছিল তার কারণও নিহিত ছিল এইখানে। নজরুলের দারুণ মানবপ্রীতি, দেশপ্রীতি প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে আকর্ষণ করার কারণ তিনি নজরুলেরই মত ছিলেন মানবপ্রেমিক, দেশপ্রেমিক।

করুণা আর সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা আর ভালোবাসার জন্য আত্মোৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত রাখার মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। স্বাধীনতাপূর্ব-কালে বৃটিশের শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার ও দেশকে মুক্ত করবার চিন্তা অনেকের ছিল কিন্তু কার্যকর ভূমিকা যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে শুধু মৌখিক সমর্থনকারীদের পার্থক্য ছিল অনেকখানি। দ্বিজেন্দ্রলালের ''হ'তে পারতাম''-এর নায়ক সাজা এক আর সত্যকার নায়ক হ'য়ে দেখিয়ে দেওয়া অন্য। নজরুলের চরিত্রে এই সত্যের প্রকাশ ঘটেছিল ব'লে সত্যসাধক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে এত গভীরভাবে ভালোবেসেছেন এবং শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। ''কাজী নজরুল'' এই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ফসল।

নজরুল ইসলামের আর একটি মহাগুণও প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ে ভর করেছিল তা হ'ল উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা। আমার মনে হ'য়েছে এটা তাঁর স্বভাবগুণ। ''কাজী নজরুল''-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এই উদার অসংকীর্ণ ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জীবনভর নজরুল যে-সংগ্রাম করেছিলেন সে-সংগ্রামের একজন আজীবন সৈনিক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ও। সেজন্যে "কাজী নজরুল" বইতে নিজের সম্প্রদায়ের লোককে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্যে নির্মমভাবে আঘাত করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।

মানুষ প্রাণতোষের যেমন তুলনা নেই তেমনি তুলনা নেই তাঁর "কাজী নজরুল" বইটিরও।

এ বইটি না লেখা হ'লে কি হ'ত আমি শুধু সে-কথাই বলব। বিয়ে করার পর নজরুল ইসলাম হুগলীতে থেকে প্রথম বাসা বাঁধেন। "কাজী নজরুল"এ বিশদভাবে নজরুল ইসলামের এই হুগলী-জীবনের ইতিহাস পাওয়া গেল। শুধু হুগলীর ঘটনা নয়, 'বাঁকুড়া' 'নৈহাটী' 'কৃষ্ণনগর'এর অনেক ঘটনাও কি "কাজী নজরুল" না পড়লে আমরা জানতে পারতাম? "কাজী নজরুল" না লেখা হ'লে "তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ"-এর ঘটনা কোথায় পেতাম আমরা? শম্ভু রায়ের পত্রাবলী? বিপ্লবী-শিক্ষক নিবারণ ঘটকের কথা কি এমনভাবে আর-কোথাও পাওয়া যেত? লেটোর দলের কিশোর নজরুলের ছন্দ-শিক্ষার কথা? অনেক লেখক লেখেন কিন্তু প্রাণ উজার ক'রে সবাই লেখেন না। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় "কাজী নজরুল" লিখেছেন প্রাণ উজার করে সকল ঔদার্য, মহত্ত্ব ও ভালোবাসা দিয়ে। তাই তাঁর অসম্ভব পরিশ্রমের চিহ্ন এর প্রতি পৃষ্ঠায় নয় প্রতিটি বাক্যে আকীর্ণ হয়ে আছে। আজ কে অস্বীকার করবে যে প্রাণতোষের "কাজী নজরুল" ছাড়া "নজরুল জীবনী" অসম্পূর্ণ থাকবে।

আমি মনে করি বাংলা-সাহিত্যে নজরুলের সঙ্গে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ও এই বইটির জন্য অনেক দিন স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন।

নজরুল-বন্ধু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

□ কল্পতরু সেনগুপ্ত □

সাংবাদিক, প্রধান উপদেষ্টা নজরুল অকাডেমি, চুরুলিয়া।

কাজী নজরুল ইসলামের সহযাত্রী ও বন্ধু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় আমাদের মধ্যে রয়েছেন এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের বলতে বুঝাতে চাই যাঁরা নজরুল-চর্চা করেন, যাঁরা বাংলা-সাহিত্যের বিকাশে আগ্রহী, কাজী নজরুলের যথার্থ মূল্যায়ণে বিশ্বাসী এবং বিদ্রোহী কবি হিসাবে ও সুরকার নজরুলের জন্য গর্বিত। ১৯২৪ সালে কবি প্রমীলা দেবীকে বিবাহ করার পর হুগলীতে বাস করছিলেন, এবং তারও আগে থেকে হুগলী 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি হুগলী যাওয়া-আসা করতেন, হুগলী জেলে বন্দী ছিলেন এবং এই জেলে রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদার দাবীতে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। সুতরাং কবির সঙ্গে হুগলীর যে সম্পর্ক ছিল এরূপ আর কোন জেলা বা স্থানের সঙ্গে ছিল না। তদুপরি হুগলীর তারকেশ্বর মন্দিরের পুরোহিতের অনাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে কাজী নজরুল অসাধারণ সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়ে কবির যাঁরা ঘনিষ্ঠ ও সহকর্মী ছিলেন তাঁদের মধ্যে আজো জীবিত আছেন শ্রদ্ধেয় প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, বিজয় মোদক প্রমুখ। এছাড়া কবি দয়ালকুমার এবং আরো কেউ আছেন যাঁরা কবির সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করেছেন। আরো যাঁরা ছিলেন সাহিত্যে ও রাজনীতিতে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন নজরুলের সেই সহকর্মীরা একে একে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু যাবার আগে বাংলার রাজনীতিতে হুগলীর ভূমিকা এবং কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টি ও আন্দোলন সম্পর্কে তেমন কিছু লিখে যেতে পারেননি। এই কাজটা করেছেন প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। এই অবদানের জন্য বাংলা-সাহিত্য তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করবে। তিনি

যদি 'কাজী নজরুল' প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ না করতেন, তা'হলে কবির জীবনের অনেক কথা বিস্মৃতির অতলে চাপা পড়ে যেত। তিনি যদি 'সাংবাদিক নজরুল' না লিখতেন তাহলে নজরুল-প্রতিভার আর একটা দিক আলোচিত হতো না। যে দিকটি গণতান্ত্রিক সাংবাদিকার পথ মুক্ত করে দিয়েছিল, ভারতের সংবাদপত্রের বিকাশে শ্রমিক-শ্রেণীকে নতুন পথ দেখিয়েছেন। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় নজরুল জীবনের এই সৃষ্টিশীল দিকগুলি উন্মোচিত করেছেন বর্তমান প্রজন্মের পাঠকদের কাছে। আবার বলি, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়ে লেখনী না ধরলে নজরুল মূল্যায়ণে অনেক বাধা থেকে যেত।

কাজী নজরুলের দুই বন্ধু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাঠক ও গবেষকদের কাছে কবিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন। এই দু-জনের একজন কমরেড মুজাফ্ফর আহ্মদ যিনি কবি অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রকৃত বন্ধুর ভূমিকা পালন করেছেন। 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা' বইতে কাজী নজরুলের অন্তরলোক ও চিন্তা-জগতকে ঠিকভাবে প্রকাশ করেছেন। আরেকজন কবি অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ কিন্তু ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে থেকেছেন, অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছেন, কবির জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকাশ করেছেন, তিনি শ্রদ্ধেয় প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। এই দু-জনের মত কাজী নজরুলের প্রকৃত উপকারী বন্ধু আমি আর দেখিনা। এই দুই জন নিজেদের অভিজ্ঞতায় কবিকে তাঁদের পুস্তকে প্রকাশ করেছেন, তাই এই-কালের নজরুল-পাঠকরা প্রকৃত নজরুলের পরিচয় লাভ করেন। রটনা ও বানানো গল্পে নজরুলের বিপ্লবী মানসলোক চাপা পড়ে যেত ও আগামী প্রজন্মের মানুষ 'বিদ্রোহী কবি'কে পেতেন না। পেতেন কেবল সুরলোকের কবিকে।

হুগলীতে থাকাকালে কাজী নজরুল অনেক বিখ্যাত গান ও কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ঝড়'-এর মত

কবিতা। এই কবিতার জন্মমুহূর্তের কথা জানা গেছে প্রাণতোষবাবুর লেখায়। "...প্রবল জ্বর ও রক্ত আমাশয়ে কবি প্রায় নির্জীব হয়ে পড়েছেন। এ রকম অবস্থায় একদিন বিকালে আকাশ পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে থমথমে হয়ে আছে। চোখ বুজে পড়ে আছেন কবি নজরুল, দক্ষিণের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পিঙ্গল-বিহ্বল আকাশ, আমি তখন তাঁকে পরিচর্যারত; হঠাৎ চোখ খুলে আকাশের ঐ রূপ দেখে কলকণ্ঠে শিশুর মত উল্লসিত হয়ে দৌড়ালেন ছাতের দিকে। আমি তো প্রথমে বুঝতে পারিনি কী ব্যাপার। দীর্ঘ পল্লবায়ত চোখ ছড়িয়ে দিলেন উদার আকাশে, ঘনকৃষ্ণ গুচ্ছগুচ্ছ মাথার চুল উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হাওয়ায় সাপের মত। ·· কবিকে তখন জীবন্ত শিবের মত মনে হচ্ছিল। আমি কোন্ রূপটা দেখব স্থির করতে পারছিলাম না। পরক্ষণে শুরু হল ঝড়!

পশ্চিমদিকের মেঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল পূর্বের দিকে। থমথমে স্থির আকাশের কোলে প্রবল জ্বর নিয়ে কবি শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির এই রূপসুধা আকণ্ঠ পান করলেন। আর মাঝে মাঝে স্বগতোক্তি করে বলতে লাগলেন—'ঝড় – আমি ঝড়, আমি ঝড়।' যখন ঝড়ের শেষে জল এসে পড়ল তখন আমরা তাঁকে টেনে হিঁচড়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলাম।...

ঘরে এসে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে কবি 'ঝড়' কবিতা লিখতে বসলেন। দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা কবিতা ব্যাসিলারী ডিসেনট্রি ও প্রবল জ্বরের মধ্যে তিন-চার ঘন্টা ধরে একান্ত মনে লিখে আমাদের শুনিয়ে তবে তিনি বালিসে মাথা রেখে চোখ বুজলেন।"

'ঝড়'-এর মত কবিতার জন্মমুহূর্তের কথা আমরা কি জানতে পারতাম তিনি না লিখলে? এমন আরো অনেক কবিতা ও গানের সৃষ্টি-মুহূর্তের কথা জানা গেছে তাঁর লেখা থেকে। বিশেষ করে স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও চারণ কবিরূপে তিনি যে জেলায় জেলায় পরিভ্রমণ করেছেন, যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এই বিবরণ তাঁর লেখা থেকে পাওয়া গেছে। এমনি অনেক ঘটনার কথা, যেমন তারকেশ্বর

তীর্থস্থানে অনাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে কাজী নজরুলের দুঃসাহসিক ভূমিকার বিবরণ। এই সত্যাগ্রহে প্রাণতোষবাবু কবির সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং তাঁর মত সবিস্তারে বলা আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না।

প্রাণতোষবাবু 'কাজী নজরুল' দ্বিতীয় পর্বে যেরূপ সাহসের সাথে নজরুলের ভাবমূর্তি রক্ষার সংগ্রামে নেমেছেন তাও অভূতপূর্ব উদ্যোগ বলা যায়। কবিকে বাঙালী মাত্রই ভালবাসে, এই কবির রচনায় বাংলার যুবসমাজ বিপ্লব-পথে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, নজরুল-গীতি বাংলার সঙ্গীতকে প্রাণদান করেছে। ব্যক্তি হিসাবে, মানুষ হিসাবে প্রাণখোলা হাসি ও নিষ্কলুষ চিত্তের এবং সরলতার প্রতিমূর্তি এই মানুষটিকে নিয়ে কত রটনা, কত অপবাদ। যখন অসুস্থ হয়ে নির্বাক হয়ে যান তখনো সংকীর্ণমনা, পাপচিত্ত, রটনার বলগায় টান পড়েনি। অথচ যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন তাঁদেরও সাহসে কুলোয়নি প্রতিবাদ করার, উপরন্তু কবিসঙ্গলাভকে পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য। এই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রম যাঁরা তাঁদের মধ্যে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় অগ্রগণ্য। কেবল সভায় আলোচনায় প্রতিবাদ করে কর্তব্য শেষ করেননি, দ্বিতীয় পর্বে লিখিত ভাবে ভুল ধারণা সংশোধন করেছেন, মিথ্যার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। যেমন, কবির প্রতি ঈর্ষাকাতররা প্রচার করতো তাঁর যখন দ্বিতীয়বার কারাদণ্ডাদেশ হয় তিনি নাকি মুচলেখা দিয়ে মুক্তি পেয়েছিলেন। আসলে সত্য ঘটনা ছিল গান্ধী-আরুইন্ চুক্তিতে রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারে তাঁর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় না। ব্যাপক অপবাদ ছিল মদ্যাসক্তি নিয়ে, কিন্তু অতিঘনিষ্ঠ এবং সর্বক্ষণ যাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকতেন কারো সাক্ষ্যে এই প্রচারের প্রমাণ মেলেনি। ভাল করে সংবাদপত্রে খবর হয়েছে গীতিকার প্রণব রায় ১৯৩০-৩২ সালে কবির সঙ্গে জেলে ছিলেন, অথচ কবি তখন জেল খাটেননি। তিনি জেল খেটেছেন রাজদ্রোহাত্মক কবিতা লেখার অভিযোগে, কিন্তু অনেকেই লিখে যাচ্ছেন তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দেওয়ায়। মেসোপটেমিয়া

নিয়ে ত গল্পের শেষ নেই, যেন মেসোপটেমিয়ায় না গেলে তাঁকে বীরত্বের আসনে বসানো গেল না। এই রকম আরো কত কি। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এসব মিথ্যার জাল ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। শুধু সত্য নয় বলে তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, মিথ্যাবাদীদের মুখোশ খুলে ধরেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের মূল্যায়নে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের এই ভূমিকা প্রশংসনীয়। এটা তাঁর বিপ্লবী মানসিকতার পরিচয়। মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে তার গতিরোধ করতে চেয়েছেন। এইরূপ সত্যনিষ্ঠা বর্তমানকালে ক'জনের আছে, সকলেই তো পাশ কাটিয়ে চলে। কাগজের বিভাগীয় সম্পাদকরা যাচাই না করে অজ্ঞ-ব্যক্তিদের কল্পিত লেখা ছেপে মিথ্যারটনায় সাহায্য করে। প্রাণতোষ-বাবুর এই প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তাঁর এই ভূমিকা দেখে প্রত্যয় হয়েছে তিনি সত্যিই কাজী নজরুলের একই গোত্রের মানুষ; সুবিধাবাদের সঙ্গে আপোষ করেন না।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘকাল কংগ্রেসের অপশাসনের পরে, ১৯৬৯ সালে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলো সে সময় কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ কবিকে রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা-দানের প্রস্তাব করেছিলেন এবং সে প্রস্তাব কার্যকর হয়েছিল। নজরুল রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তাঁরই প্রস্তাবে। রচনাবলীর সম্পাদক-মণ্ডলীতে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদই প্রাণতোষবাবুর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন নজরুলের গ্রন্থগুলির শুদ্ধতা রক্ষা করে প্রকাশ করতে হলে প্রাণতোষ-বাবুর সহযোগিতা ছাড়া করা যাবে না। কবির বই-এর প্রথম সংস্করণ একমাত্র তাঁর কাছেই আছে। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করায় তিনখণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়েও মুদ্রিত হতে পারলো না। এটা যে পশ্চিমবঙ্গের কতবড় দুর্ভাগ্য এখন আমরা বুঝতে পারছি। ১৯৭৮ সালে যখন বামফ্রণ্টের সরকার গঠিত হলো তখন কমরেড মুজফ্ফর আহমদ জীবিত ছিলেন না। প্রাণতোষবাবু বামফ্রণ্টের সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখলেন নজরুল-রচনাবলী প্রকাশ, নজরুল-

পুরস্কার প্রবর্তন, নজরুল-গবেষণা পরিষদ গঠন, নজরুল অকাডেমী, চুরুলিয়া সরকার-পরিচালনায় নিয়ে আসার জন্য, নজরুল-জীবন ও সৃষ্টি-বিষয়ক প্রদর্শনী রাজ্যময় শহর থেকে গ্রামস্তরে করা এবং সঙ্গীত বোর্ড গঠন করার জন্য। তাঁর এই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। কেন হয়নি সেকথা রহস্যাবৃত। এই প্রস্তাব রাখার সময় যদি নজরুল-চর্চায় গাফিলতি কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মধ্যে দেখেছেন তাঁদের তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। নির্ভীক স্পষ্টবাদী এই বৃদ্ধ সত্যের পথে অবিচল।

দীর্ঘকাল প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁর বই আমি সংবাদপত্রে রিভিউ করেছি। সুতরাং যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয়েছে এবং চিন্তা করতে হয়েছে। আমার মনে হয়েছে তিনি যেন কাজী-নজরুল সম্পর্কে জীবন্ত অভিধান। ভাবতে আমার গর্ব হয় তাঁর সঙ্গে নজরুল-বিষয়ে আলোচনা করেছি একাধিক সভায়। শেওড়াফুলী রাজবাটীতে তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর বাড়িতে বহুবার গিয়েছি, কাজী নজরুলের সৃষ্টি রক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিস্মিত হয়েছি এই বয়সে তিনি নজরুলের কবিতা মুখস্থ বলে যেতে পারেন একটুও না থেমে, বহু গানের সুর ধরিয়ে দিতে পারেন। এই বয়সেও চুরুলিয়ায় নজরুল-মেলায় পদযাত্রায় যেতে তিনি দ্বিধা করেননি প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও। কী উদ্দীপনা, কী উৎসাহ, আর মানুষের ভবিষ্যতের প্রতি কত বিশ্বাস! কৈশোরে স্বাধীনতা-আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন, বর্তমানে আশীর ঘরে বয়সের ভার সত্ত্বেও আন্দোলনেই আছেন, তবে অসি নয় মসির সাহায্যে যে লেখা কাজী নজরুলের বিপ্লব-ভাবনায় যুব-সমাজকে উদ্দীপিত করছে।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে যখন চিন্তা করি তখন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। তাঁর পাশে একটা মুখচ্ছবি চোখে পড়ে—যিনি এই নির্ভীক নজরুল-বন্ধুর অক্লান্ত সেবা করে যাচ্ছেন, নিজের অসুস্থ স্বাস্থ্য নিয়ে, তিনি শ্রদ্ধেয়া সুষমা-বৌদি। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধুরা সকলে মিলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে অগ্রসর হয়েছে, এমন শুভ প্রচেষ্টায় নিজেকে যুক্ত করে কামনা করি তিনি শতায়ু হোন। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় জিন্দাবাদ।

বন্ধুবর প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে

□ নারায়ণ চৌধুরী □

প্রাবন্ধিক

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের অনুজ-প্রতিম সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ সাথী শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কথা মনে হলেই আমার চোখে একটি আদর্শবাদী, প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তরুণ কর্মীর ভাবচ্ছবি সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে। আজ আর তিনি অবশ্য তরুণ নন, তিনি বার্ধক্যের প্রান্তসীমায় এসে উপনীত হয়েছেন এবং তদনুপাতে তাঁর স্বাস্থ্যও কমবেশী ভগ্ন হয়ে পড়েছে। তা হলেও যখনই তাঁর কথা মনে হয়, তাঁর প্রজ্জ্বলন্ত যৌবনোদ্দীপ্ত প্রাণচঞ্চল কর্মশক্তিতে পূর্ণ একটি সংগ্রামী ভাবুকের ছবি বিশেষ ক'রে মনের পটে ভেসে ওঠে। নজরুলের প্রতি তিনি আজীবন অনুগত ও তাঁর কাব্যসাধনার ভাবধারায় উদ্দীপিত - তার অর্থই হচ্ছে, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় নামে যাঁকে আমরা জানি তিনি আবাল্য বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত। দেশের অগণিত শোষিত নিপীড়িত অনিদ্রিত ও অবমানিত শ্রেণীর প্রতি গভীর মমত্বপরায়ণ, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর আদর্শে অবিচল আস্থাশীল। অপিচ ভারতের জাতীয় মুক্তি-সাধনার সার্বিক কর্মযজ্ঞে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এক কর্মী ও নেতা।

ভারতের রাষ্ট্রীক স্বাধীনতা অর্জিত হয়ে গিয়েছে কিন্তু ভারত-বাসী এখনও অর্থনৈতিক অসাম্যের বন্ধন ও সামাজিক অবিচারের পীড়ন থেকে মুক্ত হয়নি। শেষোক্ত এই দ্বিবিধ মুক্তির আকাঙ্খা তাঁর চোখে আনে স্বপ্নের ঘোর, তাঁর প্রাণকে আজও চঞ্চল ক'রে তোলে। এ সবেরই মূলে আছে কৈশোরে কাজী নজরুল ইসলামের কাছ থেকে পাওয়া প্রেরণার উজ্জীবন। নজরুলের প্রতি এমন

ঐকান্তিক সমর্পিত চিত্ত, গভীর অনুরাগী মানুষ আমি জীবনে আর দ্বিতীয় দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। নজরুলের প্রতি আমার প্রাণের টানও কিছু কম নয়। যদিও এক্ষেত্রে প্রাণতোষবাবুর সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই হয় না, তবুও বলব নজরুলের প্রতি এই অসাধারণ দুর্নিবার আকর্ষণই আমাদের দু'জনকে ভাবের সমভূমিতে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

প্রাণতোষবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের বলা যেতে পারে। সেই ১৯৪৬-৪৯ সালে উনি যখন ''স্বরাজ'' পত্রিকায় কাজ করতেন, আমিও সেই পত্রিকায় তাঁর সহকর্মী ছিলাম এবং একই সঙ্গে কর্মীদের হয়ে সংবাদপত্র-মালিকের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে-ছিলাম। তারপর তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিন প্রত্যক্ষ সংযোগের উপলক্ষ কমই ঘটেছে, তবে গত দুই দশক-কালের মধ্যে নানা কাজে নানান সূত্রে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হওয়ার একাধিক সুযোগ দেখা দেয়। আমার মনে পড়ে, আজ থেকে ১৯/২০ বছর আগে আমরা দু'জন একত্রে নজরুল-জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে চিত্তরঞ্জনে যাই। সেখানে (শ্রীলতা ইনসটিটিউট) প্রাণতোষবাবু নজরুলের কাব্যকৃতী ও জীবনসাধনার উপর যে প্রাণপূর্ণ আলোচনা এবং সব শেষে নজরুলের ''ঝড়'' কবিতা উদ্দীপনাময় আবৃত্তি করে শোনান তার স্মৃতি আমি কখনও ভুলতে পারব না। বিশেষ করে তাঁর উদাত্ত কন্ঠের আবৃত্তি সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে যেন বেশ কিছুক্ষণের জন্য মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। প্রাণতোষবাবুর অন্তরে যে কী গভীর প্রাণাবেগ ও ভাবোন্মদনা নিহিত আছে সেদিনকার সেই আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আমি তার নির্ভুল প্রমাণ পেয়েছিলাম।

এরপর আর একটি স্মরণীয় উপলক্ষ হ'ল, চুরুলিয়ার নজরুল অকাদেমী কর্তৃক একই বৎসরে (১৯৮১) তাঁকে ও আমাকে নজরুল পুরস্কার প্রদান। তিনি এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ''কাজী নজরুল''-এর জন্য, আর আমাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয় আমার সঙ্গীত-বিষয়ক ''কাজী নজরুলের গান'' বইটির বাবদে।

অর্থাৎ আমরা দুজনে মিলে এক হিসেবে বলতে গেলে নজরুল-চর্চার বৃত্তটি পূর্ণ করেছিলাম। তিনি নজরুল-সাহিত্যের দাবী পূরণ করেছিলেন আর আমার দ্বারা নজরুলের গানের দিকটির দাবী আংশিকভাবে অন্ততঃ পরিপূরিত হয়।

আমি প্রাণতোষবাবুর "কাজী নজরুল" বইখানা অত্যন্ত মনোসহকারে আদ্যোপান্ত পড়েছি। দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই বই কাজী নজরুল ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনী। যা অন্যদের জানবার কথা নয়, তেমন অনেক অজ্ঞাত ও মূল্যবান তথ্যে এই বইটির কলেবর পূর্ণ। শীঘ্রই এই বইখানিব ৩য় খণ্ড প্রকাশ হ'তে চলেছে। আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই বইখানির প্রকাশের অপেক্ষা করে থাকব। তাঁর নজরুল-বিষয়ক আর একখানি উল্লেখযোগ্য বই হ'ল "সাংবাদিক নজরুল।" এতে প্রাণতোষবাবু নজরুলের জীবনের একটি স্বল্প আলোচিত দিক সংবাদপত্রসেবী ও সাংবাদিক হিসেবে নজরুলের ভূমিকার উপর উপযুক্ত আলোকপাত করে নজরুল জীবনী-চর্চার একটি নতুন দিকের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। এ বিষয়ে আরও অনুশীলন ও গবেষণার অপেক্ষা রাখে কিন্তু প্রাণতোষবাবুই হলেন এ বিষয়ে আলোচনার পথিকৃত।

প্রাণতোষবাবুকে আমি যতদূর দেখেছি ও বুঝেছি, আমাদের পারস্পরিক বিচরণের ক্ষেত্রসীমাব মধ্যে তাঁর যতটুকু পরিচয় পেয়েছি, সেই অভিজ্ঞতা থেকে অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি তাঁর মত এমন অমায়িক, সহৃদয়, সদালাপী, উন্নতপ্রাণ মানুষ খুব কম দেখা যায়। ছোটবড় সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁব প্রাণের প্রীতি সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত; তাব থেকে বোঝা যায় তিনি সহজাত-ভাবেই এক ঐকান্তিক মানব-প্রেমের অধিকারী শিল্পী ও ভাবুক শ্রেণীর মানুষ। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে দেশসেবক, দেশকর্মী, সমাজসেবী, কবি, ভাবুক, নজরুল ভাবাদর্শের প্রচারক প্রভৃতি বিবিধ বৈশিষ্ট্য এক-আধারে এসে মিলিত হয়েছে।

আজ জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হ'য়ে তিনি আর আগের মত কর্মচঞ্চল নন, স্বাস্থ্য স্বভাবতই বার্ধক্যের প্রহারে ভগ্ন ও জীর্ণ। তা হ'লেও তাঁর যৌবনের স্বপ্ন তাঁর অন্তরে আজও জাগরূক ও দেদীপ্যমাণ রয়েছে—এটা তাঁর বিভিন্ন লেখা পত্রের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়। আজ এই উপলক্ষে প্রার্থনা করি তাঁর ভগ্ন-স্বাস্থ্য উদ্ধার হোক, ব্যাধি জীর্ণতা থেকে মুক্তিলাভ ক'রে নীরোগ দেহে তিনি আরো দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকুন। দেশ ও দশের সেবায় তাঁর জীবন সবদিক থেকে সার্থক হোক॥



কোথা চেঙ্গিস, গজনী মামুদ,
কোথায় কালাপাহাড় ?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের
যত তালা-দেওয়া দ্বার।
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়,
কে দেয় সেখানে তালা ?
সব দ্বার এর খোলা রবে,
চালা, হাতুড়ি-শাবল চালা।

—নজরুল

আমার চোখে প্রাণতোষদা

□ নিতাই ঘটক □

স্বরলিপিকার

সৃষ্টির নিয়মের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ জন্ম নেন, যাঁদের কর্মধারা আমরা সবসময় অনুধাবন করতে পারিনা। তাঁরা চিরকালই পর্দার আড়ালে থেকে যেতে ভালবাসেন, নীরবে কাজ করতে ভালবাসেন। তাঁদের প্রতিভার ছটা দেখে মনে হয়, খুব একটা দ্যুতি নেই, সাদা-মাটা ব্যাপার। আসলে এরা নিজেদের গুণগুলি গুটিয়ে রাখেন, খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চান না। এই সমস্ত প্রাতঃ স্মরণীয় ব্যক্তিরা মৌন-সরলতা দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রাখেন, যে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তাঁদেরকে চিনতে ভুল করি। তাঁদের কর্মপদ্ধতি ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারিনা। অবশ্য এঁদের আদর্শ, কর্মচঞ্চলতা ও কর্মপদ্ধতির প্রভাব সাধারণ মানুষ যখনই বুঝতে পারেন, তখনই তাঁদের চৈতন্যের উদয় হয়। আর, প্রয়োজন-বোধ করেন সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার। এই মূল্যায়নের মধ্যে দিয়েই তাঁদের দ্যুতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখনই সাধারণ মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এই মৌন কর্মবীরদের আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণুতা দেখে সাধারণ-মানুষ অন্তরের অন্তস্থলে জায়গা করে দেয়।

এই রকমই একজন মৌন কর্মবীর হচ্ছেন প্রাণতোষদা যাঁর দেখা পেয়েছিলাম, ১৯৬৯ ৭ই জুন তারিখে, মহাজাতি সদনে। অবশ্য তাঁর নাম আমি শুনেছি বহুবার কাজীদার মুখে এবং আমার অগ্রজ (জগৎ ঘটক) মহাশয়ের কাছে। তাঁর লেখা ''কাজী নজরুল'' বইটা পড়ার পর তাঁর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা জন্মায়। কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় হয় সেদিনই (৭ই জুন) মহাজাতি সদনে। প্রথম দেখাতেই মনে হল আমি এতদিন যাঁকে খুঁজেছি, এই তো সেইজন যাঁর হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া যায়। প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে বুকে টেনে নিলেন,

আমিও ছোট শিশুর মতো তাঁর বুকে আশ্রয় নিলাম। সংবিৎ ফিরে এলো ক্ষণিক মুহূর্তেই প্রেক্ষাগৃহ-ভর্তি লোক দেখে। আমাকে প্রথম সম্বোধন করলেন 'আপনি' বলে, আমাকে দেখবার জন্য, আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য, উনি এতোক্ষণ ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। অনেক কথা হল। কিভাবে কাজীদার সৃষ্ট সাধনাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। আলোচনা হতে-হতেই মনে ভাবলাম, এমন নজরুলময় পুরুষের সান্নিধ্য, বোধহয়, আমার জীবনে প্রথম। বিশেষভাবে তাঁর ব্যবহার এবং আন্তরিকতা দেখে বুঝতে ভুল হয়নি, ইনিই পারবেন কাজীদার কর্মপদ্ধতিকে, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য ও সংগীতকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করতে, বাঁচিয়ে রাখতে। এই (৭ই জুন ১৯৫৯) অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ নজরুল-অকাডেমী আমাকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। অনুষ্ঠানে কাজীদার অন্যতম সুহৃদ শ্রদ্ধেয় কমরেড মুজফ্ফর আহ্মেদও উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় প্রাণতোষদা ছিলেন এই কমিটির সহ-সভাপতি এবং সম্পাদক ছিলেন শ্রদ্ধেয় কল্পতরু সেনগুপ্ত মহাশয়।

পরবর্তীকালে প্রাণতোষদাকে যখন আরো কাছে পেলাম, তখন তাঁকে বলতে শুনেছি যে এই সহ-সভাপতি হওয়ার যোগ্যতাও নাকি তাঁর নেই। তাঁকে নাকি বড্ড বেশী সম্মান দেওয়া হচ্ছে। কি অদ্ভুত সরলতা! দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশে শুধু দিয়েই যেতে চান, পাওয়ার প্রত্যাশা করেন না। একেবারে কাজীদার প্রাণের কথা যেন তাঁর মুখ দিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কাজীদাও কোনদিন কিছু চাননি, চিরকাল সমাজকে দিয়েই গেছেন। এমনকি শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর এই মহৎ চিন্তা থেকে বিচ্যুত হননি। অভাব অনটন এসেছে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে তিনি তার মোকাবিলা করেছেন। প্রাণতোষদা হচ্ছেন এরকম একজন সর্বভোলা আত্মত্যাগী মানুষ, সুন্দর প্রাণ, কোমলতা যেন তাঁর অঙ্গে মেশানো। এমন বিপুল মন আছে বলেই তিনি এখনও আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে মনে রেখেছেন, আমাদের ব্যথায় ব্যথিত হচ্ছেন। মহাজাতি সদন থেকে বাড়ি ফিরলাম প্রাণে এক অফুরন্ত ভালবাসা, পবিত্র ভাব নিয়ে। মনটা হাল্কা লাগ্লো,

ভাবলাম কতদিন এই স্নেহ-মায়া-মমতার দর্শন পাইনি। কাজীদা যেদিন নীরব হয়ে গেলেন, সেদিন থেকে অব্যক্ত বেদনা বুকের মধ্যে ছিল, কি-এক অদ্ভুত 'সোনার কাঠি' ছোঁওয়ায়, তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। সত্যিকথা বলতে কি, সেদিন থেকে প্রাণতোষদার প্রতি গভীর ভালবাসা, আত্মিক টান অনুভব করতে লাগলাম। যা আজ অবধি অটুট আছে।

মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানের পর ১৪-৬-৬৯ তারিখে শ্রদ্ধেয় প্রাণতোষদার আন্তরিক ভালবাসা মাখানো একটি পত্র পেলাম। চিঠির সম্বোধনে তিনি আমাকে যেভাবে পরম স্নেহ-ভাজনীয়, নজরুল গীত-সুর ভাণ্ডারী-কাণ্ডারী শ্রীমান নিতাই ঘটক প্রভৃতি অলংকার দিয়েছিলেন, নিজেই বড় লজ্জা পেয়েছিলাম। আমি তো এরকম সম্বোধন পাওয়ার যোগ্য নই। তবে বুঝতে অসুবিধা হয়নি, প্রকৃত জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিরা যার মধ্যে যতটুকু ভালো জিনিস যা দেখেন সেটুকুকেই যথাযোগ্য মর্যাদা দেন। প্রাণতোষদার সেই চিঠি আজও মাঝে মাঝে পড়ে চমকিত হই।

প্রাণতোষদা হলেন একজন কবি, সংগীতজ্ঞ, সুসাহিত্যিক ও আবৃত্তিকার। সাহিত্যের রসসৃষ্টিতে তিনি হলেন দক্ষ কারিগর। তাঁর বহু কবিতা আমি পড়েছি, তাঁর উদাত্ত কন্ঠের আবৃত্তি আমাকে বার বার মুগ্ধ করেছে। বিশেষভাবে 'প্রলয়োল্লাস' ও 'ঝড়' এই কবিতা দুটি বিভিন্ন জায়গায় আবৃত্তি করে প্রশংসা পেয়েছিলেন।

প্রাণতোষদা চাইতেন কমরেড মুজফ্ফর আহ্‌মদের নির্দেশিত পথে নজরুল-সাহিত্যের নির্ভুল প্রকাশনা হোক। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার নুরুদার (কাজীদাকে এই নামে ডাকতাম) রচনাবলী প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রাণতোষদা আমাকে চিঠি দিয়ে তীক্ষ্ন নজর রাখতে বললেন, যাতে করে কোন সুযোগ-সন্ধানী মানুষ এর মধ্যে নাক না গলাতে পারে। অবশ্য প্রাণতোষদা একজনের প্রতি বিরাট আস্থাশীল, তিনি হচ্ছেন, নজরুল-বিশেষজ্ঞ শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত মহাশয়। আমায় বহুবার কল্পতরু বাবুর কথা চিঠিতে

বলেছেন।

ডি, এম লাইব্রেরি যখন কাজীদার 'সঞ্চিতা' কাব্যগ্রন্থ বার করে, সেই বই বেরোনোর পর ছাপা ও লেখায় যে সমস্ত ভুল ছিল, প্রাণতোষ-দা সেগুলি লক্ষ্য করে, সংশোধন করে, একটি ম্যাটার তৈরী করেন। আমার প্রয়োজনে সেটি দিতেও চেয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে আমার দাদা শ্রদ্ধেয় প্রয়াত জগৎ ঘটক মহাশয় কাজীদার গানের স্বরলিপির বই প্রকাশ করেছেন। আমিও দু-একখানি বই প্রকাশ করতে সুরু করেছি। প্রাণতোষদা আমাদেরকে মনে করতেন যে আমরাই নাকি নুরুদার প্রিয়তমদের মধ্যে নিকটতম। আমাদেরকেই গান ও স্বরলিপির ব্যাপারে সবকিছু দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে।

তিনি যে শুধু নুরুদার গানের ব্যাপারেই বলতেন তা নয়। আমাদের সংসারের খুঁটিনাটি দিকগুলিও তাঁর নজর এড়াতো না। আমার স্ত্রী (শ্রীমতী অর্চনা ঘটক)-কে তিনি নিজের বোনের মতো স্নেহ করেন। তার সঙ্গে দীর্ঘদিন চিঠির আদান-প্রদান ছিল। সে চিঠির ভাষা যে কি আন্তরিকতাপূর্ণ তা না দেখলে বোঝা যায় না। তিনি তাকে সুপরামর্শ দিতেন, ভাল কাজে উৎসাহ দিতেন। আমি যাতে নুরুদার গানকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকি, সে ব্যাপারেও নজর দিতে বলতেন। তিনি আমাদের সত্যিকারেরই অভিভাবক। স্বামী-স্ত্রীর খুঁটিনাটি ঝগড়াও তিনি মাঝে মাঝে মেটাতেন। এই-রকমই মানুষ প্রাণতোষদা, যাকে বিশ্বাস করা যায়, যার উপর নির্ভর করা যায়, যার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা যায়।

১৯৭০ সালে সাপ্তাহিক বসুমতীতে নজরুলগীতির উৎস ও তার পরিণতির উপর একটা লেখা বার করি। সেই লেখা পড়ে প্রাণতোষদা আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখে জানালেন, আমি নাকি এক শক্তিমান লেখক। লেখাটা নাকি অসাধারণ ভালো হয়েছে, যেটা আগামী দিনে নজরুল-গবেষকদের কাজে আসবে। কথাটা মিথ্যে হয়নি, এই লেখা পড়ে সকলেই আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। এই রকমই দূরদৃষ্টি তাঁর। তিনি চেয়েছিলেন আমি যেন নুরুদার গানের সুর,

ভাষা ও ছন্দ নিয়ে একটি গ্রন্থ লিখি। কিন্তু আমি এখনও সে গ্রন্থ লিখতে পারিনি। নজরুলদার কিছু গান নিয়ে কয়েকটি গীতি-আলেখ্যর বই প্রকাশ করবার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছি। নজরুলদাকে নিয়ে অনেকে অনেক-কিছু লিখলেও তার মধ্যে সঠিক তথ্য না থাকলে সেগুলিকে নজরুল-চর্চা না বলে চচ্চড়ি আখ্যা দিতেন।

তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখে বার বার অবাক হয়েছি। একবার নজরুলদার দেশাত্মবোধক গান বার করবার সময় অসুবিধায় পড়লাম। অনেকে বিরোধিতা সুরু করলেন। প্রাণতোষদা লিখে পাঠালেন যে তোমার দেশে-বিদেশে গানের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠা আছে। তুমি বই ছাপিয়ে বার করে দাও, কেউ কিছুই করতে পারবে না। মাঝে মাঝে তিনি চিঠির শেষে বেশ রসিকতাও করতেন। যেমন, দেখা পাই না-পাই, চিঠি পেলেও মনে বল পাই। 'নিতাই নিতাই' করতে করতে নিত্যানন্দ লাভ করি।

এমনকি তিনি আমাকে বার বার সাবধান করেছেন যে নজরুলদার সংস্পর্শে যারা কোনদিন আসেনি, তারা আসরে নেমে পড়েছে, তাদের দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখবে যাতে নজরুলদার সংগীতকে কেউ বিকৃত না করতে পারে এবং তাঁর গানকে নিয়ে ব্যবসা না করতে পারে। নজরুলদার উদ্দীপক গানগুলিতে কেউ সম্পূর্ণ ধর্মীয় দিক তাও তিনি চাইতেন না। এই হলেন প্রাণতোষদা—নজরুলদার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা না থাকলে এই ধরণের সদা-প্রহরীর কাজ করা সম্ভবপর নয়।

পরবর্তীকালে কখন যে আপনি থেকে তাঁর কাছে তুমি হয়ে গেছি মনে নেই। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী নজরুলদার গানের স্বরলিপি প্রকাশ করি। যাঁর অনুপ্রেরণায় একটার পর একটা স্বরলিপির বই আমার বেরিয়েছে তিনি হলেন প্রাণতোষদা। তাঁর অনুপ্রেরণা ও ঐকান্তিক ইচ্ছা না থাকলে হয়তো নজরুলদার এতো গানের স্বরলিপির বই প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হোতো না। ইতিমধ্যে নজরুলদার উদ্দীপক গানগুলির স্বরলিপি করার মনস্থ করলাম। কিছু গান, যা আমার স্মরণে ছিল না, শরণাপন্ন হলাম প্রাণতোষদার। তিনি আমাকে তাঁর

বাড়িতে যেতে বললেন। আমি তাঁর বাড়িতে যেদিন গেলাম, আমাকে দেখে তাঁর যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করেছি তা আজও ভুলতে পারিনি। তিনি দীর্ঘ সময় বসে একটার পর একটা গান করেছেন, আমি স্বরলিপি করে নিয়েছি। সে যে কী নিষ্ঠা, না দেখলে বোঝা যায় না। আমি অধৈর্য হলেও তাঁকে কখনও অধৈর্য হ'তে দেখিনি। রক্ত-নিশিভোরে, ওঠরে চাষী জগৎবাসী, ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রীদল প্রভৃতি গানগুলি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন এরজন্যে আমি তাঁর কাছে চিরকাল ঋণী।

আমার 'সংগীতাঞ্জলি' স্বরলিপির বই যখন বেরোল, আমি একদিন সেই বই তাঁর বাড়িতে গিয়ে দিয়ে এলাম। সেই বই পেয়ে তাঁর সে কি আনন্দ, আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দ-অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখেছি। অথচ আমি কেবল সংগীতাঞ্জলি (২য় ও ৩য় খণ্ড) ভূমিকায় প্রাণতোষদার নামটা উল্লেখ করেই দায়িত্ব শেষ করেছি।

আমার অগ্রজ, অভিভাবক, কর্মবীর প্রাণতোষদা আজও সে দৃঢ় ও ঋজু ভাবে আমাদের মধ্যে রয়েছেন তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর দীর্ঘ ও নীরোগ জীবন কামনা করি। পরিশেষে প্রাণতোষদার কাছে আবেদন রাখবো আর-একবার তাঁকে গর্জে উঠতে। কারণ, এখন নজরুলকে নিয়ে সত্যি-সত্যি ব্যবসা চলছে। নুরুদার গানের কথায় বিকৃতি ঘটছে, সুরের অদল-বদলে আসল নজরুল-গীতি হারিয়ে যাচ্ছে। এমনকি কথার মার-প্যাঁচে আমরা যে নুরুদার ঘনিষ্ঠ ছিলাম সে-কথা অনেকেই উড়িয়ে দিতে চাইছেন। তাই রণতূর্যের কবি কাজীদার অকৃত্রিম বন্ধু নজরুল-পথের দিশারীকে আহ্বান জানাই —আপনি পুনরায় জেগে উঠুন। এই সমস্ত মেকী নজরুল-প্রেমীদের হাত থেকে নুরুদার সৃষ্ট সাহিত্যকে বাঁচান। সেই সঙ্গে রাজ্যের বামপন্থী সরকারের কাছে আবেদন জানাব, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্যের ব্যক্তিরা একে একে চলে যাচ্ছেন, সামান্য দু-একজন যাঁরা আছেন, বিশেষভাবে প্রাণতোষদার মতন মানুষ-

দের নিয়ে বিদ্রোহী কবির উপর একটা তথ্য-চিত্র করা যায় কিনা ভেবে দেখুন। সেই সঙ্গে অবিলম্বে ছোট্ট বাংলাদেশ-সরকারের মত নজরুল-গীতির বোর্ড গঠন করুন। এই না-হলে জাতির একটি ঐতিহাসিক সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য আমি বিশ্বাস করি জন-জাগরণের মধ্যে দিয়েই সাম্যবাদী কবি আমাদের মধ্যে আবার ফিরে আসবেন। পরিশেষে নজরুল-সাধক, নজরুল-প্রেমী, প্রাণতোষদাকে আমার প্রণাম জানাই। আমাকে লেখা তাঁর একটি কবিতা দিয়ে শেষ করি।

যায় ডুবে যায় অগ্নিবীণা—
যায় ডুবে কি সুর?
আমার বেলা-শেষ জীবনে
(হবে) সুর-বিহীন সুর?
সর্বহারা কণ্ঠে নিয়ে ভাণ্ডার গানে'র গান
অগ্নিবীণার তারে তারে ঝঙ্কারিয়া তান
কে আসিলে প্রাঙ্গণে মোর
(প্রাণ) করিয়া ভরপুর।

ব্যথার বিষে মানুষেরা প্রাণ-যমুনার তীরে তীরে কাঁদে,
বিষের বাঁশীর কৃষ্ণ কোথায়? কোথায়? বলে সাধে।
এসো তোমার রুদ্র-সুরের বহ্নিজ্বালা আলোর বীণা লয়ে,
ঘরে ঘরে হতাশাদের আশার সুরে যাও বাণীরে কয়ে।
তোমার কথার বাহু দিয়ে মূর্ছাতুরে যাও দিয়ে যাও নাড়া,
(ভয়) ভাঙাও হে ভীতুর।

প্রার্থী ও শুভার্থী
দাদা
—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

(৯-৭-৬৯ তারিখে লেখা)

বিপ্লবী লেখক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

□ কৃষ্ণ ধর □

কবি ও সাংবাদিক

শ্রদ্ধেয় প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় একজন বিপ্লবী সাহিত্যিক। স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুলের কাছের মানুষ। নজরুলের বিপ্লবী আদর্শ সেদিন তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর রচনা থেকে আমরা অতীত দিনের সে-সব কাহিণী জানতে পারি।

প্রাণতোষবাবু আমাদের সকলের প্রিয়। বিপ্লবী বলেই এই বয়সেও তাঁর মনটা খুব তাজা। তরুণদের সমবয়সী বলেই মনে হয় তাঁকে। সাহিত্যকে তিনি জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ তাঁর সৌখিন মজদুরি নয়। সুস্থ সংস্কৃতি-প্রসারে তিনি আজীবন অনলস সংগ্রাম করেছেন। এখনও তাঁর লেখনী মানবতার পক্ষে, শোষিত মানুষের পক্ষে, সর্বহারার পক্ষে, সমান সজাগ ও সতর্ক।

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বই আমাদের কাছে আকর-গ্রন্থ স্বরূপ। নজরুল-প্রতিভার প্রকৃত বিশ্লেষণ যে ক'জন মনীষী করেছেন প্রাণতোষবাবু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অপরজন হলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। এক সংগ্রাম-উত্তাল সময়ে কাজীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। সেই বিপ্লবী উন্মাদনার যুগে প্রাণতোষবাবু স্বদেশ-সাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। আমরা জানি কিশোর-বয়সেই তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ-দিবসে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভগৎ সিং-এর হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মিতে সে-যুগে যে ক'জন বিপ্লবী যোগ দেন, বাংলা থেকে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আবেদন-নিবেদন করে বা চরকা কেটে স্বাধীনতা আসবে না। তার

জন্য প্রয়োজন হবে সশস্ত্র বিপ্লবের। সমাজের আমূল পরিবর্তনে আগ্রহী বিপ্লবী কর্মী হিসেবে প্রাণতোষবাবুর সেই সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বৃটিশ আমলে নির্যাতন ও কারাভোগ করেন তিনি। দীর্ঘ ছ' বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হয় বিনাবিচারে বন্দী হিসেবে। এই কারাবরণ প্রাণতোষবাবুর মানসিক দৃঢ়তাকে ইস্পাত-কঠিন করে তোলে। তিনি হয়ে ওঠেন আপসহীন সংগ্রামী ও লেখক। স্বদেশী যুগে দেশব্রতীদের আরেকটি কাজ ছিল সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনচেতনার জাগরণে সহায়তা করা। বন্দীজীবন থেকে মুক্ত হয়ে প্রাণতোষবাবু সাংবাদিকতার কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। সাংবাদিকতা ছিল তাঁর কাছে ব্রতস্বরূপ। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির পথও উন্মুক্ত হয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাহিত্য-বিভাগ সম্পাদনার মাধ্যমে।

প্রাণতোষবাবুর জীবন ও কর্মসাধনা একালের তরুণদের আদর্শ-স্বরূপ। সাধারণত আমাদের দেশে বার্ধক্য সমস্ত বৈপ্লবিক চেতনাকে পঙ্গু করে দেয়। হতাশা এসে সত্তাকে গ্রাস করে। নজরুলের সহযাত্রী প্রাণতোষবাবু কবির মতোই বিশ্বাসে অটল। বিপ্লবী চেতনা এখনও সমান সজাগ। তরুণ প্রজন্মের অফুরন্ত ভালবাসা তিনি পেয়েছেন। তাঁরা তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল বলেই এই প্রীতির বন্ধন হয়েছে দৃঢ়তর।

আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর সান্নিধ্যলাভের। অনেক সময় তাঁর স্নেহসিক্ত চিঠি পেয়েছি। উৎসবে অনুষ্ঠানে তাঁর অমূল্য বক্তব্য শোনার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। প্রাণতোষবাবু চিরযুবা। তাঁর আদর্শ চিরজীবী। ভারতবর্ষে শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রাম যতদিন চলবে, তাঁর কাছ থেকে একালের প্রজন্ম প্রেরণা ও উৎসাহ পাবে।

আমাদের সৌভাগ্য প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এই বয়সেও তাঁর লেখনী সচল রেখেছেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা বিপ্লবী যুগের আরও অনেক কথা শুনতে চাই, অনেক অজানা তথ্য জানতে চাই।

তিনি নতুন প্রজন্মকে দীক্ষিত করুন নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামে আত্মনিয়োগের জন্য। বিপ্লবী লেখক, সাংবাদিক প্রাণতোষবাবুকে নমস্কার।

২৫-৮-৮৮



"কবি নজরুল ইসলাম তিন হাজার সংগীত রচনা করেছেন। এই তিন হাজার সংগীতই যে বিভিন্ন পুস্তকে মুদ্রিত হয়েছে এমন খবর আমার জানা নেই। আর কেউ এ-খবর রাখেন কিনা তাও আমি জানিনে। —কবির গানগুলি বিভিন্ন কোম্পানীর রেকর্ডে ও শিল্পী-দের কণ্ঠে ছিল। আজ নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা করেও কবির তিন হাজার গান সংগ্রহ করা যাবে বলে আমার মনে হয় না। এই চেষ্টাই-বা কে করবেন?"

"কবি তাঁর লেখার স্বত্ব নানান জনের কাছে নানানভাবে বিক্রয় করে গেছেন। লেখা বিকৃত হচ্ছে কিনা সেদিকে স্বত্ত্বাধিকারীদের কোন নজর নেই। বই যতক্ষণ বিক্রয় হচ্ছে ততক্ষণ তাঁরা লেখার বিকৃতির দিকে নজর দেবেন না। যারে নজর দিতে চাইলেও আর তাঁরা হালে পানি পাবেন না। নতুন আইন পাশ পরে কবির লেখার সংরক্ষণ করা সম্ভব। বর্তমানে স্বত্ত্বাধিকারীরা অনেক লাভ করেছেন। তাঁদের উচিত এখন স্বত্ত্ব ছেড়ে দেওয়া। তাঁদের হাতে কবির লেখা এখন মোটেই নিরাপদ নয়। নজরুল-অকাডেমিই বলুন কিংবা কোনো রকমের ট্রাস্টি বলুন, তার পেছনে একটা আইনের শক্তি থাকা আবশ্যক।"

২৯শে মে, ১৯৬৬। মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত কবির ৬৭তম জন্মদিবসে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের উদ্বোধনী ভাষণের অংশ। পঃ বঃ নজরুল অকাডেমীর স্মারক পুস্তিকা হতে উদ্ধৃত।

সংকলক : কল্পতরু সেনগুপ্ত

তাঁর কথা

□ দয়াল কুমার □

বিপ্লবী, যুগান্তর দল, কবি

অনেকদিন আগের কথা। সব কথা মনে পড়ে না। আগে পরে গুছিয়ে সব কথা লেখাও সম্ভব হয় না। এজন্যে ভুল ত্রুটি হবে। আশা আছে, তার মধ্য দিয়েও মোদ্দা কথাটা বেরিয়ে আসবে।

প্রাণতোষদাকে প্রথম দেখেছি ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনাবসানের পর। সেই সময় আমার বয়স হবে ১৭ কিংবা ১৮ বছর। কাজীদার লেখা একটা গান গেয়ে একটি শোক-মিছিল শহর পরিক্রমা করে। সেই গানখানির একটা অনুলিপি সংগ্রহের জন্য ব্রিটিশ চন্দননগর থেকে আমরা ক'জন ছাত্র হুগলী বিদ্যামন্দিরে যাই। আমাদের প্রার্থনা পূরণ করে যিনি গানখানির একখানি ছাপানো অনুলিপি আমার হাতে তুলে দেন, পরে শুনেছি, তিনিই প্রাণতোষদা। মানুষটিকে দেখলাম, কিন্তু নামটা তখনো শুনিনি।

১৯২৬ সালের ২রা জুলাই, কিছু বই-এর জন্য গেলাম ডি. এম লাইব্রেরিতে। আমি তখন কলকাতার স্কটিশ চার্চ-এর ছাত্র। সবে এসেছি ওয়ান (Waun) হোস্টেলে। হোস্টেলেরই আর এক-বাসিন্দা নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন ডি. এম লাইব্রেরির মালিক, ঝিনাইদহের বিপ্লবী কর্মী গোপালদাস মজুমদারের সঙ্গে। আমি ব্রিটিশ চন্দননগরের ছেলে। প্রবর্তক সংঘ আমার বাড়ি থেকে বেশী দূরে নয়, ফরাসী চন্দননগরে। সেখানে সন্তান-সংঘে কাজীদাকে দেখেছি, তাঁর নিজের গাওয়া গান ও আবৃত্তি-করা কবিতা শুনেছি। দেশবন্ধুর জীবনাবসানের পর কাজীদার লেখা "খোলো মা দুয়ার খোলো" গানখানির অনুলিপি সংগ্রহ করতে হুগলী বিদ্যা-মন্দিরে যাওয়া প্রভৃতি শুনে জিজ্ঞেস করলেন, প্রাণতোষ চাটুজ্জেকে

চেনো ? আমি জবাব দিলাম, না।

তিনিই একদিন আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন কাজীদার সঙ্গে। কাজীদা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, প্রাণতোষকে চেনো ? আগের মতই আমি বললাম, না।

হুগলীর ভিক্টোরিয়া হলে (এখন হুগলী পৌরভবন) জেলা কংগ্রেস সম্মেলন। কাজীদার অনুপ্রেরণায় আমি স্বেচ্ছাসেবক, ডিউটি হলের মধ্যেই। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রদেশ-কংগ্রেস নেতা, কলকাতার 'বিগ ফাইভ'-এর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, শ্রীরামপুরের জমিদার তুলসী গোস্বামী। বিভিন্ন ঘোষণায় নামে-মানুষে মিলিয়ে দেখলাম — জেলা-কংগ্রেস সভাপতি নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য, সম্পাদক বিনয়কৃষ্ণ মোদক (বিজয় মোদকের বাবা), বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ বিপ্লবীনেতা দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, মহান বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষকে। নামে-মানুষে মিলিয়ে আরো দেখলাম—খগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয় মোদক, গৌরহরি সোম, হামিদুল হক, সিরাজুল হক প্রমুখ আরো অনেককে। কিন্তু সেই যিনি আমার হাতে 'খোলো মা দুয়ার খোলো' গানটির অনুলিপি তুলে দিয়েছেন এবং আজ আবার আমার বুকে ১নং স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজটি এঁটে দিলেন—তাঁকে তো চেনা হ'লো না নামে-মানুষে মিলিয়ে আজও !

সম্মেলনের একটা পর্ব শেষ হ'লো। দেশাত্মবোধক গান গাইলেন সিরাজুল হক, আবৃত্তি করলেন সেই আবৃত্তিকার, তিনি একটি স্বরচিত গানও গাইলেন। গানটি রীতিমত উদ্দীপনাময়। ৬১ বছর পরে গানখানির একটি শব্দ এখনো মনে গেঁথে আছে। শব্দটি 'অগ্নিনালিকা'।

সম্মেলন শেষে কলকাতায় ফিরে ডি. এম. লাইব্রেরিতে কাজীদার কাছে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করলাম। কাজীদা বললেন, আবৃত্তিকার আমার চেনা, নাম প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। আমি বললাম — সকলকেই তো দেখেছি, কিন্তু কারো সঙ্গে পরিচয় হয়নি। কাজীদা বললেন—

আমারই ভুল হয়েছিল। তোমার হাতে প্রাণতোষকে একটা চিঠি লিখে দিলে, ও-ই তোমাকে টেনে নিয়ে যেত হৈ-হল্লার মাঝখানে।

এই হ'লো প্রাণতোষদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়—প্রাণতোষদার অনুপস্থিতিতে। পরে যখন প্রাণতোষদাকে বলেছি, উনি প্রাণখোলা হাসি উল্লাসে হেসেছেন আর আমি উপভোগ করেছি সে হাসি।

১৯২৯ সালের প্রথমদিকে কাজীদা শুনলেন, আমি নাইট-স্কুলে শ্রমজীবী ছেলেদের স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষক হিসেবে পড়াই। তিনি আমাকে মুজফ্‌ফর আহমদের কাছে পাঠাবেন ঠিক করলেন। কিন্তু বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই মুজফ্‌ফর সাহেব গ্রেপ্তার হলেন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়। প্রাণতোষদা শুনে বললেন—'সেকিরে, তুই মুজফ্‌ফরদার কাছে যাওয়ার সুযোগ পেলি, অথচ গেলি না।'

১৯২৯ সালের শেষদিকে ৬৩ দিন অনশনে থেকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার যতীনদাস মারা গেলেন। মৃতদেহ যখন কলকাতায় এল, হাওড়া থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্যন্ত শুধু মানুষ আর মানুষ। এদিন কোন বাড়িতে ধোঁয়া ওঠেনি—অরন্ধন। এ মহা-মিছিলে প্রাণতোষদাও ছিলেন। তাঁর সাথে সেদিন দেখা হওয়া সম্ভব ছিল না। তবে ছিলেন এটুকু আমি প্রত্যয়ের সংগে বলতে পারি, কেন না, তিনি হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির (পরে পার্টি) সংগে যুক্ত ছিলেন।

১৯২৮-২৯ বরাবর কাজীদার 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ডি. এম. লাইব্রেরির গোপালদার কাছে শুনেছিলাম, গ্রন্থখানি প্রাণতোষদা এবং আমার নামে উৎসর্গ করার প্রস্তাব করেছেন কাজীদা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স-এর বীর বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দাসের নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারী জেলা-ছাত্র সমর-পরিষদের সর্বাধিনায়ক-রূপে চুঁচুড়া ময়দানে গিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলাম এবং ছাত্র-যুবদল নিয়ে আইন-অমান্য করে গ্রেপ্তার হলাম। জেলে বে-আইনিভাবে পাওয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখলাম, বিজয়দা

এবং প্রাণতোষদা গ্রেপ্তার হয়েছেন Statesman-এর সম্পাদক Watson Shooting কেস্-এ। পরে প্রমাণাভাবে তাঁরা মুক্তি পেলেন, কিন্তু মুক্তির সংগে সংগে বিনা-বিচারে আটক হলেন।

এই সময় দীর্ঘদিন প্রাণতোষদার সাথে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ১৯৩৮ সালে ফিরলাম জেল, অন্তরীণ, প্রভৃতি ভোগ করে। এসে একে একে পুরানো কর্মীদের সাথে আবার মিলিত হলাম। জেলা প্রগতি লেখক-সংঘে যোগ দিলাম। প্রাণতোষদা জেল, আটক ও অন্তরীণ পর্বশেষে প্রগতি লেখক-সংঘের চুঁচুড়া-শাখার সভাপতি হলেন এবং সম্পাদক করা হলো আমাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত সুহৃদ-সমিতি গড়ে উঠল, হুগলী জেলাতেও এই সমিতি গড়ে উঠল। তার মধ্যে এলেন প্রাণতোষদা। অ্যাণ্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স এণ্ড আর্টিস্ট এ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠল। প্রাণতোষদা 'সোমেন চন্দ'-হত্যা ঘটনাকে নিয়ে নাটক লিখলেন। সে নাটক অভিনীত হলো—বোধহয় হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভা মাঠে।

১৯৪২ এবং ১৯৪৫ সালে পরপর দু'টি আঘাতে আমি একেবারে অক্ষম হয়ে গেলাম। স্মৃতি, কর্মক্ষমতা, সবই বিপর্যস্ত। এই অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে কিছুটা সেরে উঠেছি।

এখানে বলে রাখি, প্রাণতোষদার একান্ত আগ্রহ এবং সহায়তায় 'দৈনিক কৃষক'-এর মত অনেক কাগজেই আমার লেখা কবিতা ও প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এইভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রামী প্রাণতোষদা, কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধু প্রাণতোষদা মুখচোরা আর-এক স্বাধীনতা সংগ্রামী 'দয়ালদা'-কে প্রকাশ করেছেন।

এখন আমাদের বয়সের ভারে দূরত্ব বেড়েছে। আমি থাকি উত্তর চন্দননগরে আর প্রাণতোষদা শেওড়াফুলিতে। যোগাযোগের মাধ্যম আমার বড়মেয়ে। আর মাঝে মাঝে দেখা হয় সভা-সমিতিতে। এর-মধ্যে দু'বার দেখা হয়েছে কলকাতায়। একবার ফুটনানী হলে—রাজ্য গণতান্ত্রিক লেখক-কলাকুশলী সম্মিলনী গঠনের সভায় আর

একবার একবছর পরে ঐ সংগঠনেরই পূর্ণাবয়ব প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে। এখানে ১৯২৬-২৭-এর প্রাণতোষদার গানের সেই 'অগ্নিনালিকা' শব্দটির পরিপূরক আর-একটি নতুন শব্দ উপহার দিলেন—'ধনকাপালিক'।

আর-একবার দেখা হল একটি 'নজরুল জন্মবার্ষিকী' অনুষ্ঠানে সম্ভবতঃ হারিটে। সেখানে প্রাণতোষদা এই বয়সে কাজীদার 'ঝড়' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনালেন।

কয়েকবারই শুনেছি প্রাণতোষদা গুরুতর অসুস্থ। দেখতে যাবো ভেবেছি কিন্তু পারিনি। ট্রেনে বসে-যাওয়া, একা-যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এমনই অক্ষমতা আমার।

প্রাণতোষদার সাথে এখন পর্যন্ত আমার শেষ দেখা হয়েছে হুগলী ফ্রেণ্ডস লাইব্রেরিতে একটা 'নজরুল অনুশীলন-কেন্দ্র' স্থাপনের অনুষ্ঠানে। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন? বৌদি আসছেন? উনি জবাব দিলেন, এখন আমি তো ভাল আছি, এসেছি। তোমার বৌদি তো অসুস্থ। অসুস্থ আমার চেয়ে বেশী-ই। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু প্রাণতোষদার মন খারাপ হবার নয়। তিনি সেই আমার চির-চেনা হাসি-উল্লাস দিয়ে ঢেকে দিতে চাইলেন আমার বিষন্নতাকে।

তোমরা প্রাণতোষদার জীবনীগ্রন্থ বের করার দায়িত্ব নিয়ে একটা মহৎ কাজ করলে। প্রাণতোষদার কাছ থেকে অনেক শেখার জিনিস আছে। তোমরা দায়িত্ব নিয়ে না করলে পরবর্তী প্রজন্ম জানবে কি করে?

প্রাণতোষদাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আর বইটির সম্পাদনার জন্য সম্রাট সেন, তারক ভড়, বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও স্নেহাশিস জানাই।

৭-৮-৮৮

আমাদের প্রাণতোষদা

☐ সলিলচন্দ্র ঘোষ ☐

সংগীতবিদ্

আটত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের কথা (সঠিক তারিখ মনে নেই)। চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে সংগঠক ও সাহিত্য-রসিক শ্রদ্ধেয় হরিহর চন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় তাঁর "সুদর্শন চক্র" কাজী নজরুল সম্পর্কে একটি সভার আয়োজন করেছিল। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বনামধন্য পবিত্র গাঙ্গুলী মহাশয়। ডঃ তারক ঘোষ উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। ব্যবস্থাপকের আমন্ত্রণে আমার সেখানে যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। শুনলাম কাজী নজরুলের জীবনীকার এবং সঙ্গী শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় নজরুল সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ পড়বেন। সভা চলছে, পবিত্রদা ঘোষণা করলেন, 'প্রাণতোষের দুটি প্রবন্ধ পড়ার কথা। আমি অনুরোধ করি মাত্র একটি প্রবন্ধ যথাসম্ভব ছোট ক'রে পাঠ করুক।' এগিয়ে এলেন একটি ছোটখাটো মানুষ, হাসিখুশি মুখ। মেয়েদের কাছে প্রেমে পড়ার মতো চেহারা না-হলেও তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখে প্রথম দর্শনেই আমি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলাম। তিনি বললেন, 'ওভাবে প্রবন্ধ পড়া যায় না। আমি একটা আবৃত্তি করব।' এই বলে তিনি 'দারিদ্র' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। তাঁর কন্ঠস্বর আমার মধ্যে শিহরণ সৃষ্টি করলো, অতটুকু মানুষ কিন্তু তাঁর বজ্রবিঘোষিত কন্ঠ আমাকে আরও অভিভূত করলো। সভা শেষে দেখলাম, কখন তিনি চলে গিয়েছেন। হরিহরদার কাছে খোঁজ নিয়ে জি টি রোডে গিয়ে দেখি তিনি এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আলাপ-পরিচয় চললো, আমি শেওড়াফুলিতে নেমে পড়লাম। তাঁর কাছ থেকে নেওয়া ঠিকানায় পরদিন সন্ধ্যায় শ্রীরামপুরে পকাম স্ট্রীটে তাঁর বাসায় বন্ধুবর গান্ধীপ্রিয় মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত

হলাম। পরস্পর ভাব-বিনিময়ের পর তাঁকে আমাদের মধুচক্র সাহিত্য-সংসদের (শেওড়াফুলি) পরবর্তী সভায়, চন্দননগরে যে প্রবন্ধটি পড়ার কথা ছিল, তা পাঠ করতে আমন্ত্রণ জানালাম।

নির্ধারিত দিনে শেওড়াফুলি রাজমাঠে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি, এমন সময় দেখলাম এক বলিষ্ঠ যুবক যেন ক্ষিপ্রগতিতে ধেয়ে আসছেন, আর অন্যেরা তার সঙ্গে হাঁটিতে না পেরে প্রায় দৌড়োচ্ছেন। এসে পৌঁছোলেন প্রাণতোষদা, আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাসলেন প্রাণখোলা হাসি। সভা শুরু হল। প্রাণতোষদা প্রবন্ধ দুটি পাঠ করলেন। পড়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন শচীনদা (শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়) এগিয়ে এসে আমার কানে কানে বললেন, 'ঝড়' কবিতা আবৃত্তি করতে বল।' প্রাণতোষদাব কাছে আর্জি জানাতেই তিনি ঈষৎ হেসে জলদগম্ভীর স্বরে শুরু করলেন, ঝড় ঝড় ঝড়, আমি ঝড়···আমি ঝড়···। সমগ্র সভা মুগ্ধ-বিস্ময়ে শুনছে তাঁর আবৃত্তি। বহুবার এই আবৃত্তি কাজী নজরুল ও শিশিরকুমার ভাদুড়ির মুখে শুনেছি। প্রাণতোষদার কণ্ঠে ঐ দুই কন্ঠস্বর সম্মিলিত ভাবব্যঞ্জনায় আমার কানে লেগে রইল চিরকালের জন্য।

প্রাণতোষদা চলে এলেন শেওড়াফুলি গোস্বামী বাগানে। সুযোগ পেলেই উপস্থিত হই তাঁর কাছে। নানান গল্প, আলোচনা, আবৃত্তি, গান চলে। তাঁর বড় মেয়ে গৌরীকে গান শিখতে দিলেন আমার কাছে। পরে তিনি চলে এলেন আমার বাড়ির আরও কাছা-কাছি—গোপীমোহন সিংহ লেনে। শেওড়াফুলিতে আসার পরই তাঁকে মধুচক্র সাহিত্য-সংসদের সভ্য করে নিয়েছিলাম। এখন সংসদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হল, বহুবার তিনি আমাদের সংঘকে অবাঞ্ছিত বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

গোপীমোহন সিংহ লেনের (সর্বমঙ্গলাপল্লী) বাড়িতে আসার পর থেকে প্রাণতোষদা দিনে দিনে অথর্ব হয়ে পড়তে থাকেন। তথাপি তিনি রোজ ভোরে রাজমাঠে বের হতেন এবং কয়েকবার চক্র দিয়ে আমার বাড়িতে চলে আসতেন। এইভাবে সকালটা আমার অভাবিত

আনন্দে কেটে যেত। এইখানেই এক সুন্দর সকালে বুদ্ধদেবকে আমি প্রাণতোষদার হাতে তুলে দিই। বুদ্ধর বাবা গৌরীনাথ শ্রীরামপুর গোঁসাই প্রেসে কাজ করতেন। তিনি বুদ্ধদেবের সাহিত্য-চর্চার ঝোঁকের কথা বলে আমাকে মধুচক্রে সামিল করে নেবার কথা বলেন। আমি সে-পথে না গিয়ে প্রাণতোষদার হাতে তাকে সমর্পণ করায় বুদ্ধদেব আজ প্রাণতোষদার সৃষ্টি হিসেবে গড়ে উঠছে।

প্রাণতোষদার কাছে আমি অনেক কিছু জেনেছি, শিখেছি, নজরুলের বিভিন্ন গানের পটভূমি জেনেছি। বহু অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে সকল তথ্য-সহ গান পরিবেশন করেছি। আশুতোষ প্রয়াণ-গীতি (বাংলার শের···), কৃষকের গান (ওঠ্‌রে চাষী জগৎবাসী), শ্রমিকের গান (ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রীদল) প্রভৃতি বহু গান আমি তাঁর কাছে শিখিছি ও তাঁকে শুনিয়ে তাঁর অনুমোদন লাভ করেছি। তিনি আমাকে বহুবার বলেছেন এগুলির স্বরলিপি ছাপিয়ে প্রচার করতে। ভূমিকা লিখে দেবার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু সাহস করে এগোতে পারি নি।

'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানে বৈচিত্র্য' সম্বন্ধে আলোচনাসহ আমরা বহু নৃত্যগীতাবিচিত্রা কলকাতায় ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে পরিবেশন করে অভিনন্দিত হয়েছি। ইচ্ছা হল—নজরুলের জীবনালেখ্য সংগীতের মাধ্যমে পরিবেশন করবো। প্রাণতোষদাকে মনোবাসনা জানাতেই তিনি তাঁর লাইব্রেরি থেকে নানা বই দিতে লাগলেন এবং আমি নজরুলের জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর অধ্যাত্মসাধনা এবং জরাগ্রস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধারাভাষ্যসহ সংগীতাঞ্জলি রচনা করলাম। পরে এটিকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করলাম। নাম দিলাম 'নজরুল প্রতিভা'। শ্রীরামপুর রবীন্দ্রভবনে ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, বাংলাদেশের ডেপুটি হাই-কমিশনার শোভন-সাহেব এবং প্রাণতোষদার উপস্থিতিতে নৃত্যনাট্যটি পরিবেশিত হলো। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন সবাই। পরে চুরুলিয়ায় নজরুল-মেলায় প্রাণতোষদা আমাদের নিয়ে গেলেন এই নৃত্যনাট্য পরিবেশনের জন্য সেখানে কর্তৃপক্ষ নজরুলের বিদ্রোহী-

সত্তা ও সৈনিক-রূপটুকু দেখার পর তাঁর কাব্যসংগীত-সৃষ্টির অধ্যায় এবং আধ্যাত্মিক পর্যায় দেখতে অস্বীকৃত হয়ে অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। আমরা ফিরে এলাম, প্রাণতোষদাও বিরাট ধাক্কা খেলেন। তবে আমার সান্ত্বনা এটুকুই, প্রাণতোষদার মতে 'নজরুল প্রতিভা'য় আমি ইতিহাস বিকৃত করিনি। প্রাণতোষদার সঙ্গে নজরুল-বিষয়ে আমার মতৈক্য দেখেই একবার সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতনে প্রাণতোষদার জন্মদিনে তাঁর ভাই বিপ্লবী পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় (শান্তিদা) আমায় বলেছিলেন, 'দাদার সঙ্গে আপনার এত প্রেমের কারণ আজ বুঝলাম।' সেদিনের সভায় আমি নজরুলের বিদ্রোহাত্মক গান গেয়েছিলাম।

প্রাণতোষদার স্বাস্থ্য খুবই ভেঙে পড়েছে। আমিও ইদানিং অক্ষম। তাঁর সঙ্গে আমার প্রভাতী মিলনের ২৫/৩০ বছরের অভ্যাস আজ প্রায় বন্ধ। তবে সান্ত্বনা এই যে, মূলতঃ মধুচক্র সাহিত্য-সংসদকে সঙ্গে নিয়েই প্রাণতোষদা বৈদ্যবাটী-শেওড়াফুলি-শ্রীরামপুরের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই তিন শহরও তাঁকে সম্মান জানিয়ে গৌরবান্বিত হয়েছে। আমাকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে গভীর ভাবে ভালবেসেছেন এজন্য আমি কৃতজ্ঞ ও ধন্য। আমার উদ্দেশ্যে লিখিত ১১/৩/৭৬ তারিখের একটি কবিতায় উনি বলেন—

''আমি এক অখ্যাত কবি
বিপ্লবের পথে স্বেচ্ছাসেবী,
স্নেহের ক্ষুধায় আমি পথে পথে ফিরি
স্পর্শাতুর হৃদয়ের বীণাতন্ত্রী লয়ে।
সে তন্ত্রীতে স্পর্শ দিয়ে কী সুর তুলিলে ?
পথচ্যুত-পুষ্প লয়ে ধূলি ঝেড়ে তুমি
আলোর জ্যোতিষ্কলোকে তুলিয়া ধরিলে,
সে ভাব-মিনারে ওঠে সুন্দরের রশ্মি বিকিরণ''...

এ হেন ভালোবাসার উত্তরে এই সুযোগে আমি তাঁকে জানাই আমার হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ঐকান্তিক ভক্তি নিবেদন।

আমার চোখে প্রাণতোষদা

□ বাঁধন সেনগুপ্ত □

প্রাবন্ধিক ও গবেষক

প্রাণতোষদার কথা প্রথম শুনি গৌরী বসুর মুখে। গৌরী অর্থাৎ লেখক সমরেশ বসুর স্ত্রী। তার সুবাদেই নেড়ামামা অর্থাৎ নৈহাটীর অজাতশত্রু প্রভাত চৌধুরীর সঙ্গে আমি শেওড়াফুলিতে গিয়ে প্রাণতোষদার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সে প্রায় বছর পঁচিশেক আগের কথা।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম পরিচয় তিনি একদা নজরুলের স্নেহভাজন সঙ্গী ছিলেন। নজরুল-বিষয়েই তাঁর আজীবন উৎসাহ। কবির বিভিন্ন দিক নিয়ে অজস্র লিখেছেন তিনি। এখনও লিখছেন নজরুল-বিষয়ক তৃতীয় গ্রন্থ।

আমি সে সময় নজরুল-বিষয়ক গবেষণায় ব্যস্ত ছিলাম। তখন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে নজরুল-গবেষণায় সেটাই প্রথম স্বীকৃতি। ফলে প্রাণতোষদার সঙ্গে আলাপের পর আমাদের পরিচয় আরও গভীর হয়ে উঠল।

গবেষণার কাজে অনবরত তাঁর কাছে প্রায় বছর পাঁচেক যেতে হয়েছে। তখন শেওড়াফুলিতে প্রাণতোষদার দোতলার ওই ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প, হাসি আর গানের ফোয়ারা বইত। সুষমা বৌদি তার সাক্ষী। আমার মাধ্যমে নিয়মিত খবরাখবর নিতেন গৌরী আর সমরেশ বসু। গৌরী বসুকে নিয়েও আমি বেশ কয়েকবার শেওড়াফুলি গিয়েছিলুম। প্রাণতোষদা গৌরী বসুকে ভীষণ ভালো-বাসতেন গোড়া থেকেই। ঘরে বিজলি বাতি তখনও অর্থের অভাবে আনা যাচ্ছে না জানতে পেরে গৌরী বসু ছাত্র অলকের হাত দিয়ে গোপনে টাকা পাঠিয়েছিলেন। এই গৌরী বসুই নৈহাটীতে

'ফাল্গুনী'র উৎসবে তাঁকে গুণীজন সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। নজরুল-জন্মদিনে প্রাণতোষদা এই গৌরীর আমন্ত্রণেই ছুটে গিয়েছেন। সমরেশ-পরিবারের সকলের কাছেই তিনি সেদিনের মত আজও শ্রদ্ধার মানুষ। আমাদের হালিশহর বাড়িতেও তিনি এসেছেন কয়েকবার। থেকেছেনও একবার দিন-দুই। আমিও অনেক জায়গায় নিয়ে গেছি এই আপনভোলা মানুষটিকে। জোর করে নিয়ে গিয়ে একবার টেলিভিশনে যূথিকা রায়-সহ আমরা নজরুল-সম্পর্কীয় প্রোগ্রাম করেছি। রেডিওতে আবৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলুম। এক সময়ে বহু জায়গায় সভাসমিতি করে খুব বেড়িয়েছেন প্রাণতোষদা। স্বাস্থ্যের কারণে এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না। বহু অনুষ্ঠানে আমরা উভয়েই আমন্ত্রিত হয়ে গেছি। একবার তো চুরুলিয়ায় নজরুল-উৎসবে প্রাণতোষদা জোর করে আমায় তাঁর ঘরে রাখবার ব্যবস্থা করলেন। উদ্দেশ্য প্রাণভরে মনের কথা বলা।

প্রাণতোষদার বড়ো মেয়ের নামও গৌরী। এখন প্রাণতোষদার 'সুখমালয়'-এ নিচের তলায় ঘর-সংসার করছে সে। লেখক সমরেশের স্ত্রী গৌরী মারা গিয়েছিলেন ন'বছর আগে। সেই দুঃসংবাদটি আমিই প্রাণতোষদার কাছে বহন করে নিয়ে যাই। শোকার্ত প্রাণতোষদা খবর পেয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে স্নেহান্ধ পিতার মত সেদিন বারবার অস্ফুট স্বরে শুধু বলেছিলেন, 'আমার গৌরী চলে গেল।' দু-চোখে তাঁর সেদিন ছিল শুধু জলের ধারা।

আসলে, প্রাণতোষদা মানুষটির তুলনা একমাত্র তিনি নিজেই। পাঁচ ফুটেরও কম উচ্চতার আশীর ঘরে বিচরণ করা এই ছোটোখাটো মানুষটির হৃদযন্ত্রে বেশ কয়েকবার ঘা দিয়ে গেছে সেরিব্রালের থাবা। কানে-গোঁজা যন্ত্রের বয়স প্রায় এক কুড়ির ওপরে। রোজগার বলতে পরাধীন ভারতবর্ষে বেশ কয়েকবছর জেল-খাটার সুবাদে প্রাপ্ত পোলিটিকাল পেনশন তা-ও গোড়ায় ছিল অনিয়মিত প্রাপ্তি। ছুটতে হোতো লালবাড়ি আর ট্রেজারি বিল্ডিংস। আর অসুখ-বিসুখ? সে তো তাঁর প্রায় গত চল্লিশ বছরের সঙ্গী। তবু অভাব এখনও তাকে কাবু

করতে পারেনি। প্রায়ই ডাক্তার আর নিয়মিত ওষুধ খরচই তার পেনশনকে প্রায় হজম করে ফেলে। তবুও দোতলার ওই শ্রীহীন ঘরে আসেন অসংখ্য মানুষ। নামকরা মানুষের পাশাপাশি তরুণ কবি লেখক রাজনৈতিক কর্মী। সবাই তার সঙ্গে কথা বলে। একটু সান্নিধ্য লাভ করে আনন্দ পায়, প্রেরণা লাভ করে উভয়কালের মানুষ।

এমনও চমৎকার কথা বলতে পারেন প্রাণতোষদা। বলার মধ্যে আজও তাঁর আন্তরিকতায় মাখামাখি। কণ্ঠস্বরে আছে গাম্ভীর্যের স্পর্শ এবং ব্যক্তিত্বের মাদকতা। কাউকে আঘাত করার অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। ভালবেসে সবাই তাই তাঁর কাছে আসেন। অসুখের সময় হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে নিয়ে যায়, প্রতিবেশীরা নিয়ে আসে ওষুধ। পুরনো বন্ধুরা প্রয়োজনে কন্যার বিবাহেও নানাভাবে সাহায্য করে এসেছেন। যেমন রেডিয়েণ্ট প্রসেসের কর্ণধার নীরোদ মুখুজ্জে। একদা নীরোদবাবু তাঁকে রেডিয়েণ্টে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। সাহায্যও করেছিলেন নানাভাবে প্রাণতোষদার এই একদা-কারাবাসের সঙ্গী।

প্রথম জীবনে দেশোদ্ধারের নেশায় বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়ে বহু বরণীয় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। নজরুলের সঙ্গে একসাথে তারকেশ্বরের মোহন্তের অনাচারের বিরুদ্ধে অনশনেও অংশ-গ্রহণ করেছিলেন যৌবনের শুরুতে। হুগলীর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের তিনি অন্যতম নায়ক। এক সময় কবিতা লিখেছেন অনেক। ফলে অনেকেই তাঁকে 'চারণ কবি' বলে থাকেন। তাছাড়া পত্রিকার অফিসে সাংবাদিকতার চাকরিও করেছেন বেশ কিছুকাল। নানা পেশায় জীবিকার তাগিদেও তিনি ঘুরেছেন। কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম আর বৈপ্লবিক কর্মের আকর্ষণের টানে কখনো ভাঁটা পড়েনি।

উনবিংশ শতাব্দীর চরিত্রে যে উদারতা ও দেশপ্রেম, বিপ্লবী এবং কবিমন যে স্বপ্নময় জীবনের সন্ধানী ক্যারিস্মার (Charisma) কথা শোনা যায়, প্রাণতোষদা তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছেন। এ বয়সে তাই তিনি দরাজ-গলায় নজরুলের 'ঝড়'-এর মত সুদীর্ঘ

কবিতা আবৃত্তি করতে পারেন বিনা-প্রস্তুতিতে। একরাশ কাশের মত সাদা চুলে ছাওয়া মাথাটিকে নেড়ে গান গাইতে পারেন তিনি আজও। এখন ঠাট্টা আর মজলিসী মেজাজে ভরপুর তিনি। তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব—'প্রাণের পেয়ালা ভরপুর হ্যায় হরদম'। বার্ধক্য তাঁর কাছে মনের দিক থেকে পরাজিত। চোখের জন্যে অবশ্য কয়েক বছর হলো নিজের হাতে চিঠি লিখতে পারছেন না তিনি। আগে অজস্র চিঠি লিখতেন তিনি। আমার কাছেই তো তাঁর লেখা শতাধিক পত্র আছে। প্রবীণ মানুষটির হৃদয়ের রসে জারিত সেই সব পত্রে তাঁকে আরও আপন করে পেয়েছি।

কাকাবাবু অর্থাৎ মুজফ্ফর আহ্মদ খুব স্নেহ করতেন তাঁকে। অনেক সময় আমিও এঁদের দুজনের খবরাখবর বিনিময়ে যুক্ত থেকেছি। তিরিশের দশক থেকে সুরু করে বাঙালি লেখকরা তো প্রায় সকলেই তাঁকে চিনতেন, প্রত্যেকের সঙ্গেই কমবেশী ঘনিষ্ঠতাও ছিল তাঁর। অথচ শহরের মায়া তাঁকে টেনে রাখতে পারেনি। দুই ভাই প্রাণতোষ আর পরিতোষ প্রায় পাশাপাশি পরস্পরকে সামাল দিয়ে এসেছেন। পরিতোষদা অবিবাহিত। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তিনি নেতা এবং সর্বসময়ের কর্মী হিসেবে বাইরে-বাইরে থাকতে হয়। তবু সব সময় তিনি দাদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। দাদার ভালোমন্দ সব বিষয়ে সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েই চালাচ্ছেন দীর্ঘকাল। অথচ কেউ তা জানেনা। আর সুষমা বৌদি? সারা জীবন হাসিমুখে অভাব আর অনিশ্চয়তা, অসুখ আর সংসার, তার ওপর প্রাণতোষদার মত স্পর্শকাতর মানুষের সঙ্গে চিরটাকাল কি মমতায়, ধৈর্যে ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে এলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন যৌবনে তিনি। হয়তো আরও নিশ্চিত জীবন পাওয়া উচিত ছিল তাঁর। তবু এই অনিশ্চয়তা বুকে ভর করেই প্রাণতোষদার সংসারে হাসিমুখে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাটিয়ে যাচ্ছেন বৌদি। এখন তো বৌদি নিজেও প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। তবু প্রাণতোষদার দেখাশোনা, সেবাশুশ্রূষা, অভাব আর

দারিদ্রের মোকাবিলা একলা তিনিই করে চলেছেন। হয়তো উনি থেকেও যাবেন চিরকাল আড়ালে, অনেকটা সেই কাব্যে উপেক্ষিতার মত।

লক্ষ্য করেছি, সাদা পোশাকেই প্রাণতোষদার খুব পছন্দ। সাদা পাঞ্জাবী, ধুতি আর উত্তরীয়, যা দেখলে মনে হয় রুচিবান বাঙালির যোগ্য প্রতিনিধিত্ব, তাই পরিধান করে এসেছেন তিনি চিরকাল। আজও তাঁর কোনো পরিবর্তন হয়নি। যিনি সহজেই ভালবেসে জয় করে এসেছেন, সাদা রং ছাড়া তাঁকে কি অন্য কিছুতে মানায়?

যত দিন যাচ্ছে তত মনে হয় প্রাণতোষদা যা দিয়েছেন বোধহয় তার তুলনায় পাননি তেমন কিছুই। অবহেলার শিকার হয়েও হৃদয়ে বিরাট এই ছোট্ট আকারের মানুষটি সকলকে ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করেই এখনও বেঁচে রয়েছেন। চুরুলিয়ার নজরুল-পুরস্কার ছাড়া কয়েকটি সংবর্ধনায় তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য শেষ। অথচ জীবনের প্রান্তে এসেও তিনি অভাবের তীব্রতায় ডুবে আছেন। এই জাতীয় সৎ, সরল আর সাহসী মানুষরা বোধহয় আমাদের আত্মম্ভরিতা বা ভণ্ডামি দেখে করুণা বোধ করেন। যিনি কারো কাছে প্রত্যাশী নন তাঁকে সহজে কেনা যায়না। প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বাসে নেই যার আস্থা তাঁকে ভয় বা লোভ দেখাবে কোন্ শক্তি, বিশেষ করে, যিনি চিরকাল অন্তরে শ্রদ্ধা আর ভালবাসার ঠাঁই করে নিতে সক্ষম। প্রাণতোষ'দা শতায়ু হোন অন্তিমে এই প্রার্থনা।



হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি
ভাবলি এতেই জাতের জান্।
তাইতে বেকুব করলি তোরা
এক-জাতিকে একশো খান।

—নজরুল

প্রাণতোষদা

□ ধরিত্রী বসু □

সহধর্মিণী, সাহিত্যিক সমরেশ বসু

আমাকে বলা হয়েছে প্রাণতোষদা-সম্পর্কে আমি যা জানি তাই কিছু লিখে জানাতে। প্রথম কথা, এসব লেখালেখি আমার একেবারেই আসে না, যদিও আমি একজন এমন মানুষের স্ত্রী যাঁর রুজি রোজগার সবকিছুই ছিল লেখার মাধ্যমে। অর্থাৎ তিনি একজন 'সর্বক্ষণের লেখক' ছিলেন। তিনি কোন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না সংসারের সবকিছুর চাহিদাই মেটাতেন 'লিখে'।

প্রাণতোষদাকে নিয়ে লেখার কথা তো তাঁদেরই ছিল—গৌরী বসু এবং সমরেশ বসুর। আমি প্রাণতোষদাকে কতটুকুই-বা জানি? তাঁর বিষয়ে কিছু লেখা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার আমার কাছে। আমার দিদির (বড়দির) একটি গানের স্কুল ছিল, নৈহাটিতে, নাম 'ফাল্গুনী'। তার বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আমি প্রথম দেখি প্রাণতোষদা এবং বৌদিকে। বেঁটে ছোটখাটো একটি মানুষ, সাদা ধবধবে মাথার চুল, কানে একটি যন্ত্র লাগানো—পাশে স্ত্রী। মাথার চুল তাঁরও ধবধবে সাদা—সিঁথেয় লাল সিঁদুর ডগডগে, হাতে শাঁখা এবং লোহা, কোন সোনার অলঙ্কার নেই। কানে বোধহয় দুটি সোনার ফুল ছিল। লালপাড় শাড়ি পরা। প্রাণতোষদাকে একটি ছেলে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল। পরে জেনেছি তার নাম হিরণ্ময়। সে ওনার খুবই স্নেহের পাত্র, সেটা অবশ্য পরে বুঝেছি। শুনলাম, উনি (প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়) একজন মস্তবড় গুণী ব্যক্তি এবং কাজী নজরুলের বন্ধু। আমার তো অদম্য কৌতূহল—কাজী নজরুলের বন্ধু না-জানি ওনার সম্পর্কে কত-কথাই বলবেন। কিছুই শুনলাম না শুধু দেখলাম একজন বৃদ্ধ কী প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও মনের ভেতরটা কত সরল তাজা সবুজ রয়েছে।

আমার দিদি খুব ভালো রান্না করতে পারতেন, খুব সুন্দর গানও গাইতে পারতেন। প্রাণতোষদা খুবই পছন্দ করতেন ঐ দুটো জিনিসই। আমাদের বাড়ির যে কোন অনুষ্ঠানে বৌদি ও প্রাণতোষদাকে দেখা যেতই। তবে আমি ওনাকে যেটুকু কাছে থেকে দেখবার বা পাবার সুযোগ পেয়েছি সেটা অবশ্যই হিরণ্ময়ের জন্য। হিরণ্ময় ওনাদের প্রতিবেশী ছেলে। প্রাণতোষদাকে জ্যাঠা-মশাই বলে ডাকে। আমার মনে হলো নিজের বাবার থেকেও বেশী ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

ও-ই আমাকে একদিন শেওড়াফুলি প্রাণতোষদার বাড়িতে নিয়ে যায়। আমার খুবই কৌতূহল ছিল এই ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার প্রতি। আমার কেন জানিনা মনে হয়েছিল—এই স্বামী-স্ত্রী এরাঁ একে-অন্যের পরিপূরক। ১৯৮০ সালের ৫ জুলাই শনিবার বিকেলে আমি হিরণ্ময়ের সঙ্গে ওর বাড়িতে যাই। তার আগে আমার বড়দি কয়েকবারই আমায় জানিয়েছেন একবার শেওড়াফুলি যাবার জন্যে। প্রাণতোষদার শরীর ভালো নয়—আমি যেন একবার ওঁদের সঙ্গে অতি-অবশ্যই দেখা করে আসি। প্রাণতোষদা আর বৌদিও কয়েকবারই জানিয়েছেন যাবার জন্যে। অবশ্য সমরেশ বসু-সহ আর যাওয়া হয়ে উঠছিল না। অবশেষে ঐদিন আমার সময় হোল। প্রাণতোষদার বাড়িতে যাওয়াটা আমার সারাজীবনের মত স্মরণীয় হয়ে রইল। তার কারণ অবশ্য একটাই—যিনি আমায় তাগিদ দিয়ে পাঠালেন তিনি (গৌরী বসু) পরের শনিবারই, আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

আমায় দেখে প্রাণতোষদা বৌদি কেউ প্রথমে বিশ্বাসই করেননি—আমি আসতে পারি। প্রাণতোষদা তো কেঁদেই ফেললেন আনন্দে। আমার মনে হল দীর্ঘদিন বাদে বাড়ির মেয়ে বাপের বাড়িতে এলে যেরকম আনন্দ হয় বাবা মায়ের, আমাকে দেখে ওনাদের সেই রকম অবস্থা হয়েছে। কোথায় বসতে দেবেন, কী করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। আমার সঙ্গে আমার ছেলে গিয়েছিল। তার সঙ্গে তো আগে থেকেই ভীষণ ভাব ছিল। আরো গভীর হয়ে গেল সেটা। উনি যে কত

ছেলেমানুষ মনের দিক থেকে, সেটা বোঝা যাচ্ছিল—আমার ছেলের সঙ্গে ব্যবহারে।

সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়। অবশ্যই সেটা গৌরী বসু ও সমরেশ বসুকে বাদ দিয়ে নয়। সেই আলোচনায়, কাজী নজরুল, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা প্রসঙ্গ এসে পড়েছিল। জীবনে প্রচুর তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সেটা বুঝতে পারলাম এবং দেখলামও। কঠিন সমস্যার এবং দারিদ্রের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করে চলেছেন, কিন্তু নিজের আদর্শ বজায় রেখেছেন ; কোন কারণেই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। এত জ্ঞানী ব্যক্তি হয়েও কারো কোন সাহায্য নেননি। নিজে অত্যন্ত প্রচার-বিমুখ। পিতা হিসেবে খুবই অসুখী। কিন্তু তার জন্য কোন ক্ষোভ নেই। আমি যেদিন ওখান থেকে চলে আসি—তার দিন তিনেক বাদেই গৌরী বসু মারা যান। প্রাণতোষদা ও বৌদি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন—আমি জানি তার গভীরতা কতদূর। কিছুদিন বাদে প্রাণতোষদা আমায় একটা চিঠি দেন, টুনি, একেই বোধহয় বলে ভাগ্য। গৌরী বড়, তুমি ছোট, তার দিন ফুরিয়েছিল তাই যাবার সময় তোমায় পাঠিয়ে ছিল—যাতে আমি একেবারে ভেঙ্গে না পড়ি। আমি মনে করি, গৌরীর প্রতি তোমার শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে সেটাই কর্তব্য হবে, যদি তাঁর গানের স্কুলটাকে ঠিকমতো চালিয়ে নিয়ে যেতে পারো। নৈহাটিতে গানের স্কুল গৌরী বসুর প্রয়াণের পর রাখা সম্ভবপর হয়নি। পাঁচ বছর পরে আমি এবং সমরেশ বসু মিলে একটি গানের স্কুল করি : সমরেশ বসুই সেই স্কুলের নামকরণ করেন—'সঙ্গীতাঙ্গন'। দীর্ঘদিন বাদে আমি ঐ স্কুল উদ্বোধন উপলক্ষে প্রাণতোষদাকে একটা চিঠি দিই এবং হিরন্ময়কে জানাই যদি ওনাদের কোনমতে কোলকাতায় আনা সম্ভব হয়। না, আসা সম্ভব হয়নি। সমরেশ বসুরও আর দেখা হয়নি ওনাদের সঙ্গে। দেখা তো দীর্ঘদিন আমার সঙ্গেও হয়নি আর জানিনা হবে কিনা, তবু প্রাণ কেন টন্ টন্ করে ওঠে সেই বৃদ্ধ ও হাসিমুখ বৃদ্ধার কথা মনে পড়লে ? একেই কি বলে প্রাণের টান !

বিপ্লবী ও কবি
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
জীবন ও সংগ্রাম

□ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় □

১ জন্ম ও বংশ

১৯০৫ সাল।

পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সালটি দিকচিহ্ন। বাঙলার তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন ওই সালেই বাঙলাকে ভাগ করার দুষ্ট চক্রান্তে লিপ্ত। শাসন-কার্যে সুবিধার অছিলায় বাঙলার ঐক্য সংহতি-কে ছিন্ন করার বাসনায় যখন তিনি মগ্ন, সেই সময় বাঙলার ঘরে ঘরে মাতৃগর্ভে পুষ্ট হয়ে উঠছিল বহুসংখ্যক অগ্নিশিশু। খ্যাত-অখ্যাত এইরূপ শত-শত অগ্নিশিশুর ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকাণ্ড কার্জন-সাহেব যদি দেখে যেতেন তবে আতংকে বিস্ফারিত হতেন সন্দেহ নেই।

এই রকমই এক অগ্নিশিশুর জন্ম হল ওই ১৯০৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর, অবিভক্ত বাঙলার ফরিদপুরের এক ঘরে। পরবর্তী জীবনে যিনি সাম্রাজ্যবাদের কঠিন ব্যূহ ভেদ ও ছিন্নভিন্ন করার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে কারাগারে এমনকি ফাঁসির মঞ্চে মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রত্যয়দৃঢ় মনোবল লাভ করেছিলেন, সেই স্থিতধী সংগ্রামী মানুষটির নাম—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।

সচ্ছল তালুকদার মাতামহ শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য (বন্দ্যো) ছিলেন নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁর রীতি ছিল সমাজনিয়মরক্ষা আর নীতি ছিল সাধুতা। চরিত্র ছিল নির্মল। বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকত বাড়িতে, সেই উপলক্ষে বহু লোকের আগমন আহার শয়ন আলাপন। এক আদর্শ অতিথি-নিবাস হয়ে উঠেছিল মাতামহের বাড়িটি। তাঁর সামাজিকতা ও উদারতা ছিল বহুবিদিত।

এই মাতামহের কুলীন-প্রথা অনুযায়ী ছিল তিন বিবাহ। একই গৃহস্থের তিন কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। সতীনদের মধ্যে সদ্ভাব থাকে না এরকমই লোকশ্রুতি, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম। তিন সতীন বেশ মিলে-মিশেই থাকতেন। বৃহৎ সংসারকে মালিন্যহীন চালনা করার মত মানসিকতা তিন সতীনেরই ছিল। সংসারে সেকারণে আনন্দ। নয় পুত্র এবং এক কন্যা। কন্যা অতএব রাজকন্যার মত আদরে পালিত। নামটিও সেই রকম—রাজরাজেশ্বরী। মাতা বরদাসুন্দরী।

রাজরাজেশ্বরীর স্বামী রাজবিহারী চট্টোপাধ্যায় ঢাকা বিক্রমপুরের লোক। তাঁর পিতৃদেব, মনসাচরণ। মনসাচরণ যাঁর সন্তান সেই বৈদ্যনাথ ছিলেন তন্ত্রসাধক। শোনা যায়, তিনি পুজো সেরে সূর্য-মন্ত্র পাঠ করতে-করতেই গত হন। রাজবিহারীর চরিত্রেও স্বাভাবিক ভাবেই এই সাধন-প্রচেষ্টা বর্তায়। বিবাহের পরও তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় পরিভ্রমণ করেছেন ভারতের বহু স্থান। ন্যূনাধিক পাঁচ বছর। বিখ্যাত সাধক তৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দ স্বামীর সংগে তাঁর পরিচয় হয়। ভাস্করানন্দজিই তাঁকে উপদেশ দেন সংসারধর্ম পালনে। ফলে, দীর্ঘদিন পরে এলেও, সংসারে যত না-হোক, উর্দু ফারসি সংস্কৃত বাংলা ও ইংরাজি ভাষার চর্চা ও আকর্ষণ ছিল বেশি।

রাজবিহারীর সংগে রাজরাজেশ্বরীর বিবাহের একটা ইতিহাস আছে। রাজরাজেশ্বরী দেবীর পিতার বাসনা ছিল কন্যার বিবাহ দেবেন এমন পাত্রে যার নামের সংগে উভয়ের নামের মিল থাকে। এই আদ্য অক্ষরদ্বয়ের মিলন-হেতু উভয়ের মিলন। রাজবিহারীবাবুও ছিলেন কুলীন এবং যথারীতি তাঁর পূর্ব বিবাহ ছিল একটি। আদরিণী কন্যাকে কাছ-ছাড়া করবেন না বলেই, প্রাণতোষের দাদামশায়, ঘর-জামাই করেছিলেন রাজবিহারীকে।

এই বিবাহ সংঘটিত হবার পর, রাজবিহারী তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও সন্তানদের বিক্রমপুরে রেখে চলে আসেন শ্বশুরালয়ে,

ফরিদপুরে। দুই সন্তানের জন্ম হয়। প্রথম সন্তান কন্যা—মনোরমা, দ্বিতীয় সন্তান পুত্র – প্রাণতোষ।

রাজবিহারী দ্বিতীয় বিবাহের সময় যৌতুক হিসাবে পেয়েছিলেন একটি সমৃদ্ধশালী তালুক। ওই তালুক থেকে বছরে আয় হতো কয়েক হাজার টাকা। রাজবিহারী ছিলেন সংসার-উদাসীন সত্ত্ব-গুণান্বিত ব্যক্তি। বিষয়-আশয়ের প্রতি আসক্তিহীন। অধিকন্তু, রাজরাজেশ্বরী ছিলেন অক্ষরজ্ঞানবর্জিতা। অতএব বিষয়লোভী দুষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব সহজেই। প্রাণতোষের নয়-মামার মধ্যে ছোটমামা বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য সেই প্রকৃতির। দিদির সম্পত্তি গ্রাস করার বাসনায় এই কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি উলটো-পালটা বুঝিয়ে, ছল-বুদ্ধি ও কূট-কৌশলে, সম্পত্তি উইল করে নিলেন নিজের নামে—দলিলে টিপসই দিয়ে। ফরিদপুরে রাজেশ্বরী দেবীর তালুকের প্রজারা ছিলেন সম্পন্ন মুসলমান-গৃহস্থ। এই বিপর্যয়কর ঘটনার ফলে তাঁরাও মর্মাহত হলেন। আত্মীয়জনের এই নগ্ন বঞ্চনার বলি অসহায়া রাজেশ্বরী দেবীকে অতঃপর ফরিদপুরের বাস ত্যাগ করতে হল। শিশু প্রাণ-তোষের বয়স তখন মাত্র তিনমাস।

২. প্রতাপপুরে

কার্জনের বঙ্গভঙ্গ চক্রান্তকে অগ্রাহ্য করে ফরিদপুরের শিশু, মায়ের কোলে চেপে চলে এল হুগলীতে। প্রাণতোষের সর্বকনিষ্ঠ ন'মামা তারিণীচরণ ভট্টাচার্য তখন পুলিশ-বিভাগের রিজার্ভ ফোর্সের ইনস্পেক্টর। পরে চৌদ্দদল ডাকাত ধরার কৃতিত্বে সর্কেল ইনস্পেক্টর পদে। প্রশস্ত হৃদয় ব্যক্তি। দিদির সম্পত্তি-বিপর্যয়ের কথা যখন শুনলেন তখন নিজেই তাঁকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে—প্রতাপপুরে। বড়দিদি মনোরমাকে নিয়ে আসার কোনো প্রশ্নই ছিল না, কেননা, ফরিদপুরেই তাঁর অকাল-মৃত্যু ঘটেছে। আর রাজবিহারী তখনও দেশান্তরে।

শিশু প্রাণতোষ বড়ো হতে লাগলো। হুগলীর জল-হাওয়ার সংগে প্রাচীন ঐতিহ্য মেশানো। নানান গল্প-গাথায়, রাজনীতিক ওঠা-নামায়, বিদ্যাচর্চায়, নানাভাবে বিধৃত। বালক প্রাণতোষের মনে সেই ঐতিহ্যের ধারা ক্রিয়াশীল হ'তে থাকে। তবে প্রাণতোষ তখন বালক-বীরের ভূমিকায়। সাহসী আর দুরন্ত। পুলিশ-ব্যারাকে যেত ছোটবেলা থেকেই। কৌতূহল, কয়েদীদের দেখা এবং জানা। সেই ব্যারাকেই ছিলেন খোঁড়া-যতীন নামে এক পুলিশ। দানবের মতন বিশাল চেহারা। প্রকৃতিতেও তেমনি নির্মম। কয়েদীদের স্বীকারোক্তি আদায়ে তাঁর পীড়ন ও অত্যাচার ছিল সীমাহীন। অপরাধীদের ব্যারাকে ধরে এনে উলঙ্গ করা, পিপাসার্তদের মুখে পেচ্ছাপ করে দেওয়া, কড়িকাঠে পা বেঁধে, নিচে মুখ ঝুলিয়ে বেত মারা ইত্যাদি নানাবিধ অমানুষিক নির্যাতন। প্রাণতোষ দূর থেকে দেখত আর রাগে ফুলত। রাগে, কাঠের চেলা নিয়ে একদিন মারতে যায় দানব খোঁড়া-যতীনকে বালক-বীর। যতীন হেসে চেলাকাঠটা কেড়ে নিয়ে আক্রমণকারীকে ছেড়ে দেয় কিছু না-বলে যেহেতু সে ইনস্‌পেক-টর-সাহেবের ভাগনে!

তারিণীচরণও পুলিশ—তিনি কিন্তু এভাবে স্বীকারোক্তি আদায় করতেন না। তাঁর আচরণ মোলায়েম, কিন্তু কার্যোদ্ধারে মোক্ষম। এজন্য তাঁকে কখনও নির্মম মনে হয়নি। —এই তারিণীচরণই পরবর্তীকালে বিপ্লবীদলকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন গোপনে।

পুলিশ-মামার তত্ত্বাবধানেই দিন কাটছিল। প্রাণতোষ দিনে দিনে দুরন্ত, স্বভাবে চঞ্চল। সকলের ভালোবাসা পায় এই দুরন্ত-পনার জন্যে, চঞ্চল স্বভাবের জন্যে। তাঁর এই স্বভাব-সুন্দর প্রাণময়-তায় মুগ্ধ এক ফকির নাম রেখেছিলেন—নয়ন। তখন এই ফকির ফরিদপুরে প্রায়ই আসতেন তাঁদের বাড়িতে। রাজরাজেশ্বরী দেবীকে ডাকতেন খুকি বলে। ফকির বাড়িতে এলেই শিশু প্রাণতোষ তাঁর দিকে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত নির্নিমেষ। আকর্ষণ অবশ্যই ফকিরের ঝোলা, উলিডুলি পোশাক, ঝাকড়া চুল আর হাতের

গোপীযন্ত্র। বড়ো বড়ো চোখ মেলে চেয়ে থাকার জন্যই হয়তো 'নয়ন' নাম রাখা কিংবা এও হ'তে পারে যে ফকিরের নাম নয়ন বলেই শিশুর মধ্যে নাম-মাহাত্ম্যে বেঁচে থাকার প্রয়াস। নয়ন ও প্রাণতোষ দুটি নামই বেশ অর্থবহ।

প্রতাপপুরের বাড়িটি তিন মহলা। মহলগুলির গড়ন সেকেলে। বাই-লেনের সংগে যুক্ত। সুন্দর পরিবার। তাঁর বড় বৈঠকখানা-ঘরে নানা-ধরণের লোকের আসা-যাওয়া ছিল। সাহিত্য সংগীত রাজনীতি —সকল বিষয়েই আলোচনা হত। বালক হলেও, ওই বৈঠকখানা-ঘরে তার প্রবেশাধিকার ছিল, বসে থাকত চুপটি করে। প্রতাপপুরের এই বৈঠকখানা প্রাণতোষের জীবনে অনেকখানি, আলোচনার সব-কথা না বুঝলেও, ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ওখানেই।

৩· ছাত্রজীবন

পালকের কলমে তালপাতার বুকে প্রথম আঁচড় সাড়ে চার বছর বয়সে, তার দেড় বছর পরে ইস্কুলে। ছ'বছর বালকের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে জানার আগ্রহ এবং সেই-বিষয়ে প্রশ্নাদিতে ব্যতিব্যস্ত শিক্ষক খুবই অসন্তুষ্ট হতেন, কখনও মৃদু প্রহার, কখনও বেত। আদরে মানুষ, জেদী, কৌতূহলী। ইস্কুলের পক্ষ হতে নালিশ আসতে লাগল অভিভাবকের কাছে। অতএব ইস্কুল পরিবর্তন।

এক প্রাইমারি মিশনারি ইস্কুলে ভর্তি করা হল। ওই ইস্কুলের শিক্ষিকারা ছিলেন স্নেহশীলা, ধৈর্যশীলা। ভালবাসতেন প্রাণতোষকে, এক খ্রীশ্চান ভদ্রমহিলা সন্তানের মত স্নেহ করতেন, তাঁকে গুরু-মার মত শ্রদ্ধা করতেন প্রাণতোষ। ওই ভদ্রমহিলারই যত্নে শেষ হল বিদ্যা-সাগরের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, প্যারি সরকারের ফাস্টর্বুক। পুতুল নিয়ে খেলা শেখাতেন নানারকম। গল্প বলতেন। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে বালক-মন পুষ্টিলাভ করেছিল ওখানেই। চার বছরের পাঠ শেষ।

তারপর বাবুগঞ্জের দত্তদের বাড়িতে সারদা-পণ্ডিতের পাঠশালা।

এই পণ্ডিতমশাই এক বিচিত্র মানুষ। সর্দার-পোড়ো ছাত্র পড়াত আর তিনি সারা দুপুর নিদ্রা যেতেন। ঘুম থেকে উঠে ছাত্রদের তামাক সাজার হুকুম। গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানতেন আর পোড়ো-সর্দারের অপ্রিয় ছাত্রদের নালিশ-অনুসারে, শুরু হত বেত্রাঘাত আর নির্মম কানমলা। বেত্রাঘাতে হাতের তালু ফেটে রক্ত ঝরত আর কর্ণমর্দনে লতি হত রক্তাক্ত। প্রাণতোষ সহপাঠীদের এই নির্যাতন দেখে রাগে ফুঁসত, অসহ্য লাগত। একদিন হুঁকো সাজাবার ভার পড়ল তার উপর। গনগনে টিকের আগুন-ভর্তি কল্কে-সুদ্ধ হুঁকো পণ্ডিতমশায়ের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে দে চম্পট। বলাবাহুল্য তাকে আর ওই পাঠশালায় যেতে হয়নি।

আবার ইস্কুল বদল। মাসতুতো দাদারা পড়ত চুঁচুড়া ডাফ ফ্রি চার্চ মিশনারি হাই ইস্কুলে। প্রাণতোষ ভর্তি হল অষ্টম শ্রেণীতে। তখন অষ্টম ছিল সর্বনিম্ন শ্রেণী। অষ্টম এ বি, সপ্তম এ বি, ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয়, প্রথম—এই ছিল ক্রম।

এই ডাফ ইস্কুলে যে-সব শিক্ষক প্রাণতোষের মন ও চরিত্র গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন—হরেন্দ্রনাথ রায়। ইনি বাংলা ও ইতিহাসের শিক্ষক। হুগলী ইমামবাড়ির কাছে রায়ের গলিতে থাকতেন।

ইংরাজীর শিক্ষক ছিলেন সুবল পাল। থাকতেন, চুঁচড়ো কলেজ রোডে। চমৎকার ইংরাজী পড়াতেন। শুধু বিদ্যাশিক্ষাই নয়, তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল ফুটবল-খেলোয়াড় হিসাবে।

অঙ্কের শিক্ষক—অক্ষয় হাস। ভদ্রলোক নিরস যান্ত্রিকভাবে অঙ্ক কষাতেন, ছাত্রদের অঙ্কের প্রতি অনুরাগের কোনো প্রয়াসই করতেন না। অথচ কোনো ছাত্র অঙ্ক না পারলে রামগাট্টা কষাতেন —মাথা জ্বলে যেত। ফলে ছাত্রদের অপ্রিয়। অক্ষয়বাবু ক্লাস-রুমে ঢুকলেই তাঁর নামের পদবীর অনুসরণে ছাত্ররা প্যাক প্যাক করে ডেকে উঠত। ক্রোধে, তৎক্ষণাৎ প্রবলবেগে শুরু হয়ে যেত সেই রামগাট্টার ঝড়বৃষ্টি।

গিরিশ মণ্ডল—বাইবেল পড়াতেন। এই গিরিশ মণ্ডলকে নিয়েই এক কাণ্ড ঘটে গেল। প্রাণতোষ তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। সেদিন গিরিশবাবু বাইবেল পড়াতে-পড়াতে হিন্দু-দেবদেবীর উদ্দেশ্যে কটূক্তি করেছিলেন। বাইবেলের সঙ্গে তুলনা করে হিন্দুধর্মগ্রন্থ-গুলিকে হেয় করেছিলেন। প্রাণতোষ বাইবেলের প্রথম পাঠ নিয়েছিল মিশনারি ইস্কুলে, 'গুরুমা'-র কোলে বসে যীশুর অজস্র কাহিনী শুনেছে, যীশুর আত্মত্যাগ তাকে অনুপ্রাণিত করেছে--কিন্তু বাইবেলে কোথাও অন্য ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই। তাই, গিরিশবাবুর কথা শুনতে-শুনতে সে সহজেই বুঝতে পারল শিক্ষক বিকৃত ব্যাখ্যা করছেন। প্রাণতোষ প্রতিবাদ করে উঠল। গিরিশবাবু একটু হক্‌-চকিয়ে গেলেন, স্তম্ভিত। একঘর ছাত্রের সামনে তাঁকে অসম্মান! হাতে উঠে এল তেল-চুক্‌চুকে বেত। আঘাতের পর আঘাত। প্রাণতোষ শিউরে উঠছিল বটে কিন্তু চোখে জল নেই। আঘাত সহ্য করতে হবে। অন্যায়ের প্রতিবাদে শক্তিমানের হাতে অত্যাচার সহ্য করতে হবে। ছোট হলেও, সেই শিক্ষা ওই শিক্ষকের কাছে। শিক্ষকের হাতের বাইবেল-বইখানা ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে চীৎকার করে উঠল—'হরিবোল'। তার বালক-বয়সের এই প্রতিবাদী ঘটনাটি হুগলীর বিপ্লব-ইতিহাসে সংরক্ষণযোগ্য।

ইস্কুলে হইহই পড়ে গেল। কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় গিরিশবাবুরই দোষ কিন্তু প্রাণতোষের অপরাধ আরও মারাত্মক। মিশনারি ইস্কুলে বাইবেল ছেঁড়া অমার্জনীয় অপরাধ। অতএব বিদ্যালয় থেকে বিতরণ। সার্টিফিকেটে 'গুড' না লিখে 'ফেয়ার'।

জানুয়ারী, ১৯২০। প্রাণতোষ আবার ভর্তি হল সোম ট্রেনিং একাডেমিতে। চুঁচুড়া, রায়ের বেড়ে, এই স্কুলটি এখনো আছে। এখানে পড়াশোনার ধরণ ছিল ফ্রি চার্চ মিশনারি ইস্কুলের মতই। পড়াশোনা চলছিল।

এই সময়ে গোটা ভারতবর্ষ উত্তাল। ঠিক আগের বছরে পাঞ্জা-বের জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ও'ডায়ারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড

ঘটে গেছে। ঘরে ঘরে তরুণদের বুকে প্রতিহিংসার আগুন। ইস্কুলে, কলেজে, বৈঠকখানায়, রাস্তায়, চায়ের দোকানে, সর্বত্র চাপা উত্তেজনা। তারিণীচরণের বৈঠকখানায় বসত সান্ধ্য-মজলিশ। রাজবিহারীবাবু তখন ফিরে এসেছেন প্রতাপপুরে। তাঁর ছিল অসাধারণ মজলিশী-শক্তি। সেখানে আসতেন শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী, স্থানীয় মৌলবী, উকিল -- সকলের জন্যেই ছিল অবারিত দ্বার। সাহিত্য সংগীত শিল্প ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের সংগে চলত স্বদেশী আলোচনাও। রাজবিহারীবাবু অবশ্য রাজনীতির আলোচনায় বিশেষ যোগ দিতেন না। কারণ, ওই একটি বিষয় তিনি বুঝতেন না। অথচ পুত্র প্রাণতোষ দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হত এবং প্রবল উত্তেজনা বোধ করত। বয়স তখন মাত্র পনেরো।

১৯২১ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখটি 'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস' নামে পালিত হল। চুঁচুড়ার ময়দানে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করলেন খুলনার বিখ্যাত জননেতা—জালালউদ্দীন হাসেমী এবং আরও অনেকে। হাসেমীর বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চুঁচুড়া কোর্ট বর্জন করলেন বিখ্যাত উকিল নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গৌরহরি সোম ও নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। শিক্ষকরা বর্জন করলেন 'ইংরেজদের গোলামখানা ইস্কুল কলেজ—ছাত্রদের মনেও বিদ্যালয়-বর্জনের প্রতিজ্ঞা। গান্ধীজীও ডাক দিলেন সারা ভারতের ছাত্রসমাজকে শিক্ষায়তন বর্জনে। প্রাণতোষ প্রস্তুত ছিল, সোজা ট্রেনিং একাডেমিতে যাওয়া বন্ধ করল। লেখাপড়া সেখানেই ইতি, ১৯২১ সাল।

৪. হুগলী বিদ্যামন্দিরে

ইস্কুল তো ত্যাগ করা হল, এবার কি করা যায়? ভবিষ্যতের পথের দিশা অন্বেষণে উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণতোষের তখন এলোমেলো জীবন। কেবলই অন্বেষণ। সংগী সাত বছরের ছোটভাই শান্তি যার পোশাকি নাম পরিতোষ। পরিতোষের জন্ম প্রতাপপুরেই।

বাঙলার বিপ্লব-আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বছরটি হল – ১৯২১ সাল। তখন ঘরে-বাইরে দেশ-চেতনার সাড়া—টগবগ করে ফুটছে সারা দেশ উত্তেজনায়। সেই সময় দু'জন আদর্শবাদী যুবকের সংস্পর্শে এলেন প্রাণতোষ। একজন বিপ্লবী সিরাজুল হক অন্যজন বিপ্লবী বিজয় মোদক—এঁরা দুজনেই ছিলেন বিপ্লবী-মন্ত্রে দীক্ষিত।

এই দুই নেতা কিশোর প্রাণতোষকে নিয়ে এলেন হুগলী বিদ্যামন্দিরে। নামেই বিদ্যামন্দির প্রকৃতপক্ষে এখানে যা শিক্ষা দেওয়া হত তা দেশ-প্রেমের শিক্ষা, বিপ্লবী হবার শিক্ষা।

পথের সন্ধান পাওয়া গেল এখানেই। সন্ধান দিলেন 'মন্দিরের' গুরু অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। তাঁর চেহারাটি দীর্ঘ, শ্যামবর্ণ : খাটো ধুতি আর ফতুয়া পরনে। ছাত্রবৎসল, মনটি ছিল নরম, কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর বিপ্লবী মন ছিল ইস্পাত-কঠিন।

মাস্টার মশাই - নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। হুগলী মহসীন কলেজে ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক থাকাকালীন স্বদেশী করার পরিচয়ে তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। বরং আরও বেশী পীড়ন ও অত্যাচারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। হুগলীতে বিপ্লবী-আন্দোলনের প্রাণ-পুরুষ এই মানুষটিকে নিস্তেজ ও নির্জীব করার জন্যে ব্রিটিশ-সরকার তাঁর প্রাণবন্ত চোখ দুটিতে টাকা ঢুকিয়ে টোকা মেরে অন্ধ করে দিতে চেয়েছে, নির্জন বন্ধঘরে আটক রেখে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছে। এমনি কত অত্যাচার। শরীর ভেঙেছে বটে কিন্তু অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে সহ্য করে গেছেন সব। বিদ্যামন্দিরে এই-রকম এক মাস্টার-মশাইয়ের হাতে তৈরী ছাত্ররা হলেন—বিজয় মোদক সিরাজুল হক হামিদুল হক জনার্দন চক্রবর্তী গোপীনাথ সাহা প্রমুখ। তাঁর স্নেহধারায় সঞ্জীবিত হয়েছেন প্রাণতোষও।

বিজয় মোদক বিদ্যামন্দিরের কৃতী ছাত্র—পরে যাদবপুর ইঞ্জি-নীয়ারিং কলেজ থেকে কৃতিত্বের সংগে পাশ করে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করেন। হুগলীর বিখ্যাত মোদক-পরিবারের সন্তান

হওয়া সত্ত্বেও অর্থোপার্জন অপেক্ষা দেশের কাজকেই বড়ো করে দেখেন। এই পরিবারের সকলেই বড়ো বড়ো কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পিতা বিনয়কৃষ্ণ বাঙলাদেশের বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়ার—ইনি গান্ধী-আন্দোলনে উদ্দীপ্ত হয়ে সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক হন। পিতৃপদ অনুসরণ করে বিজয়ও হলেন সর্বত্যাগী—সক্রিয় কর্মী। শাসকদলের 'সুনজরে' পড়ে আবদ্ধ হলেন সুদূর রাজস্থানের দেউলী বন্দীনিবাসে। বন্দী থাকাকালীন মার্কস্-এঙ্গেলস-লেনিনের বই তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে এবং তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। এই বিজয় মোদক প্রাণতোষের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উপস্থিত। প্রাণতোষ পরবর্তীকালে মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন মূলতঃ বিজয় মোদকের অনুপ্রেরণায়।

বিদ্যামন্দিরে প্রাণতোষের আর-এক শিক্ষক ছিলেন—সিরাজুল হক। জন্ম ১৯০৪, হুগলীরই বাসিন্দা। হুগলী ব্রাঞ্চ-ইস্কুলে পড়াশোনা। সুপুরুষ। বলিষ্ঠ চেহারা। দশাসই লম্বা-চওড়া পুরুষ, তেজোদীপ্ত। সর্বদা হাসিমুখ এবং সেজন্য ছাত্রদের কাছে প্রিয় শিক্ষক। প্রাণতোষ সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিল শিক্ষকের প্রতি এবং শিক্ষকও ছাত্রের প্রতি। সিরাজুলের কাজ ছিল—গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করা। প্রাণতোষ জানতেন কাজটি অতিশয় কঠিন এবং সে-কাজের উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন সিরাজুল হক—বাইরে কুসুমের মত কোমল ভিতরে বজ্রের মত কঠোর। এই শিক্ষকটিকে প্রাণতোষ কখনও ভোলেননি।

বিদ্যামন্দিরে সমসাময়িক যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে গোপাল মান্না হৃদয় মোদক প্রমুখ, পূর্বতন ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্র সেন, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল মান্না ও আরও অনেকে। গোপাল মান্না ছিলেন গান্ধীবাদী। তাঁর দলে তখন ছিলেন বর্তমান ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা নির্মল ঘোষ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল গৌরহরি সোম ছিলেন তাঁদের নেতা। ত্যাগী ও বৈষ্ণব গৌরহরি সবসময় হরিনাম করতেন বলে লোকে তাঁকে বলত—হুগলীর গান্ধী। প্রফুল্লচন্দ্র সেনও ছিলেন

কট্টর গান্ধীপন্থী। এই পরিণত বয়সেও (৯০) গান্ধীজীর নীতি অনুসরণ করে চলেছেন নিষ্ঠাসহকারে।

দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী যোদ্ধা। তাঁর বক্তৃতায় ছিল আগুন। মাঠে-ময়দানে তিনি এমন তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ-বিরোধী বক্তৃতা করতেন যে পুলিশ তাঁকে যত্রতত্র আক্রমণ করেছে এবং হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে মরা-জন্তুর মত। এবং থানায় নিয়ে গিয়ে করেছে বেদম প্রহার।

বনেদী বংশের ছেলে এই দুর্গাদাস। তাঁর বাবা ছিলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। দাদা হাইকোর্টের উকিল এবং কাকা হুগলী কোর্টের জজ। নিজে এম-এ পাশ। মেকী আভিজাত্য ও শিক্ষাভিমান তাঁর ছিল না। সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন দেশের কাজে। দেশের মানুষই ছিল তাঁর আপন-মানুষ। যখন যেখানে থাকতেন সেইখানকার মানুষের কাছে আহার ও একফালি শয়নের স্থান চেয়ে নিতেন। কখনও অনাহার কখনও ভূমিশয্যা। আর ছিল হুগলী জেল আর আলিপুর সেন্ট্রাল জেল—আহার-নিদ্রার প্রকৃষ্ট স্থান। এই সর্বত্যাগী মানুষটির কথা কি ইতিহাস মনে রেখেছে ?

বিদ্যামন্দিরে নানা জায়গা থেকে নানা চরিত্রের ছাত্র আসত। তাঁদের মধ্যে দেশের জন্যে উৎসর্গিকৃত ছেলে যেমন থাকত ছদ্মবেশী পুলিশের স্পাই-ও। প্রফুল্ল বর্মণ তেমনি একজন। সে নিপুণ হাতে চরকা কাটত, সুতো মাজত ও পাক দিত। নানাজনের ফরমাস খাটত হাসিমুখে। সে ছিল গান্ধীবাদী গোপাল মান্নার দলের লোক। গোপাল মান্না তাকে চিনতে পারেননি। কিন্তু চিনেছিলেন বিজয় মোদক আর সিরাজুল হক। সিরাজুল-সাহেব তখন চাকরি করতেন হুগলী চুঁচুড়া পুর-প্রতিষ্ঠানে। লাইট-ইনস্পেক্টরের চাকরি। তিনি জানতে পারলেন, প্রফুল্ল বর্মণ মহসীন হাসপাতালের জনৈকা লেডি-ডাক্তার মিসেস চৌধুরীকে 'মা' সম্বোধন করত। ডাঃ মিসেস চৌধুরীর দুই ছেলের মধ্যে একজনের নাম -শচীন। এই ছেলেটি অতিশয় বখাটে। গোপনে পুলিশকে খবর দেওয়াই ছিল তার কাজ।

এই শচীনকে বিদ্যামন্দিরের ভেতরের কথা জানাত প্রফুল্ল বর্মণ। আর শচীন জানাত পুলিশকে। এইভাবে বিদ্যামন্দিরের গুপ্ত-সংবাদ চলে যেত বাইরে। ফলে, সমস্ত পরিকল্পনা হত বানচাল।

বিজয় মোদক ও সিরাজ-সাহেব অতর্কিতে একদিন পাকড়াও করলেন প্রফুল্ল বর্মণকে। তার এক চোখ ছিল কানা, পাথর বসানো। তাকে মারতে মারতে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে রাস্তায় এনে ফেলার সময়, খোঁচা লেগে তার অন্য চোখটিও নষ্ট হয়ে যায়। পুলিশের আড়কাঠি হবার সাধ তার চিরকালের মত ঘুচে যায়।

৫. কর্মদায়িত্ব

হুগলী বিদ্যামন্দিরে কর্মীদের মধ্যে দুটো ভাগ ছিল। একদল—গান্ধীবাদী, অন্যদল—সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী। প্রাণতোষ শেষোক্ত দলে—বিদ্যামন্দিরে প্রবেশের পর এই গুপ্ত-সংগঠনে মেলামেশার ফলে তাঁর পথ ও মত নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

জাতীয় মহাসভার প্রস্তাবে ও নির্দেশে ভারতে জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হলে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে দেশে নানাস্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। হুগলীতে ছাত্রশক্তিকে সংহত করে, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সামিল করার মানসে, নিখিল-ভারত জাতীয় বিদ্যালয়ের অধীনে চুঁচুড়ার হুগলী বিদ্যামন্দির গড়েছিলেন ভূপতি মজুমদার ও গৌরহরি সোম। সেটা ১৯২১ সাল। গৌরহরি সোম ছিলেন নামকরা উকিল। আইন-ব্যবসা বর্জন করেই তিনি দেশ-সেবায় নেমেছিলেন। গৌরহরিবাবু অবশ্য পরে কোর্টে যাতায়াত সুরু করেছিলেন। এই বিদ্যামন্দিরের আর-এক ব্যক্তিত্ব নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই নগেন্দ্রনাথ ছিলেন ঋষিকল্প পুরুষ। তাঁর উজ্জ্বল শ্যাম গাত্রবর্ণ, বাবরি চুল, দীর্ঘ নাসা, গভীর দৃষ্টি। মুণ্ডিত মস্তক। হাঁটু অবধি লম্বা খদ্দরের ধুতি, ধীর ও প্রশান্ত তাঁর চেহারাতেই ছিল এক ধরনের শুচিতা। নেতা হবার বাসনা তাঁর ছিল না। তবু গোপীনাথ সাহা, সিরাজুল, দুর্গাদাস, প্রফুল্ল সেন,

হামিদ্দুল, বিজয় মোদক, প্রাণতোষ সকলেই তাঁকে মান্য করতেন। নগেন্দ্রনাথ আজীবন ত্যাগ সাধন করে গেছেন।

বিদ্যামন্দির যেমন ছিল অনুশীলনী কেন্দ্র তেমনি অতিথি-নিবাসও। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিপ্লবীরা মিলিত হতেন। কেউ-বা পলাতক-জীবনের কিছুকাল কাটিয়ে যেতেন, কেউ-বা মাস্টার-মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ-মানসে, কেউ-বা পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে।

বিদ্যামন্দির মূলতঃ কংগ্রেসি-আন্দোলনের ধারায় পরিস্ফুট ছিল। কিন্তু এর পাশে পাশে গুপ্ত-আন্দোলনের ধারাটিও প্রবাহিত ছিল। সিরাজুল হক ও বিজয় মোদক ছিলেন তার পাণ্ডা। প্রাণতোষ হলেন সিরাজ-বিজয়ের অনুগামী।

বিদ্যামন্দিরকে প্রাণতোষ প্রাণাধিক ভালবাসতেন। নগেন্দ্রনাথের আদর্শের অন্তর্গত সত্যটিকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 'গায়ত্রী' পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাণতোষ এক জায়গায় লিখেছেন, '---এই বিদ্যামন্দির যেন ছিল শক্তির ভাণ্ডার, ঠিক ডায়নামোর মত। জাতীয় সৈনিকদের যেন এখান থেকে রক্তের মত দেশের ধমনীতে প্রবাহিত করে দেওয়া হত। এরই চালক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ।' ---গায়ত্রী, পৃ. ১০৭-০৮।

বিদ্যামন্দিরে স্বেচ্ছাসেবকদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা হত লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে। এ ব্যাপারে কর্মীদের ঘুরতে হত জেলায়-জেলায়। প্রাণতোষের উপর দায়িত্ব ছিল স্থানীয় অঞ্চল-সমূহে—হুগলী চুঁচুড়া চন্দননগর, কখনও ত্রিবেণী অনাথ-কর্মীদের সঙ্গে। গৃহবধূগণ তাঁদের ঝুলি ভরিয়ে দিতেন—চাল ডাল আলু বেগুন প্রভৃতি সামগ্রীতে, কেউ-বা ভাণ্ডার থেকে এনে দিতেন তেল ঘি। সে-সব জমা হত ষণ্ডেশ্বর-তলার অনাথ-ভাণ্ডারে। প্রাণতোষের ভারি উৎসাহ ছিল এসব কাজে। সামান্য হলেও, এ-ও তো দেশের কাজ!

সিরাজুল হক ইতিমধ্যেই জড়িয়ে গেছেন গুপ্ত-আন্দোলনে। বোমার খোল, দেশি রিভালবার, পিস্তল প্রভৃতি মেরামত করা, তৈরী করা ও সংগ্রহের কাজে তিনি লিপ্ত হয়ে গেছেন। সিরাজুল হক

বিশ্বাসী ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবে। কংগ্রেসি আখড়ায় অবস্থান করেও তিনি ভিন্ন মেরুর পথিক। তার আগে ১৯২১ থেকে ১৯২৭ এই সাত বছরে বিদ্যামন্দিরের বহু তরুণ কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে, ভগৎ সিং-এর 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি'তে যোগ দেয়। ভাই পরিতোষও সেই দলে। ফলে প্রায় শূন্য কংগ্রেসি ঘাঁটি আগলাবার ভার পড়ে সিরাজুল হক, হামিদুল হক আর বিজয় মোদকের ওপর। এই তিন যুবনেতাই প্রাণতোষের ওপর চাপিয়ে দেন বিপ্লবীদলের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের ভার।

প্রাণতোষ মানুষটি ছোট্টখাট্টো, সুগঠিত শরীর, লাবণ্যময়। চোখে-মুখে দৃঢ়তার প্রকাশ। প্রাণতোষ পেলেন মনের মত কাজ। ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস ছিল গল্প-কবিতা লেখা আর গলা-ছেড়ে গান গাওয়া। গ্রামে-গঞ্জে, মফঃস্বলে-শহরে, বস্তিতে, পল্লীতে বিপ্লবের গান গেয়ে-গেয়ে মানুষের হৃদয় জয় করে, গণ-সংযোগের কাজে মাতোয়ারা হয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে এই সাংস্কৃতিক কর্ম তাঁর সাহিত্য-রচনায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

বাড়িতে তাঁর এই দাপাদাপি জানাজানি হয়ে যায়। পিতা রাজবিহারী মোটেই সুচক্ষে দেখলেন না। কনিষ্ঠ পুত্র শান্তি (পরিতোষের ডাকনাম) যাতে বিপথে না যায় সেজন্য তিনি তাকে আগলে রাখেন জ্যেষ্ঠপুত্রের আওতা হতে। প্রাণতোষকে তিনি শুধু বকাঝকাই করতেন না প্রহারও করেছেন কখনও কখনও। প্রাণতোষের তাতে জেদ বেড়ে গেছে আরও। পিতা অধিক পীড়ন করলে, প্রাণতোষ বিদ্যামন্দিরে গিয়ে রাত কাটাতেন. শয়ন ও আহার দুই-ই চলত ওখানে। কোনও দিন-বা কোনো বিপ্লবী বন্ধুর বাড়িতে।

প্রাণতোষের মাতা রাজরাজেশ্বরী দেবী কিন্তু অসন্তুষ্ট ছিলেন না। জ্যেষ্ঠ-পুত্রটিকে তিনি উত্তমরূপে চিনতেন। তাই স্বামীর অজ্ঞাতে পুত্রকে নানাভাবে সাহায্যও করতেন। বলতেন, 'বাবা আমার কাছে থেকেই তুই যা খুশী কর, বাড়িছাড়া হোস্‌নে।' প্রাণতোষ কথা রেখেছিলেন এবং মা-কেই 'কমরেড' বানিয়ে ঘরেই বসিয়েছিলেন

বিপ্লবীদের গোপন-আড্ডা।

তারিণীবাবু সবই বুঝতেন। তাঁর অবস্থা সঙ্গীন। তিনি পুলিশের লোক। শাসক ইংরেজের অধীনে চাকরি। তাঁর ঘরেই কিনা গুপ্ত-সমিতির আড্ডা! এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! সাপের ছুঁচো গেলা। না-পারেন উগরাতে না-পারেন গিলতে। তবু চুপচাপ থাকতেন। তিনি নিচে বৈঠকখানা-ঘরে বসে কাগজ পড়েন আর ওপরের ঘরে প্রাণতোষ পরিতোষ ও রাজরাজেশ্বরী দেবী এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা নাইট্রিক সালফিউরিক দিয়ে বোমার জন্য 'গান কটন' তৈরী করেন। বোমার খোল আসে। রাজরাজেশ্বরী নিজের জিম্মায় রাখেন।

প্রতাপপুরের বাড়ির যে-মহলে ওঁরা থাকতেন সেখানে একফালি মাটির উঠোন ছিল আর সিঁড়ির নিচে ছোট একটা ঘর। সেই ঘরেই বড় একটা ট্রাঙ্কে বোমার খোল জমাতেন রাজরাজেশ্বরী দেবী। ট্রাঙ্কের ওপর থাকত পুরু মাটির প্রলেপ আর তার ওপর আলুগাছের চারা। তাঁর এই বুদ্ধিবলে ধরা পরার সম্ভাবনা ছিল কম। অধিকন্তু, পাশের বাড়ির বধূদের সাথী করে নিয়েছিলেন। পুলিশ-ভ্রাতা তারিণীবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি কতবার বোমা-ভর্তি স্যুটকেশ পাচার করে দিয়েছেন তাদের হাত-মারফৎ।

পুলিশ একবার বাড়ি ঘেরাও করেছে। প্রাণতোষ-পরিতোষ বাড়ি নেই। ওপরের ঘরে আত্মগোপন করে আছেন দুজন পলাতক স্বদেশী আর আছে ট্রাঙ্ক ভর্তি বোমা। শুরু হল সার্চিং। নিচে প্রাণতোষের লাইব্রেরি-ঘর, খাবার-ঘর, রান্নাঘর। তন্নতন্ন করে খুঁজে এবং কিছু না পেয়ে, ওরা উঠতে লাগল সিঁড়ি ভেঙে ওপরে। সমূহ বিপদ। রাজরাজেশ্বরী দাঁড়ালেন সিঁড়ির মুখে, নির্ভয়। আপ্যায়ণের ভঙ্গি, মিষ্টি সুরে বললেম, 'আসুন। নিচে কিছু পেলেম না তো, ওপরেও কিছু পাবেন কিনা সন্দেহ। এটা আমার শোবার ঘর আর ওটা রান্নাঘর। বাকিগুলো অন্যান্য শরিকের।'

অফিসারটি রাজরাজেশ্বরী দেবীর নিরুদ্বিগ্ন শান্ত মুখের দিকে

ক' মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন অপলক। তারপর ফিরে গেলেন বাহিনী নিয়ে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সকলে।

এই বাড়িটার ওপর পুলিশের নজর ছিল বরাবর। আড়কাঠিরাও ছিল সতর্ক ও সন্ধানী কিন্তু বিপ্লবীদের সতর্কতা আরও বেশি। পুলিশের আক্রমণের পূর্বেই, এ বাড়ির আপত্তিকর জিনিস ও আত্ম-গোপনকারী পলাতক ব্যক্তিও বাড়ির আশ্রয়ে কিম্বা দূরে চালান হয়ে যেত। পরিতোষের কাজ বেড়ে যেত খুব। গোপনীয় চিঠি ও নির্দেশনামা, সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র তাকেই সব পাঠাতে হত এক-জায়গা থেকে আর-এক-জায়গায়। সে অল্প বয়সেই দলের একজন নির্ভরশীল কর্মী হয়ে উঠেছিল। মা এবং দুই ছেলের কমতৎপরতায় পুলিশ একেবারে থ' হয়ে যেত।

তারিণীবাবুর সংকট থাকা সত্ত্বেও, প্রাণতোষের কার্যকলাপ মনে-মনে সমর্থন করতেন তিনি। তাঁর মত পুলিশ-অফিসার সে-সময়ে দুর্লভ ছিল না। তারিণীবাবুকেও বিপ্লবীদের আস্তানায় গিয়ে হানা দিতে হত, ধরপাকড়ের পরিবর্তে বরং সতর্ক করে দিয়ে আসতেন। বলতেন, 'আজ রাতে কেউ বাড়ি থেকো না, মাঝরাতে 'রেইড' হবে।'

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত পুলিশ-অফিসারদের নাম উপেক্ষিত। প্রাণতোষ তাঁকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করেছেন আজীবন।

৬. কল্যাণ-সমিতির কথা

বিদ্যামন্দিরেব নিচের ঘরটি ছিল ব্যায়ামের আখড়া। সেখানে বক্সিং প্র্যাকটিসের জন্যে বালি বা কাঠের গুঁড়ো-ভর্তি অনেকগুলো ব্যাগ টাঙানো ছিল। ছেলেরা প্র্যাকটিস করত। উদ্দেশ্য দেহমনকে সতেজ করে তোলা। সিরাজুল হক হামিদুল হক (সিরাজ-সাহেবের দাদা), বিজয় মোদক, বীরেন ও ধীরেন ঘোষ প্রমুখ কর্মিগণ ব্যায়ামান্তে যখন রাস্তায় বেরুতেন, তখন লোকে তাঁদের সুগঠিত স্বাস্থ্যের পানে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকত।

প্রাণতোষ প্রতাপপুরের বাড়িতে একটা সমিতি খুললেন—নাম দিলেন 'কল্যাণ সমিতি'। এই সমিতির প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ব্যায়াম-চর্চা, কিন্তু পরোক্ষে বিপ্লবী-দলের জন্যে ছেলে-সংগ্রহ। প্রাণতোষ ছিলেন এ কাজে পটু। তাঁর সমিতির পাঠাগারে দেশি-বিদেশি গঠনমূলক পুস্তকের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ ছিল। বিপ্লবীদের জীবনী-গ্রন্থ ছাড়াও, দেহ ও মনের কাঠামো মজবুত করার জন্যে প্রবন্ধ-পুস্তক ও কাব্যগ্রন্থ থাকত। আর থাকত কলকাতা ঢাকা চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহর থেকে প্রকাশিত নানা পত্র-পত্রিকা। ধূমকেতু লাঙল গণবাণী প্রবাসী ভারতবর্ষ বেণু আনন্দবাজার নায়ক প্রভৃতি পত্রিকার সংগ্রহ। কল্যাণ-সমিতির এই পাঠাগারটি এমনই আকর্ষক ছিল যে বয়সনির্বিশেষে বালক বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর পাঠকের আগমন সেখানে ঘটত। প্রাণতোষের হাতে-গড়া কল্যাণ-সমিতির এই পাঠাগারটি আজও বর্তমান আছে এবং ক্রমশ পত্রে ও পুস্তকে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

পাঠাগারের সঙ্গে ব্যায়ামাগার যুক্ত ছিল বটে কিন্তু পরিসর বড়ো অল্প বলে, বৃহৎ আকারে তাকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় তার পরিকল্পনা ও স্থান-নির্ধারণের জন্যে এক বৈঠক ডাকা হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উদ্যোগী প্রাণতোষ, সহযোগী পরিতোষ এবং পরামর্শদাতা হরিপদ চৌধুরী, বিজয় মোদক ও সিরাজুল হক প্রমুখ। প্রতাপপুর ঘুঁটিয়াবাজারে যুগলকিশোর মল্লিক মহাশয়ের একখণ্ড জমি ছিল। ধানকল সুরকি-কল তেলকল প্রতিষ্ঠার জন্যে রক্ষিত পতিত জমি। এই যুগলকিশোরের নাতি কংগ্রেসসেবী নটবর মল্লিক। যুগলকিশোরবাবু অনুমতি দিলেন ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করার। কিন্তু শুধু জমি পেলেই তো হবে না, ব্যায়ামের সরঞ্জাম দরকার এবং সেজন্যে অর্থের প্রয়োজন। প্রাণতোষ ও পরিতোষের উপনয়ন উপলক্ষে প্রাপ্ত বহু আঙটি ছিল। সেগুলো বিক্রি করা হল। প্রাণতোষের পিতৃপ্রদত্ত গলার মফচেন বিক্রয় হল। পরিবর্তে কেনা হল—প্যারালাল বার, রিঙ, ট্রাপিজ, হরাইজেন্টাল-বার, বারবেল, ডামবেল, ছোটলাঠি, বড়োলাঠি, গদা, কাঠের ছুরি প্রভৃতি।

জমি হল, সরঞ্জাম হল, কিন্তু আচ্ছাদন কই ? অর্থ শেষ হয়ে গেছে অতএব অন্যার্থ ব্যবস্থা নিতে হল একটা। কাছাকাছি মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পোড়ো বাড়ি। সে-বাড়িতে কারো বাস নেই। কিন্তু আছে সেকালের বড়-বড় কড়ি-বরগা, ভারী ভারী দরজা-জানালা। প্রয়োজন ওইগুলোই। ভার নিলেন পরিতোষ। সঙ্গী হরিপদ চৌধরী ও কল্যাণ-সমিতির করিৎকর্মা কয়েকজন সভ্য। পরিতোষের নেতৃত্বে ওই-সব কড়ি-বরগা আর দরজা-জানালা এসে উঠল মল্লিক মশায়ের জমিতে। দ্রুত তৈরী হয়ে গেল আচ্ছাদন, প্যারালাল হরাইজেন্টাল আর ট্রাপিজের বার। কল্যাণ-সমিতির পাঠাগারের জন্য আলমারি। টেবিল, চেয়ার।

এ এক নতুন পদক্ষেপ। প্রাণতোষ কল্যাণ-সমিতির কাজে আত্মমগ্ন হলেন। তাঁদের কর্মোদ্যোগে আকৃষ্ট হয়ে সমিতিতে ভর্তি হতে লাগল ছেলে-মেয়ে দলে দলে। প্রাণতোষের ভূমিকা হল ছেলে-মেয়েদের দেহে-মনে বলিষ্ঠ করে তোলা। ভবিষ্যৎ গুপ্ত-সমিতির নির্ভীক সৈনিক করে তোলা। এজন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করতেন। সাহস ও শক্তির প্রেরণা যোগাতেন। একদিনের সামান্য একটি ঘটনা। সমিতির সভ্যা শ্রীমতি শান্তি দত্ত (পাল) ছিলেন অতীব সুন্দরী। উঁচু বংশ এবং উঁচু শিক্ষা। সমিতি থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। কয়েকটি উঠতি-মস্তান তার পেছনে লাগে। টিটকিরি এবং কুৎসিত ইসারা। শান্তি ওদের বন্ধুরূপে পেতে চাইল, বললও সেকথা। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। পুনরায় কু-বাক্য শুনে শান্তি একজনের গালে সজোরে এক চড়। সে ঘুরে পড়ল। এদিকে হান্টার নিয়ে ছুটে এসেছেন প্রাণতোষ। তাঁর গৈরিক পোশাক; রুদ্রমূর্তি। ছেলেগুলো ক্ষমা চাইল এবং সমিতির সভ্য হতে চাইল। প্রাণতোষ তাদের সভ্য করে নিয়েছিলেন।

প্রাণতোষ যেমন উত্তমরূপে ছুরিখেলা জানতেন তেমনি ছেলে-মেয়েদের ঐ খেলা শেখাতেন পরিশ্রমে ও নিষ্ঠায়। প্রিয় ছাত্রী শান্তির একবার ইচ্ছা হল গুরুর সঙ্গে সত্যিকারের ছুরিখেলা করবে।

প্রাণতোষ নিষেধ করা সত্ত্বেও যখন সে শুনল না তখন খেলতে হল। শান্তির ডান হাতের তালু চিরে যায়। ফার্স্ট এড্-এর ব্যবস্থা ছিল। ওর হাত ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হয়। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতে শান্তি পরদিন আবার এসেছিল এবং খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। এরকমই তৈরী হয়েছিল কল্যাণ-সমিতির ছেলেমেয়েরা অধিকন্তু যুযুৎসুর শিক্ষা নিত সবাই। ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছিল ওরা।

হুগলী-চুঁচুড়ায় বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে তুলতে কল্যাণ-সমিতির ভূমিকা ঐতিহাসিক সত্য। আজ একথা ক'জন মনে রেখেছেন ? কল্যাণ-সমিতির পাঠাগারের বহু দুর্মূল্য বই হুগলীর বংশী সেনগুপ্ত ও চন্দননগরের কিছু কর্মী নষ্ট করেছে। তদন্তে এসে পুলিশের দ্বারাও নষ্ট হয়েছে বহু বই। তবু জনগণের সহযোগিতায় পাঠাগারটি টিঁকে আছে আজও।

অতঃপর. দেশ-সেবার বৃহত্তর ডাকে নিজের হাতে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করা কল্যাণ-সমিতিকে পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে চললেন সম্মুখের কণ্টকাকীর্ণ পথে।

৭. কাজীর সঙ্গে দেখা

১৯২১ সালের শেষদিক।

হুগলী-কংগ্রেসের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ভূপতি মজুমদার এক প্রাণময় পুরুষকে নিয়ে আসেন হুগলী বিদ্যামন্দিরে। বলিষ্ঠ চেহারা, চওড়া কাঁধ, বাবরি চুল আর বিস্ফারিত মায়াময় দৃষ্টি। ইনি বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

ভূপতি মজুমদার ও তাঁর দুই ভাই যতীন ও শৈলেন ছিলেন বিপ্লবী। ছোটভাই শৈলেন বিপ্লবী দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং ভূপতিবাবু পরবর্তীকালে 'সুবিধাবাদের' ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় নেন। তবে ভূপতিবাবু যে নজরুলকে বিদ্যামন্দিরে এনেছিলেন এটা ঘটনা। ভূপতিবাবু চেয়েছিলেন কাজী নজরুলের উত্তপ্ত উপস্থিতি বিদ্যামন্দিরের বিপ্লবীদের মনে বেশি করে উত্তাপ ছড়াক।

বিদ্যামন্দিরের হলঘরে নজরুল উপস্থিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের মন জয় করে নিলেন। আবৃত্তি করলেন একাধিক কবিতা, গান গাইলেন অজস্র। আগুনের পরশমণির ছোঁয়ায় প্রাণ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বড়োদের মধ্যে বিজয় মোদক, হামিদুল, বীরেন ঘোষ, সিরাজুল, প্রাণতোষ আর ছোটদের মধ্যে পরিতোষ হৃদয় (বিজয় মোদকের ভাই) নজরুলের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হলেন। নজরুল অল্প দিনের মধ্যেই গোটা হুগলী অঞ্চলের অতি-প্রিয় পুরুষ হয়ে উঠলেন।

কলকাতায় কাজী নজরুল থাকতেন বত্রিশ নম্বর কলেজ স্কোয়ারে। প্রাণতোষ তাঁর কাছে যান ১৯২২ সালে, সঙ্গে বিদ্যা-মন্দিরের ছেলেরা। নজরুল সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁদের এবং শোনালেন আবৃত্তি ও গান। 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলছেন আর আলাপ করছেন। মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল নজরুলের।

প্রাণতোষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের চিন্তা ও চেতনায় নজরুলের প্রভাব অপরিসীম। কাজীর আবৃত্তি, কবিতা ও গান প্রাণতোষের মনে আনে প্রবল উদ্দীপনা। বিশেষ করে কৃষাণের গান, ধীবরের গান, কুলিমজুরের গান—প্রাণতোষের প্রাণের ঊষর ভূমি ভাসিয়ে দেয়।

১৯২৩ সালে রাজবন্দী হয়ে ভূপতি মজুমদার তখন জেলে আর ১৯২৪ সালে নজরুল হিন্দুকন্যা আশালতা দেবীকে বিবাহ করে হইচই বাধিয়ে দিয়েছেন। এই বিবাহের ফলে মুসলিম-সমাজ নজরুলের ওপর বিরূপ আর হিন্দু-সমাজেও স্বীকৃতি নেই। কবি কলকাতার পাট তুলে দিয়ে হুগলীতে চলে এলেন। হুগলীতেও সেই দশা। বন্ধু ভূপতি কারাগারের বাইরে থাকলে তবু খানিক বল-ভরসা পাওয়া যেত। বাড়ি-ভাড়া পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। এই সময় এগিয়ে এলেন বিপ্লবী-কর্মী বীরেন ঘোষ। তিনি তাঁর এক দাদা খগেন ঘোষ মহাশয়ের কাঠঘড়ার বাড়িতে কবিকে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিলেন। কিন্তু সেখানে কবি ও কবি-পত্নীর অসুবিধা হচ্ছিল। হামিদুল হক ছিলেন বাইরে, ফিরে এসে কবি ও কবি-পত্নীকে বাসা

ঠিক করে দিলেন মোগলপুরা লেনের একটি বাড়িতে।

এই বাড়িতেই আসতেন কল্লোল-গোষ্ঠীর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোকুল নাগ ও আরও বহু সাহিত্যিক। রাজনৈতীক কর্মীরা তো ছিলেনই। এই আড্ডায় প্রাণতোষের ছিল অবাধ গতায়াত। কারণ হামিদুল সিরাজুল প্রমুখের সঙ্গে তাঁকেও কাজী-সাহেব বন্ধু করে নিয়েছিলেন। শুধু বন্ধু নয় পথ-প্রদর্শকও বলা যায়।

মোগলাপুরা লেনে এই কবি-আসর প্রাণতোষের প্রাণে সুপ্ত সাহিত্যের বীজ আরো বেশি করে আলো-হাওয়া পেয়ে উপ্ত হল। বহু কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হল। প্রাণতোষের রাজ-নৈতিক চেতনার সঙ্গে সাহিত্যিক মননশীলতার পরিচয় পেয়ে কাজী-সাহেব তাঁকে আপন করে নিয়েছিলেন। প্রাণতোষ মারফৎ অনেক দর্শনপ্রার্থী সহজেই কাজীর সান্নিধ্যে যেতে পেরেছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজীর পরিচয় প্রাণতোষের মারফৎই হয়। বিবেকানন্দ অকপটে স্বীকার করেছেন সেই কথা রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাঙলাদেশ' নামক গ্রন্থে। ওই গ্রন্থের ১৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দ লিখেছেন ঃ

"১৯২৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার পর ভাগ্যের সন্ধানে—অর্থাৎ কলেজে ভর্তি হওয়া যদি সম্ভব হয় কিম্বা অগত্যা একটা চাকরি—যদিও দুটোই আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, তবু দুরাশায় এলাম হুগলী-চুঁচুড়ায় এক আত্মীয়ের বাসায়। সেখানে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমার সমবয়সী এবং কি-এক সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সখ্যতা হয়ে গেল। প্রাণতোষ শহরের ছেলে, খুব চট্‌পটে, স্মার্ট, আর আমি পূর্ববঙ্গের পাড়াগাঁয়ের ছেলে, লাজুক এবং ভীরু। কিন্তু আমি হুগলী-চুঁচুড়া পেঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণতোষ আমায় বললেন ঃ 'চলো-না কাজীদার কাছে যাই।'

'কাজীদা? কাজীদা কে?' —আমি সহসা বুঝতে না পেরে প্রাণতোষকে জিগ্যেস করলুম।

প্রাণতোষ একটু গর্বের সঙ্গেই জবাব দিল ঃ 'আরে কী বোকা, কাজীদা—কাজী নজরুল ইসলাম, বিদ্রোহী কবি নজরুল।'

আমি তো প্রাণতোষের কথা শুনে হতভম্ব। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বিখ্যাত লোকেদের কথা শুধু বইতে পড়েছি, কিন্তু চাক্ষুষ তাঁদের দেখতে পাওয়া যায়, এমন ধারণা কখনও ছিল না। বিশেষতঃ বিদ্রোহী কবি নজরুল, যাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তায় তখন আমাদের তরুণ মনের তিন-ভুবন আচ্ছন্ন। এমন লোককে দেখতে পাব, এ তো তিন জন্মের তপস্যার ফল। কিন্তু প্রাণতোষ শহরে ছেলেদের মত চালবাজী করছে না তো এবং আমার মত বাঙালকে জব্দ করার ফিকিরে নেই তো?

কিন্তু সমস্ত সংশয় কাটিয়ে প্রাণতোষের সঙ্গে সত্যি সত্যি চললুম। হুগলী শহরের একটা সাধারণ পল্লী, একটা সাধারণ দোতলা ছোট বাড়ির সামনে আমি ও প্রাণতোষ দাঁড়ালাম। অপরিমিত কৌতূহলে আমি বাড়িটার দিকে তাকালাম। তখন সকালবেলা, তারিখটা মনে নেই, কোথাও নোট করেও রাখিনি। প্রাণতোষ একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলো—'কাজীদা! কাজীদা বাড়ি আছেন, আমি প্রাণতোষ—'

কিছুক্ষণ বাদেই সিঁড়ি দিয়ে একজনকে নেমে আসতে দেখা গেল—ঝাঁকড়া কোকড়ানো চুল, ভারী গোল মুখ, অপূর্ব দুটি আয়ত চোখ, প্রসন্ন বদন, সমগ্র মুখমণ্ডলে যেন একটা ঔজ্জ্বল্যের আভা। মুহূর্তেই বুঝতে পারলুম যিনি নেমে এলেন, তিনি স্বয়ং বিদ্রোহী-কবি নজরুল ইসলাম।

প্রাণতোষ ঈষৎ কৌতুকের ভঙ্গীতে বিদ্রোহী-কবিকে জিগ্যেস করলো—'বলুন তো কাজীদা, কাকে সঙ্গে এনেছি?'

বলাবাহুল্য যে, আমরা দুজনে তখন ছেলেমানুষ, প্রশ্নটাও ছেলেমানুষের মত, কাজেই মুহূর্তের জন্য আমি বোধহয় বিব্রত বোধ করলুম। নজরুল ইসলাম সোজা আমার মুখের দিকে তাকালেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর পরিস্কার কন্ঠে বললেন, 'বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।"

এরকম অনেকেই। শুধু এক্ষেত্রে নয়, নানাভাবে নানাদিকে প্রাণতোষের অকৃপণ সাহায্য পেয়ে বহুজন অখ্যাতির কানাগলি থেকে খ্যাতির রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন, কই, তাঁরা তো কোনোভাবেই স্বীকৃতি জানাননি।

বিচিত্র এ দেশ!

বিরাট-হৃদয় নজরুল দাদার মত বন্ধুর মত প্রাণতোষকে স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। তাঁর এ মহত্ত্ব ভোলবার নয়। কত সামান্যকে অসামান্য দানে ধনী করেছেন, কত উদ্‌ভ্রান্ত ঝোড়ো-মানুষকে পথ দেখিয়েছেন, কত মানুষের স্বপ্নকে করেছেন সার্থক। হুগলী শহরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

৮· চারণের বেশে

কাজীর সংস্পর্শে এসে প্রাণতোষ বিশেষভাবে উপলব্ধি করলেন, গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ মানুষের কাছে যাওয়া জরুরি। আগে ধারণা ছিল এবং এখনও কংগ্রেসীদের মধ্যে এই ধারণা আছে যে, শহরে বসে বুদ্ধি-জীবীদের নিয়েই বিপ্লব হয়। ধারণাটি ভুল। নিপীড়িত লাঞ্ছিত জনগণই আসল শক্তি। এদের উদ্বুদ্ধ করাই প্রকৃত দেশপ্রেমীর কাজ। গান্ধীজী একাজে অনেকখানি এগিয়েছিলেন, কিন্তু উন্মুক্ত বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা না থাকায় তাঁর আন্দোলন ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। নজরুল ছিলেন এ ব্যাপারে ঠিক বিপরীত মার্গে।

কাজী নজরুল সৈনিক থাকাকালীন 'লালফৌজ' কথাটি শুনে-ছিলেন। ক্রমে তার বিস্তৃত পরিচয়ে পৌঁছে যান। রাশিয়ার বিপ্লব সম্বন্ধে পড়াশোনা আলোচনা ও লেখালেখি চলতে থাকে। নজরুলের এই উত্তরণ ও চিন্তাধারার বিবর্তন প্রাণতোষকে প্রভাবিত করে। প্রাণতোষ স্থির করলেন, শহরে নয় গ্রামে গঞ্জে বস্তিতে অবহেলিত মানুষের কাছে যাবেন, তাদের মধ্যে কাজ করবেন। তৈরী হল দল। নজরুল উদ্দীপনা যুগিয়েছেন—সিরাজুল বিজয় প্রাণতোষ এবং আরও অনেককে নিয়ে তৈরী হল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

সুরু হল গ্রামে গঞ্জে যাত্রা। হুগলী হাওড়া চব্বিশ পরগণা নদীয়া ঢাকা ফরিদপুর—বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে কেবলই সাড়া-জাগানোর পালা। নজরুল গ্রামীন মানুষের হর্ষবিষাদ সুখ-দুঃখ আশা-হতাশা নিয়ে লিখতে লাগলেন কবিতা, গান; আর প্রাণতোষ হলেন সেই সৃষ্টিকর্মে সামিল, প্রাণতোষও লিখতে লাগলেন অজস্র গান ও কবিতা। সেই সৃষ্টিকর্মের সর্বত্র কাব্যিক সুষমা না-থাকলেও ছিল একান্তভাবে গানমুখি। প্রাণতোষকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে গান ও কবিতা রচনার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে আসেন সিরাজুল বিজয় মোদক ও কাজী নজরুল। গণ-অভ্যুত্থানের সে এক গৌববময় অধ্যায়।

১৯২৮ সালে প্রতাপপুরে প্রাণতোষের আস্তানায় একটি সভা হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন হুগলীর বিজয় মোদক সিরাজুল হক হামিদুল হক, চন্দননগরের দয়াল কুমার, উত্তরপাড়ার বরেন ও সুন্দরীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি দল প্রস্তুত হয়। দলটির নাম ঠিক হয় 'ওয়াণ্ডার ভোগাল'। 'ওয়াণ্ডার ভোগাল' জার্মানির এক-জাতের যাযাবর পাখির নাম। এরা একটা বিশেষ ঋতুতে সুমিষ্ট সুরে গান গেয়ে ফেরে গ্রামে-গ্রামান্তরে। এই নবগঠিত দলটির ওপর সেইরূপ নির্দেশ দেওয়া হল—বিপ্লবের গান গেয়ে বেড়াতে হবে গ্রামে-গঞ্জে। প্রাণতোষের ওপরই ভার পড়ল গান লেখা ও গান গাওয়া। প্রাণতোষ গান লিখলেন ঃ

ঘরে যে আর রইতে নারি
 দিল যে ডাক বাইরে.
আমরা হেঁটে কাঁটার বনে
 পথ কেটে দিই আয়রে।
ঘরের মাঝে নাইরে জীবন
পরের সাথে করলে মিলন
পাবি রতন মনের মতন।
 (পথ) সার করেছি তাইরে।

ঘর ছেড়ে আজ চলরে সবাই
ভাঙতে শিকল ডাক দিয়ে যাই,
ঘর ছেড়ে আয় পাড়ায় পাড়ায়
(চল) মুক্তির গান গাইরে।

স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে
আয় ছুটে ভাই চারিভিতে,
ভয়ের শিকল চলু ভাঙিতে
(তবেই স্বাধীন ভারত পাইরে।
(তাই) ঘরে ঘরে গাঁয়ে গাঁয়ে যাইরে।
(আর) এ ছাড়া পথ নাইরে ॥

এই গানে সুর দিয়েছিলেন সিরাজুল। এই গান গাইতে একবার তরুণ কর্মীরা হুগলী চুঁচুড়া চন্দননগর শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া পরিক্রমা করে, হরিপালের শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস-নেতা ডাঃ আশুতোষ দাসের কল্যাণ সঙ্ঘ আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ডাঃ দাস সমাদরে সকলের আহারের ব্যবস্থা করলেন। নিজেদের গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে রাজবলহাট হেমচন্দ্র পাঠাগারে। এখানেই খাওয়া-থাকা ও বিশ্রাম।

হেমচন্দ্র পাঠাগারকে কেন্দ্র করে গ্রামে গ্রামে আবৃত্তি ও গান। 'ওয়াণ্ডার ভোগাল'-এ তখন ছিলেন উত্তরপাড়ার চিত্ত দত্ত ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবী-নেতা ফণী চট্টোপাধ্যায়ের ভাই কৃষ্ণ পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় হীরেণ সুর ও আরও অনেকে।

তবু এই দলটি সার্থক হয়নি।

সেই সময়ে লেখা প্রাণতোষের অজস্র গান অনাদরে অবহেলায় বিস্মৃতির অতলে। পাঠকের কারো কাছে যদি থাকে তাহলে আমাদের কাছে পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব।

এবার চারণ-কবি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। রাজপুতনায় একদল গীতি-কবি বীরত্বব্যঞ্জক গান গেয়ে একদা জন-মানসকে দেশ-চেতনায় উদ্বোধিত করে তুলতেন, তাঁরাই চারণ-কবি নামে পরিচিত

হয়ে ওঠেন। এদেশে মুকুন্দ দাস যেমন। কাজী নজরুলকে সেই অর্থে চারণ-কবি বলা যায় এবং প্রাণতোষকেও। কেবল কৃষক-শ্রমিকের মধ্যেই নয় হুকুমচাঁদ জুটমিল জগদ্দল জুটমিল জনসন-নিকল্‌সন ও বহু জায়গায় শ্রমিক-জাগরণেও তাঁদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

একবার হুকুমচাঁদ জুটমিলে জেনারেল ম্যানেজার ও তার এ্যাসিস্‌টেন্ট এক শ্রমিকের পেটে লাথি মেরে তার প্লিহা ফাটিয়ে দেয়। প্রতিবাদে একদল শ্রমিক ধর্মঘট করে এবং অপর এক শ্রমিকদল বিরোধিতা করে। নজরুল বুঝলেন এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ধর্মঘট হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর দল নিয়ে মিল-গেটের সামনে গিয়ে হাজির এবং হিন্দি-বাংলা মেশানো এমন-এক সাড়া-জাগানো গান গাইলেন যে ধর্মঘটী শ্রমিকরা মনোবল ফিরে পেল আর বিরোধী দলও ভুল বুঝে ধর্মঘটে সামিল হল। নজরুল এখানেও থেমে থাকেননি। সুদূর বজবজ পর্যন্ত গিয়ে শ্রমিকদের সংহত করে তোলেন। কাজীর এইসব ধর্মঘটী-গানগুলি কোথায় হারিয়ে গেছে।

কাজী নজরুল তাঁর 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতার এক জায়গায় বলেছেন ঃ 'চারণের বেশে ফিরি দেশে দেশে গান গেয়ে'। বিদ্রোহী-কবি হিসেবে তাঁর পরিচয় যেমন বহু-বিস্তৃত তেমনি চারণ-কবিরূপে পরিচয় পাশাপাশি থাকা উচিত। হুগলী ও চব্বিশ পরগণার সংস্কৃতি ও বিপ্লবের ইতিহাসে কাজীর অসামান্য ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

৯. চন্দননগরে

বৃটিশ-ভারতে চন্দননগর ছিল এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শহর। শহরটি ফরাসী-অধিকৃত হওয়ায় ইংরেজেদের আধিপত্য বা আইনগত ক্ষমতা ছিল না। ফলে, যে-কেউ একবার চন্দননগরে ঢুকে পড়লে নিজেকে নিরাপদ মনে করত। এই কারণে চন্দননগর ছিল বিপ্লবীদের আত্মগোপনের ভরসাস্থল। শুধু বাঙলা নয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিপ্লবীরা চন্দননগরে এসে আশ্রয় নিতেন।

এই শহরেই জন্মেছিলেন দুই মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও

কানাইলাল দত্ত। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও আরও অনেকের জন্মস্থান এই চন্দননগর। অরবিন্দ ঘোষ এই শহরে আত্মগোপন করেছিলেন বিভিন্ন ব্যক্তির বাড়িতে। চন্দননগরে বিপ্লবীরা মিলিত হতেন গোপনে, আলাপ-আলোচনা চলত, কর্মসূচী নির্ধারণ করা হত। এই শহর বিপ্লবীদের কাছে ছিল তীর্থ।

১৯২২ সালে বিজয় মোদক প্রাণতোষকে নিয়ে এলেন চন্দননগর রথতলায় একটা গোপন আড্ডায়। সেই আড্ডায় পরিচয় হয় বিপ্লবী ও ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের সঙ্গে। ইনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভার্দুনে গিয়েছিলেন রণক্ষেত্রে। এঁর সঙ্গে অধ্যাপক জ্যোতিষ-চন্দ্রের সখ্য ছিল। সিদ্ধেশ্বর ও অন্যান্য সর্বভারতীয় বিপ্লবীর সম্মিলনের সেই গোপন আড্ডা প্রাণতোষের মনে গাঁথা হয়ে যায় এবং তা থেকে প্রচুর প্রেরণা লাভ করেন।

বিজয় মোদক আরও একটি কাজ করেন। প্রাণতোষকে হুগলীর যুবসমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। এই যুবসমিতিরই মূলে ছিল চন্দননগর রথতলার একটি দোতলা বাড়িতে। বাড়িটির ওপর তলায় ছিল গোপন আস্তানা আর নিচের তলায় সারি সারি দোকান। এইরকম একটি দোকান ছিল ব্রজেন পালের। চন্দননগর পালপাড়ার এই ব্রজেন পাল ছিলেন বিপ্লবী-দলের পুরানো-আমলের সভ্য। তাঁর ছিল কাপড়ের দোকান। সেলাই-মেশিন। তিনি দর্জির কাজও করতেন। এর সবটাই ছিল বহিরঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে দোকানের মাধ্যমে তিনি নানা খবর সংগ্রহ করতেন আর যুবসমিতিকে জানাতেন। আর যে কাজটি করতেন সেটি বিশেষ গুরুতর। দর্জির কাজে ব্যবহৃত, ডেলিভারী দেবার ব্যাগের মধ্যে তিনি নিষিদ্ধ পুস্তক, অস্ত্র, পত্র ইত্যাদি চালান করে দিতেন নির্বিঘ্নে।

আর একটি কাজ করতেন ব্রজেন পাল। যুবসমিতিতে নতুন ছেলে এলে, তার ওপর তীক্ষ্ম নজর রাখতেন। এমনকি পদোন্নতির ব্যাপারে, কর্মীর আচার-আচরণ নিষ্ঠা ও কর্ম-প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিচার করে সমিতিকে তিনি পরামর্শ দিতেন। চন্দননগর যুবসমিতির

ইতিহাসে ব্রজেন পাল এক উল্লেখযোগ্য নাম।

চন্দননগরের বিপ্লবীরা মোটামুটি তিনটি কেন্দ্র আশ্রয়স্থলরূপে বেছে নিয়েছিলেন। ১. যুবসমিতি ২. সন্তান সঙ্ঘ ও ৩. কল্কি সঙ্ঘ। প্রাণতোষ এই কেন্দ্রের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। বিপ্লবী শ্রীশ ঘোষ প্রাণতোষকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর আড্ডায় (বর্তমান রাসবিহারী বসু রাস্তা) প্রাণতোষের যাতায়াত ছিল। শ্রীশ ঘোষের প্রেরণা প্রাণতোষকে বিপুলভাবে উদ্দীপিত করেছে।

চন্দননগরের বিপ্লব-কেন্দ্রগুলিকে মহিমান্বিত করেছেন—কানাইলাল দত্ত মণীন্দ্র নায়েক মতিলাল রায় জ্যোতিষ সিংহ শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ দুর্গাদাস শেঠ ডাঃ হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অরুণ দত্ত (কানাইলাল দত্তের ভাই) ব্রজেন পাল প্রমুখ। যুবসমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিষ সিংহ জাপানে গিয়েছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরবর্তী পন্থা নির্ধারণ করতে। দুর্ভাগ্যক্রমে. স্বদেশ ফিরে চন্দননগর হাসপাতালের সামনে চলন্ত বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে তিনি মারা যান। কানাইলাল ফাঁসির কাঠে প্রাণ দেন। শ্রীশ ঘোষ শাসক-সম্প্রদায়ের অত্যাচারে পাগল হয়ে যান। চন্দননগরে বিপ্লবী-সত্তা তবু দমিত হয়নি।

হিন্দুদের নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করে প্রাণতোষ ও যুবসমিতির অন্যান্য বিপ্লবীরা বেশ হইচই বাধিয়ে দেন। তাঁরা নাইট-ইস্কুল খুলে নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। রোগীর সেবা, বিপন্নদের উদ্ধার, শবদাহ প্রভৃতি নানা কাজের মধ্যে তাঁদের ব্যাপ্তি ঘটেছিল। যুবসমিতিতেই ওঁদের খাওয়া এবং থাকা। একত্রে মিলে-মিশে থাকার দরুণ একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন সকলে।

বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন। প্রাণতোষের সঙ্গে শুধু যোগ ছিল তাঁর মা আর ছোটভাই পরিতোষের। চন্দননগরের সাধারণ মানুষ কিন্তু সাহায্য করতেন খুব। এমন-কি অন্ত্যজ-সমাজের নারীরাও। প্রাণতোষ একবার রিক্সা চেপে আসছিলেন, পুলিশ করেছে তাড়া। গলির মুখে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে, দ্রুত মদের দোকান

থেকে নিলেন একটা খালি বোতল, সেটা বগলে চেপে রাস্তার অপর পার্শ্বে দাঁড়ানো এক রূপোজীবিনীর কাছে যেতেই পুলিশ এসে যায়। ব্যাপারটা চোখের পলকে বুঝতে পেরে সেই নারী সঙ্গে সঙ্গেই বলে, 'নাগর, এত দেরী করতে আছে? মুখপোড়ারা কাকে ধরতে কাকে ধরে নিয়ে যাবে তার ঠিক কি। এস হে নাগর'—প্রাণতোষের হাত ধরে টেনে তৎক্ষণাৎ ভেতরে নিয়ে যায়। প্রাণতোষ বিপদমুক্ত হন।

এইসব বনিতারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। প্রাণতোষ এদের কারো কারো হাত-মারফৎ মারাত্মক অস্ত্র পাচার করতেন। এরা ইতিহাসে উপেক্ষিতা। এমনই এক কর্মী ছিলেন সরস্বতী দেবী। রীতিমত শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না এবং উচ্চবংশীয়া। যৌবনকালে বিভ্রান্ত হয়ে রাজপথ থেকে তিনি চলে আসেন এই নিষিদ্ধ পল্লীর কানাগলিতে। তবু, ওই কানাগলির বাসিন্দা হয়েও যথাসাধ্য চিত্তটি পরিশুদ্ধ রেখেছিলেন এবং স্বদেশের কাজ করে গেছেন গোপনে। সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন তিনি।

১০ ফরিদপুরে

স্বাধীনতা-আন্দোলনে ফরিদপুরের ভূমিকা অনন্য। হাজী শরিয়ত উল্লার জন্ম এই শহরে ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে। কৃষক ও শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন তিনি। ফরিদপুর ও ঢাকার কৃষক-প্রজাদের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য 'ফারাইজি' নামে যে আন্দোলন করেন তাতে বৃটিশ-সরকার ভীত হয়ে পড়ে। শরিয়ত উল্লা ও তাঁর পুত্র দুদুমিঞা ফরিদপুর ও ঢাকার কিছু অংশ স্বৈরতন্ত্রী জমিদারদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৪০ খৃ শরিয়ত উল্লা মারা যান।

স্বাধীনতা-আন্দোলনে উদ্দীপ্ত হয়ে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, মাদারিপুরের পূর্ণ দাস বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালের ২রা মে তারিখে ফরিদপুরের জনগণকে স্বদেশ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে সম্মেলন হয় তাতে সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দাস জনালায়ী বক্তৃতা দেন। অগনিত স্বেচ্ছাসেবককে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করেন পূর্ণ দাস। কাজী নজরুলের সঙ্গে প্রাণতোষও সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

ফরিদপুরে প্রাণতোষের মামার বাড়ি। কিন্তু সম্মেলনে এসে তিনি উঠেছিলেন কাজীর সঙ্গে জমিদার ও কংগ্রেস-নেতা লালমিয়ার বাড়ি। সেখানে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়। গোবিন্দপুরের জীবন মোল্লা মাদারিপুরের ইস্‌কান্দার আলি, জাহাঙ্গীর কবীর ও আরও অনেক বিপ্লবীর সঙ্গে সখ্য হয়। যুগান্তর-দলের কর্মপরিধি বৃদ্ধির সুযোগ আসে। সেবার অল্পদিনই ফরিদপুরে ছিলেন প্রাণতোষ।

১৯২৬ সালে আবার ফরিদপুরে। এবার সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে, সঙ্গে নজরুল। নজরুল এবারে উঠলেন কবি হুমায়ুন কবীরের পিতা কবিরুদ্দীন আহমদের বাসায় আর প্রাণতোষ মামা-বাড়িতে। আহার ও শয়ন ব্যতীত প্রাণতোষ সারাদিনই ছেলেদের সঙ্গে হইহই করে বেড়াতেন। 'ঢোল-সমুদ্র' নদীর তীরে রাজেন্দ্র-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে নজরুলের গান গেয়ে কবিতা আবৃত্তি করে, প্রাণতোষ সকলের খুব প্রিয় হয়ে ওঠেন। পরিচয় হয় মহেন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে, পরবর্তীকালে বিখ্যাত নট ও নাট্যকার। দৈনিক কৃষক ও স্বরাজ পত্রিকার সংগঠক রমেশচন্দ্র বসু, বিপ্লবী বগলাচরণ গুহ, অনুশীলন সমিতির সভ্য কবি জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, কবি রণজিৎ সেন, দুর্গা-শংকর বসু প্রমুখ আরও অনেকের সঙ্গে সখ্য হয়।

ফরিদপুরে হিন্দু-মুসলমান অসংখ্য বন্ধুর নিবিড় সাহচর্য লাভ করার ফলে প্রাণতোষের কর্মপরিধি বিস্তারের সুবিধা হয়েছিল এবং এদের ভালবাসার আকর্ষণেই, ১৯২৭ সালে, তৃতীয়বার ফরিদপুর যেতে হয় প্রাণতোষকে। এবারেও মামার বাড়ি। ছোটমামা বিষ্ণুচরণের কথা আগেই বলা হয়েছে এবং প্রাণতোষ তাঁকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। সারাদিন পার্টির সংগঠনের কাজে ঘুরে, অবসর সময় কাটাতেন জাহাঙ্গীর কবীরের বাড়ি কিম্বা মামাতুতো বড়দাদা অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি।

মামাতুতো দুই দাদা অতুলচন্দ্র ও অবিনাশচন্দ্র হুগলী-কলেজের ছাত্র থাকাকালীন বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন। জোতিষ-চন্দ্রের অসামান্য প্রভাব পড়ে এঁদের দুজনের ওপর। প্রাণতোষ তখন হুগলীতে, বালক। এই দুই মামাতুতো দাদাই প্রথম প্রাণতোষকে নিয়ে যান জ্যোতিষচন্দ্রের কছে। অবিনাশচন্দ্র সৌখীন বিপ্লবী হলেও, অতুলচন্দ্র সেরকম ছিলেন না—তিনি প্রকৃতভাবেই বিপ্লবের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁর মনটি ছিল দুর্বল এবং চিত্ত ছিল চঞ্চল। বিবাহের ফলে এবং সংসারের চাপে, বিপ্লবের পথ থেকে সরে যান। তিনি চাকরি করতেন কলকাতা ডাক-বিভাগে।

বিষ্ণুচরণ সম্ভবতঃ অসৎ হওয়ার জন্য, সম্পত্তি-বঞ্চিত অতুলচন্দ্র পড়লেন বিপাকে। তাঁর সংসারটি নিতান্ত ছোট নয়। স্ত্রী চার কন্যা ও পাঁচ পুত্র—তাঁকে নিয়ে এগারো জনের বৃহৎ সংসারে ভরণ-পোষণ কঠিন হওয়ায়, দারিদ্র ফুটে ওঠে সর্বাংগে। অতুলবাবুর স্ত্রী সিন্ধু-বাসিনী তবু হাসিমুখে সংসার-প্রতিপালনের চেষ্টা করতেন।

প্রাণতোষ এই ত্যাগী বড়দাদার সংসারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। তাঁর সন্তানদের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় কাকা। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ নয়, ভ্রাতুষ্পুত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয়া প্রতিভা এবং তৃতীয়া প্রভা ছিলেন যেন অগ্নিকন্যা। বিপ্লবী দুর্গাশংকর বসুর কাছে এঁরা দুজন দেশের কাজে দীক্ষা নিয়েছিলেন আগেই। প্রাণতোষ এঁদের শিক্ষা দিতেন পিস্তল রিভলবার চালনা। গোপনে এসব শিক্ষা দেওয়া হলেও, বিষ্ণুচরণ আন্দাজ করেছিলেন ঠিকই। ঘরশত্রু বিভীষণের মত, তিনি খবর পাঠিয়ে দিতেন গোয়েন্দা-বিভাগে। শুধু এঁদের খবরই নয় অন্যান্য ঘাঁটির খবরও। পুরস্কার-স্বরূপ, গোয়েন্দা-বিভাগে তাঁর এক পুত্রের চাকরি।

ঘরের ছেলেমেয়েদের বৈপ্লবিক চেতনার উদ্বোধনে, প্রাণতোষ গান কবিতা গল্প প্রবন্ধ ও চিত্রশিল্পের আসর বসাতেন প্রায়ই। ওদের নিয়েই 'সাধনা' নামে একটি উচ্চমানের হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতেন। প্রতিভা ছিলেন সকল কর্মযজ্ঞের মধ্যমণি।

আরও পরে, তৃতীয়বার হুগলীর যুগান্তর-দলের নির্দেশে ফরিদপুরের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তাঁকে ফরিদপুর যেতে হয়। প্রতিভা এতদিনে আরও পরিণত হয়েছে। প্রাণতোষ খুশি হয়েছিলেন এই ভ্রাতুষ্পুত্রীটির ক্রমোন্নতি দেখে। বিপ্লবের কাজে তাঁর সহযোগিতা পেয়েছেন পুরোমাত্রায়।

কোনো-কোনো নারী আছে যারা রূপেও ভোলায় ভালবাসাতেও ভোলায়। এইরকমই এক নারী, সুচারু, ফরিদপুরেরই এক নাট্যকারের ভগিনী একদা সবদিক থেকেই নিজের মত করে দেখতে চেয়েছিলেন প্রাণতোষকে। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ ছিল মানুষ প্রাণতোষ—তাঁর আদর্শের প্রতি নয়। প্রাণতোষ তাঁকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, তাঁকে ভালবাসতে হলে তাঁর আদর্শকেও ভালবাসতে হবে, ঘর ছেড়ে নেমে আসতে হবে পথে। খুন্তির বদলে হাতে তুলে নিতে হবে পিস্তল, আলুর বদলে বোমা। প্রীতিলতা, বীণা বা প্রতিভার মত অগ্নিকন্যা হতে হবে। ওঁদের মত যদি হতে পারো তবে চলে এসো আমার সঙ্গে। সুচারু তবু চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু প্রাণতোষ অটল। ব্যক্তিপ্রেমের চেয়ে দেশপ্রেম অনেক বড়ো। মোহডোর ছিন্ন করে তিনি অগ্রসর হলেন দেশমাতৃকার ডাকে পথে-প্রান্তরে।

১১ কলকাতায়

১৯২৫ সাল থেকেই প্রাণতোষ আদর্শগত-সংঘাতে 'যুগান্তর'-দল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন। বিপ্লব-সংক্রান্ত এই আদর্শগত সংঘাতের সুরু ১৯২৩ খ্রী থেকে। এই আদর্শগত সংঘাতের ফলে ১৯২৩ খ্রী বিপ্লবীদের একাংশকে চিহ্নিত করা হয় 'রিভোল্ট গ্রুপ' বলে। কারণ, 'যুগান্তর'-দল ক্রমশ কংগ্রেসি আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হচ্ছিল। এই সময় বিপ্লবী ভগৎ সিং গড়েছিলেন 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি'-নামে একটি সশস্ত্র বিপ্লবী দল। প্রাণতোষ এই দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন। বিজয় মোদক তখন ছিলেন সর্বভারতীয় বিপ্লবীদের মূল কেন্দ্রাধিপতি। হুগলী-চুঁচুড়ার সীমিত কর্মক্ষেত্র

হতে প্রাণতোষকে কলকাতার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নিয়ে গেলেন বিজয় মোদক। সেটা ১৯২৭ সাল।

শুধু প্রাণতোষ নন হুগলী-চুঁচুড়ার আরও অনেক বিপ্লবী এলেন কলকাতায়। তাঁদের সহজে যাতে চেনা না যায় সেজন্যে তাঁরা কলকাতায় এসে ধারণ করলেন নানান ছদ্ম-ভেক। বিপ্লবী বীরেন ঘোষ (এরিয়ান ক্লাবের ক্যাপটেন বিখ্যাত বি ঘোষ) কৈলাস বসু স্ট্রীটে মুদির দোকান খুলে বসলেন একটা। সিরাজুল হক হিন্দুনাম সরোজ বসু ধারণ করে পটুয়াটোলার মুখে একটা গ্যারেজ ভাড়া করে সাবানের কারখানা চালু করে দিলেন। লোয়ার সার্কুলার রোডের ব্রাহ্ম গার্লস ইস্কুলের সামনে এভারেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি খুলে ফ্যানের কারবার চালু করে দিলেন বিপ্লবী জীতেন চক্রবর্তী ধীরেন্দ্র-মোহন সাহা প্রমুখ। এইভাবে আরও অনেকে।

সিরাজুল হক এবং বিজয় মোদকের সঙ্গে প্রাণতোষ কলকাতায় এসে প্রথমে উঠলেন বাদুড়বাগানের এক গুপ্ত আড্ডায়। সেখান থেকে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের এক ডেরায়। এই দু' জায়গাতেই থাকতেন সুষমা মিত্র ইন্দুসুধা ঘোষ ও সুশীতল রায়চৌধুরী।

সুষমা মিত্র ছিলেন নারী-সংগঠনের নেত্রী। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ভাইঝি। তিনি অল্প বয়সে বিধবা হন। একমাত্র পুত্রসন্তান—অসিত। দাদা শৈলেন মিত্র ছিলেন বিপ্লবী দলের লোক।

অধুনা বাঙলাদেশের খুলনা জেলার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের মেয়ে সুষমা মিত্র দৃঢ়চেতা কর্মী হওয়া সত্ত্বেও, একদা তিনি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা। শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছেন। ছবি আঁকা শিখেছেন নন্দলাল বসুর কাছে। নিজেও ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। পরিকল্পনা-মাফিক বোমার খোলের ডায়াগ্রাম এঁকে বিপ্লবের কাজে সহায়তা করেছেন। তিনি কাজ করতেন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। এখনও জীবিতা। বর্তমানে সরকার-পরিচালিত এক শিল্প-শিক্ষায়তনের তিনি অধ্যক্ষা।

সুশীতল রায়চৌধুরী ছিলেন দক্ষ কর্মী। নানারকম অস্ত্র-চালনায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। বিভিন্ন বিপ্লব-কেন্দ্রে বহু কর্মীকে অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিয়েছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি নকশালবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

কলকাতায় আসার পর প্রাণতোষকে কয়েকটি কেন্দ্রে ঘোরাঘুরি করতে হত। কেন্দ্রগুলি হলঃ ১ আমহার্স্ট স্ট্রীটের ইলিসিয়ম হোটেল। এখানে থাকতেন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃতী ছাত্র ইন্দু চৌধুরী। ২. শিয়ালদার কাছে টাওয়ার হোটেল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আর এক কৃতী ছাত্র মধু মজুমদার। পড়াশোনার জন্য পরে বার্লিন গিয়েছিলেন। ৩ মিকাডো ক্লাব। মীর্জাপুর স্ট্রীট ও পটুয়াটোলা স্ট্রীটের সংযোগস্থলে ছিল ক্লাবটি। ৪ বেঙ্গল ল্যাম্প ফ্যাক্টরি। এখানে কাজ করতেন ত্রিগুণা সেন ও কিরণ রায়। ৫. সিটি বোর্ডিং। ২৭, হ্যারিসন রোড। এখানে থাকতে ধীরেন্দ্রমোহন সাহা। মার্কিন-দেশের ইলিনয় য়ুনিভারসিটি ফেরৎ ছাত্র। ৬ দেবেশ দাস। বৈঠকখানা রোড। নেতাজীর সহকর্মী।

প্রাণতোষ এঁদের হাত-মারফৎ অস্ত্রাদি পাচার করতেন।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল পরাধীন ভারতের এক বিপ্লবতীর্থ। এই কলেজের স্কলার ছাত্ররা যেমন বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে তৎপর হতেন তেমনি সশস্ত্র বিপ্লব-আন্দোলনে অনেকে যুক্ত ছিলেন। এজন্য বৃটিশ সরকারের রোষ নেমে এসেছিল এই কলেজের ছাত্রদের ওপর। কৃতী ছাত্র, গোল্ড মেডালিস্ট বিজয় মোদকের উচ্চশিক্ষার জন্য বার্লিনে যাওয়ার কথা ছিল। পুলিশ-কমিশনার চার্লস টেগার্ট তার বিরোধিতা করেন। বিজয় মোদক বার্লিন যেতে পারেননি। শাসক-সম্প্রদায়ের আশংকা ছিল, এইসব ছাত্র বিদেশে গেলে ব্রিটিশ বিরোধী চক্র গড়ে তুলবে। বাধা সত্ত্বেও এঁরা দমে যাননি। বিজয় মোদক ইন্দু চৌধুরী মধু মজুমদার বিমল কুণ্ডু এবং আরও অনেকে সশস্ত্র-আন্দোলনে

বেশি করে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন।

১২· চুঁচুড়া-নৈহাটীর আরও কিছু কথা

কলকাতায় প্রাণতোষ যে কাজে গিয়েছিলেন তার শিকড় ছিল হুগলী-চুঁচুড়ায়। বিপ্লবীদের হাতে-হাতে বোমা পিস্তল কার্তুজ প্রভৃতি সরবরাহ করে সশস্ত্র বিপ্লবকে জোরদার করাই ছিল প্রাণতোষের কাজ। বোমা বানানোয় দক্ষ ছিলেন সিরাজুল হক। প্রাণতোষ তাঁর কাছেই শিখেছিলেন এই কাজ। আর, পিস্তল কিছু তৈরী হত আড়িয়াদহ, বেলঘরিয়া ও দক্ষিণেশ্বরে। বেশিরভাগ বিদেশী পিস্তল আসত জাহাজের স্টুয়ার্টদের মারফৎ।

প্রতাপপুরে পুলিশ-মামার বাড়িতেই গড়ে উঠেছিল একটা ছোট-খাটো ল্যাবরেটরি। হাতের কাছে মজুত থাকত কটনের বেশ কিছু প্যাকেট পিপেট বুরেট কাচের ফ্লাস্ক বুনসেন দুটো বড়ো কাচের বাটি গোটা-চারেক ছোট ছোট চিমটে। এসব সংগৃহীত হয়েছিল হুগলী কলেজের ল্যাবরেটরি থেকে। নাইট্রিক ও সালফিউরিক এ্যাসিড দোকান থেকে কেনা হত।

প্রাণতোষ আর পরিতোষ দোতলার ঘরে নিভৃতে তৈরী করতেন গান-কটন। বোমা তৈরীর সময় বোমার গায়ে জামার বোতামের মত গান-কটন দরকার হত। বোমার খোল তৈরী হত ব্রোঞ্জ দিয়ে। এসব খোল আসত আড়িয়াদহ ও বেলঘরিয়ার কামারশালা থেকে। সিরাজুল সাহেবের ওপর ভার ছিল এসব সংগ্রহ করে আনা। খোলের মুখে প্যাঁচওয়ালা ক্যাপ থাকত। ক্যাপ খুলে ওই শুকনো গান-কটন ভিতরে লাইনিং-এর মত বোমার গায়ে পরিয়ে দিয়ে স্পিরিটে ডোবানো হত। পরে তার মধ্যে মশলা পুরে দেওয়া হত। তার সঙ্গে পেরেক পিন এবং নিচের দিকে বারুদ-মাখানো ডিটোনেটর বা সলতে দেওয়া হত। যেসব বোমা ডিটোনেটর-যুক্ত সেন্ডলোতে টিগারের ব্যবস্থা থাকত। মুখটা প্যাঁচ-কাটা ক্যাপ দিয়ে বন্ধ করা হত।

বোমার সঙ্গে গান-কটন দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, মশলাকে বোমার

গাত্র হতে পৃথক করে রাখা। গান-কটনে আগুন লাগলে ছাই পড়ত না, সবটা ভ্যানিস হয়ে যেত। অথচ আগুনটা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত। বোমার মশলার মধ্যে ম্যাগনেশিয়াম পাউডার, পিউরিক এ্যাসিড, পটাশ-মোমছাল, পেরেক পিন প্রভৃতি থাকত। পটাশ-মোমছাল থাকার দরুণ বোমা ফাটলে প্রচণ্ড আওয়াজ হত। আর বোমার গাত্র ফেটে যেসব পেরেক পিন ছুটে যেত সেগুলো তখন স্পিনটারের কাজ করত। এই বোমা ফাটলে অর্ধ কিমি পর্যন্ত এলাকা ধ্বংস হতে পারত।

এই বোমা পরাধীন ভারতে বাঙলার বিপ্লবীদের হাতে হাতে ফিরেছে। প্রাণতোষ পবিতোষ প্রতিবেশী সংগ্রামী মহিলা হেমবরণী দেবী ও রেণুকা দেবী এবং আবও অনেকে এই বোমা সরবরাহ করেছেন বিপ্লবীদের কেন্দ্রে কেন্দ্রে। এই বোমা দিয়েই কুখ্যাত পুলিশ-কমিশনার চার্লস টেগার্টকে ডালহাউসী স্কোয়ারে মারতে গিয়েছিলেন বিপ্লবী অনুজা সেন। সামান্য অনামনস্কতার ফলে বোমাটি ফেটে যায় অনুজার হাতেই এবং তিনি মারা যান। ভাগ্যজোরে টেগার্ট বেঁচে যান।

চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বর তলায় 'যুগসংঘ' নামে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন—অভয় শীল অভয় দত্ত মহাকাল মুখোপাধ্যায় জয়পাল ভূপাল নবকুমার মণ্ডল প্রমুখ। এঁরা হুগলীর বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ স্থাপন না করেই, নিজেরা বিপ্লবের পথে এগিয়ে যান। প্রাণতোষের অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁরা মিলিত হতে চাননি। যে-কজন যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন তাঁরা হলেন—সুধা চট্টোপাধ্যায় বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রায়ের বেড়ের জমিদার-পুত্র শশিশেখর রায়চৌধুরী ওরফে শম্ভু।

হুগলী বিদ্যামন্দিরের একটা নিজস্ব 'কৃষি-বিভাগ' ছিল। সিরাজুল হক নিজে লাঙল চালিয়ে সেখানকার মাটি দোরস্ত করে নানা-প্রকার শাকশব্জি তরি-তরকারি উৎপন্ন করতেন। নিকটবর্তী মল্লিক-কাশিম হাটে বাগানের ফসল বেচে আসতেন বোঝা মাথায় করে। এই

কৃষি-বিভাগটির উদ্বোধন করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। বিভিন্ন সময়ে এসেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সে সময়ে বিদ্যামন্দিরে জমকালো আসর বসাতেন—নজরুল বিজয় মোদক সিরাজুল গোপেন চক্রবর্তী নগেন্দ্রনাথ ও প্রাণতোষ। প্রচুর খেজুররস খাওয়া হত।

চুঁচুড়ার আরপার নৈহাটী সমৃদ্ধ শহর। প্রাণতোষকে প্রায়ই আসতে হত নৈহাটীতে। কলকাতা থেকে ফেরার পথে শিয়ালদা স্টেশন হয়ে নৈহাটীতে আসতেন অনেক সময়। তারপর গঙ্গা পার হয়ে চুঁচুড়া। এর বিপরীতও হত প্রায়ই।

১৯২৬-২৭ সাল হবে। একদিন চুঁচুড়া থেকে একটা স্যুটকেস নিয়ে প্রাণতোষ চলেছেন কলকাতায়। স্যুটকেসে আছে চারটে বোমা দুটো রিভলবার একটা পিস্তল দুটো ডিটোনেটর দুটো ডিনেমাইটের প্যাকেট আর কিছু লম্বা তার গুটোনো। প্রাণতোষ চলেছেন আর তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর জ্যোতিষচন্দ্র বক্সি। প্রাণতোষ টের পেয়েছিলেন আগেই। চুঁচুড়া মেছোবাজার খেয়াঘাটে এসে তিনি নৌকো ভাড়া করলেন। একার জন্যে ভাড়া করলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। তা না করার জন্য বক্সিও উঠল নৌকোয়। বক্সি আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। প্রাণতোষ আলাপ করলেন অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে, অথচ এমন স্বচ্ছন্দে যে বোঝাই গেল না তিনি কী মারাত্মক জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন স্যুটকেসের মধ্যে। ভবী কিন্তু ভোলবার নয়।

ওপারে নেমেই, প্রাণতোষ দ্রুত এসে উঠলেন বাসন্তী কেবিনে। বাসন্তী কেবিন ছিল নৈহাটী স্টেশনের সিঁড়ির নিচেই রাস্তার পশ্চিমে। এই বাসন্তী কেবিন ছিল বিপ্লবীদের এক আড্ডাখানা। মালিক চব্বিশ পরগণার বিশিষ্ট বিপ্লবী সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের দাদা হরিনারায়ণ। স্যুটকেসটা হরিনারায়ণের হাতে সমর্পণ করে প্রাণতোষ ইঙ্গিতে বিপদের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেন। হরিবাবু সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকে গুপ্তপথে স্যুটকেশ পাচার করে তাড়াতাড়ি থালায় মাছ-ভাত খেতে

শুরু করলেন। বস্তি দোকানে ঢুকে ওদের দুজনকে নিশ্চিন্তে আহার রত দেখে অবাক। প্রাণতোষ আহার সমাধা করে খালি হাতেই শিয়ালদাগামী ট্রেনে চেপে বসলেন। স্যুটকেস ফিরে এল চুঁচুড়ায় রাজরাজেশ্বরী দেবীর কাছে।

সামান্য অসাবধানতার ফলে, ওই স্যুটকেসটি গিয়ে পড়ল পুলিশ-মামা তারিণীবাবুর হাতে। তারিণীবাবু চমকে গেলেন, বিচলিত হলেন, রেগে গেলেন খুব। এ যে ভয়ানক কাণ্ড! দেখেশুনে চেপে রাখা যায় না অথচ প্রকাশ করলে প্রাণতোষের প্রাণ সংশয়, হয় দ্বীপান্তর নয়তো অন্য কোনো কঠিন সাজা। তিনি নিজেই খানিক উদভ্রান্ত। এমন সময় ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হলেন মামাতুতো দাদা আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি মিলিটারী অ্যাকাউন্টেনডেন্ট এবং ভিতরে-ভিতরে বিপ্লবীদের সমর্থক। আশুবাবুই দায়িত্ব নিলেন। রাজরাজেশ্বরী দেবীর সহায়তায় আশুবাবু স্যুটকেসটি নিরাপদে অন্য কেন্দ্রে জমা দিয়ে এলেন।

১৩· চাঁইবাসায় ও পরে কলকাতায়

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করলেন বিপ্লবীরা। এই ঘটনায় শাসক-সম্প্রদায়ের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। তারা বাঙলাদেশ জুড়ে সন্ত্রাস-দমনে তৎপর হল। চট্টগ্রাম উদ্ধার করার পর তাদের নজর পড়ল কলকাতা ও হুগলীর বিপ্লবীদের ওপর।

এই সময় ফেণীতে আহসান উল্লা নামে এক পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্টর খুন হন হরিপদ ভট্টাচার্যের হাতে। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এখানে পুলিশ-তৎপরতা ও বিচার-প্রহসন সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা যাক। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া গ্রামটি ছিল পণ্ডিত-প্রধান স্থান। ওই গ্রামের এক দামাল ছেলে হরিপদ চৌধুরী। হুগলী শহরের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল আগে থেকেই। সংস্কৃত-শিক্ষার পীঠস্থান হুগলীর বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ সীতানাথ

বেদান্তশাস্ত্রীর সম্পর্কীয় নাতি হরিপদ চৌধুরী। ফরিদপুরে পাঠ শেষ করে হরিপদ পড়তে আসেন হুগলী কলেজে। প্রাণতোষের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় এবং প্রাণতোষ তাঁকে টেনে আনেন বিপ্লবী-আন্দোলনে। কল্যাণ-সমিতির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়।

হরিপদ চৌধুরী অতঃপর হুগলীর বাসা ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন তেলিপাড়া লেনে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। ওখান থেকেই পড়াশোনা করতেন আর বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালাতেন।

পরিতোষ সেই সময় কলকাতায় সংগঠনের কাজে ব্যস্ত। তিনি বরাবরই প্রচার-বিমুখ ও নীরব কর্মী। দাদার সঙ্গে প্রথমাবধি তিনি কাজ করে আসছেন—সেই তেরো বছর বয়স থেকেই। ইস্কুলের ছাত্র-থাকাকালীন 'লাঙল' পত্রিকার প্রচার ও বিক্রয় করে ফিরেছেন ঘরে ঘরে। পরিতোষ পরবর্তীকালে প্রলেতারিয়ান রেভিলউশনারি পার্টিতে যোগ দেন।

কলকাতায় থাকাকালীন পরিতোষের টাইফয়েড হয়। টাইফয়েড থেকে সেরে ওঠার পর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য মাতা রাজরাজেশ্বরী দেবী ওঁকে পাঠিয়ে দিলেন চাঁইবাসায়। সেখানে ওঁদের মামাতুতো মেজদাদা অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন চীফ ফরেস্ট অফিসার। তাঁর বাসাতেই উঠলেন পরিতোষ।

স্বাস্থ্যোদ্ধারের চিন্তা অপেক্ষা দেশোদ্ধারের চিন্তা ছিল পরিতোষের প্রবল। তিনি চিঠি লিখলেন হরিপদকে। হরিপদ সেই চিঠি নিয়ে দেখা করতে গেলেন বিজয় মোদকের সঙ্গে। বিজয় মোদকের আস্তানায় (রামকান্ত বসু স্ট্রীট) পুলিশ তখন জাল ফেলেছে। পালাবার পথ ছিল না। এবং হাতেও ছিল না কোনো অস্ত্র। এক পদস্থ পুলিশ-অফিসার তাঁর দিকে এগিয়ে আসতেই তিনি সজোরে এক ঘুঁসি বসিয়ে দিলেন তার চোয়ালে। ধরা পড়লেন। সেই সঙ্গে ধরা পড়লেন সুশীতল রায়চৌধুরী ইন্দুসুধা ঘোষ প্রমুখ।

বিধি ছিল বাম। হরিপদ বুঝতে পারেননি, তিনি গোপনপথে প্রবেশ করতেই পুলিশের মুখোমুখি। ধরা পড়লেন তিনিও। তাঁর

ধরা পড়াটাই হল আরও মারাত্মক। তাঁকে সার্চ করতেই বেরিয়ে পড়ল পরিতোষের চিঠি। তাতে চাঁইবাসার ঠিকানা এবং পত্রবাহক হরিপদ চৌধুরীর নাম ছিল। পুলিশ-কর্তাদের সে কী উল্লাস! ইন্‌স্‌পেক্টর আহসান উল্লার খুনীর হদিশ পাওয়া গেছে। তারা খুঁজছিল হরিপদ ভট্টাচার্যকে কিন্তু পেয়ে গেল হরিপদ চৌধুরীকে। তা হোক। পদবীতে মিল না-থাক নামে তো আছে। অতএব, দোষী জানিল না কিবা তার দোষ, বিচার হইয়া গেল। দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং নির্বাসন সেলুলার জেল, আন্দামান।

পুলিশ অতঃপর চাঁইবাসায়। বিহার-পুলিশের সহযোগিতায় পরিতোষ গ্রেফতার হলেন। প্রাণতোষের নামেও ছিল ওয়ারেন্ট। ইচ্ছা ছিল কোথাও আত্মগোপন করে থাকবেন। সেই বাসনা পোষণ করে হুগলী থেকে বেরিয়ে রাঁচিগামী ট্রেনে চেপে চাঁইবাসায় নামলেন। গোয়েন্দা-পুলিশের নজর ছিল আগাগোড়া। বাড়িতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেলেন।

পরিতোষ ছিলেন চাঁইবাসা জেলে আর প্রাণতোষ চাঁইবাসা বন-বিভাগের এক কোয়ার্টারে।

সেটা ১৯৩১ সাল। শীতকাল। পৌষমাস। কনকনে শীত। দু'জায়গা থেকে দুজনকে তুলে চক্রধরপুরের স্টেশনে আনা হল। হাতে হাতকড়া কোমরে দড়ি। ওদের তোলা হল বোম্বে মেল-এ। বিশেষভাবে তৈরী লোহার জালে ঢাকা-দেওয়া একটা কামরায় পুলিশ ঢুকিয়ে দিল ওদের। পাহারায় রইল ছ'জন ইউরোপীয়ান সার্জন ছ'জন বিহারী আর্মি এবং একজন দায়িত্বশীল অফিসার।

ভোরবেলা গাড়ি হাওড়া স্টেশনে এসে থামতেই এক মোটাসোটা চেহারাব গোয়েন্দা-অফিসার তাদের আপ্যায়ন করল। তার হাতে দু'জনের ভার অর্পণ করে পূর্বতন অফিসারটি বিদায় নিল। এই নতুন অফিসার তাঁদের এনে তুললেন ১৪নং ইলিনিয়াম রো-র গোয়েন্দা-অফিসে। সারাদিন উপোস, রাতেও আহার নেই, ঘুম নেই। ভোর-বেলা শীতে হি-হি কাঁপছেন দুজনে, অসহ্য অবস্থা।

গোয়েন্দা-অফিস থেকে প্রাণতোষকে আনা হল বালীগঞ্জ থানা-হাজতে আর পরিতোষকে বৌ-বাজার থানা-হাজতে। অনেক অফিসার এসে দেখা দিতে লাগলেন একের পর এক। কেউ মজা করে যাচ্ছেন কেউ-বা রঙ্গ। এক ডি, সি, গোয়েন্দা অফিসার এলেন। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা খাওয়া হয়েছে?' প্রাণতোষ ঘাড় নাড়লেন। অফিসার সঙ্গে সঙ্গে হাঁকডাক শুরু করে দেয় যেন অতিথি-আপ্যায়নে ত্রুটি হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা আর শুকনো পাউরুটির ফালি এল। চা-পর্ব শেষ হতেই অফিসারটি সিগারেট ও দেশলাই এগিয়ে দেয়। প্রাণতোষ সিগারেট ধরাতে যাচ্ছেন এমন সময় গালে সপাটে এক চড়। মুখ থেকে সিগারেট ছিটকে গেল এবং ঝিন ঝিন করে উঠল মাথার ভেতরটা। অফিসার বললেন, 'শুয়োর, সিগারেট খাওয়ার কত সখ! নবাব পুত্তুর!'

দ্বিতীয় অফিসার এসে উপস্থিত। সে আর এক কাঠি সরেস। বললে, 'আরে জল খাও নি? জল খাও, গলা ভিজিয়ে নাও।'

গ্লাসে জল ছিল এবং তেষ্টাও পেয়েছিল। প্রাণতোষ সেদিকে হাত বাড়াতেই অফিসার গ্লাসটা টেনে নিল। বেশ মোলায়েম স্বরে অফিসার বলল, 'বেশ তেষ্টা পেয়েছে জানি, জল তো সেজন্যেই এনে রাখা হয়েছে। জল পরে খেও, এখন বল তো তোমাদের দলে কারা কারা আছে।'

প্রাণতোষ তার আগেই ধরে ফেলেছিলেন ওদের চাল। সতর্ক হয়ে গেলেন খুব। এবং সাবধান। তাঁকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর এবং মুখ দিয়ে কোনো কথা বের করতে না পেরে অফিসারটি আদেশ দেয়, 'ধোলাইখানা সেলে নিয়ে যাও।'

ধোলাইখানা ঘরটি বেশ বড়সড়। কড়িকাঠে দুটো রিঙ। শুন্যে ঝুলিয়ে ঠেঙাবার ব্যবস্থা। দেওয়ালে জোড়ায় জোড়ায় হাতকড়া বাঁধা। সেখানে হাতদুটো ঢুকিয়ে এবং বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত যাতে পেটাতে সুবিধা হয়। বেশ ক'জন পেশোয়ারী পাঠান পুষে রাখা হত ধোলাইখানায়। পিটুনি দেওয়ার সময় তারা পরত গ্লাভ্‌স। প্রাণতোষ

ধোলাইখানায় আসতেই তারা হাতের সুখ করতে লেগে গেল। সুবিধা হচ্ছে না দেখে চুল ধরে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিতে আরম্ভ করল। প্রাণতোষ তবু নির্বাক। এই শাস্তি শুধু একদিন নয়, দিনের পর দিন। অনাহারে রাখা হয়েছে। জলের বদলে পেচ্ছাব।

ওদিকে পরিতোষের দশাও তাই। মুখ বুজে পীড়ন সহ্য করা। ওকেও টলানো যায়নি।

আশ্চর্য! বালীগঞ্জের কয়েদখানার মধ্যে একজন সাচ্চা পুলিশ-অফিসর ছিলেন। তাঁর নাম মজিদ। তিনি বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা করতেন। প্রাণতোষকে বলতেন, 'আমি যা করি তাতে টু-শব্দটি করবি না।' তিনি লোক-দেখানো প্রচণ্ড তম্বি করতেন। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্দয় প্রহার করতেন। আবার চুপি চুপি প্রস্রাবখানার মাথার তাকে বাটিভর্তি মাংসের সুরুয়া রেখে আসতেন। প্রাণতোষকে চোখের ইংগিতে তৎক্ষণাৎ খেয়ে আসতে বলতেন। কয়েদখানায় যা খেতে দিত তা একেবারে অখাদ্য। অধিকাংশ দিন অনাহারে থাকতে হত।

এই কয়েদখানায় প্রাণতোষ ছিলেন প্রায় একমাস। পরিতোষও বৌ-বাজারের হাজতে ওইরকম। দুই ভাইকে অতঃপর নিয়ে আসা হয় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে সাধারণ ওয়ার্ডে। এই সাধারণ ওয়ার্ডটি তখন সতীর্থ বিপ্লবীতে ভরপুর। সেখানে ছিলেন—বিমল কুণ্ডু তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় বীরেন ঘোষ প্রমুখ। পরিতোষ ছাড়া পান প্রথম ব্যাচেই, তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ না থাকায়। প্রাণতোষ তার পরে।

১৪ আলফ্রেড ওয়াটসন মামলা ও গ্রেফতার

প্রচণ্ড ভারত-বিদ্বেষী আলফ্রেড ওয়াটসন ছিলেন দৈনিক স্টেটম্যান পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৩২ সালে পত্রিকার সম্পাদক-স্তম্ভে প্ররোচনা-মূলক ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবীদের পথ ও মতের বিরুদ্ধে তীব্রভাষায় বিষোদ্গার করেন। ফলতঃ বিপ্লবীরা তাকে হত্যার পরিকল্পনা

করতে থাকেন।

প্রয়োজন ছিল অর্থের। গোপনে এগিয়ে এলেন কিছু ধনী ব্যবসায়ী। কেননা ওয়াটসন তাঁদের ব্যবসাকে বিষ নজরে দেখতেন। এবং তাঁরই উসকানিতে পুলিশ-হামলায় তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অর্থ-সমস্যা মেটার পর, পরামর্শের জন্য তাঁরা উত্তরপাড়ার বিপ্লবী-নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যান। অমরেন্দ্রনাথ এই কাজের ভার দেন বিজয় মোদককে। বিজয় মোদক কাজে নামার আগে সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রাণতোষ সঙ্গে ছিলেন।

প্রখ্যাত কেমিষ্ট সুনীলবাবুর কাজ ছিল নানা কেমিক্যাল সংগ্রহ করা। তিনি বিখ্যাত 'পারিজাত সাবান' ফ্যাক্টারীর উপদেষ্টা ও কেমিষ্ট। তাঁর কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বোমার মশলা সতেজ আছে কিনা পরখ করে জেনে নেওয়া। সুনীলবাবু দলের সমর্থক ছিলেন। তিনি সায় দেবার পরই কাজ শুরু হয়ে যায়। ওয়াটসনকে দু'বার আক্রমণ করা হয়। প্রথমবার স্টেটম্যান পত্রিকার গেটের মুখেই। ভাগ্য ভাল বলতে হবে সাহেবের। গাড়ি ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে, গতি না কমিয়ে, সোজা ঢুকে পড়েছিল ভেতরে। ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দ্বিতীয়বার ওই একই জায়গায়। আংশিক সাফল্য ঘটে। আহত হন ওয়াটসন।

দু'দুবার আক্রান্ত হওয়ার ফলে ওয়াটসন কলকাতায় বাস করা নিরাপদ মনে করলেন না। সুস্থ হয়ে সোজা পাড়ি দিলেন বিলেতে। এই দুটো ঘটনাই পুলিশ-বিভাগকে ক্ষেপিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। পুলিশ-কমিশনার চার্লস টেগার্ট আর বাঙালী গুপ্তচর নলিনী মজুমদার অপরাধীদের ধরার জন্য সারাদেশ চষে ফেললেন।

ধরা পড়লেন অনেকে।

বিচার চলাকালীন কয়েকজন সাক্ষী সনাক্ত করেন প্রাণতোষকে। ফল হয় মারাত্মক। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রাণতোষকে প্রথমে রাখা হয় একটা লম্বা-চওড়া ওয়ার্ডে। সেখানে কালভার্টের মত দুদিকে শোয়ার ব্যবস্থা ছিল। মাঝখানের প্যাসেজেও দুজন করে

শূত। অন্যান্য ব্যবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কুটকুটে কম্বল তিনটে—একটা মাথার নিচে বালিশ করার জন্যে, একটা মেঝেতে পেতে শোওয়ার আর একটা গায়ে দেওয়ার। এনামেলের সানকি একটা, এনামেলের বড় বাটি একটা। এই ছিল সরঞ্জাম। ওই বড় বাটিটিই ছিল একাধারে জল-শৌচের কাজে, তেষ্টা নিবারণের আধার এবং আহারের পাত্র। মোটা চালের ঝরঝরে ভাত, গঙ্গাজলের মত রঙ ডাল, তেঁতুলের খাট্টা আর একটা পেঁয়াজ। একেবারে বিস্বাদ। কোনোদিন মাছ বা মাংস জুটত, তাতে শুধু কাঁটা আর হাড়ই থাকত। আচরণও ছিল বিচ্ছিরি-রকম। 'রাজনৈতিক কর্মী' রূপে চিহ্নিত হলেও, পৃথক কোনো ব্যবস্থা বা সম্মানই ছিল না। ব্রিটিশ সরকার বন্দীশালাটি সকলের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করে রেখেছিলেন। প্রাণতোষকে সেইভাবে অসহ্য দিন কাটাতে হত।

১৫. কারা ও নজরবন্দী জীবন

বিচারাধীন বন্দী হিসাবে প্রাণতোষ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন প্রায় এক বছর। ওয়াটসন হত্যা-প্রচেষ্টা মামলায় ধরা পড়েছিলেন ১৫০ জন কর্মী। তাঁদের অধিকাংশই ছাড়া পেয়ে গেলেন প্রমাণাভাবে এক এক ব্যাচে। ক্রমশ শূন্য হতে থাকে অতবড় জেনারেল ওয়ার্ড।

এই ওয়ার্ডে প্রাণতোষ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় বীরেন ঘোষ বিমল কুণ্ডু প্রমুখের সঙ্গে থাকত লক্ষ্মী শীল নামে এক ব্যক্তি। লোকটি ধাড়িবাজ এবং ভূঁইফোড় বিপ্লবী। অর্থাৎ নিজে-নিজেই বিপ্লবী। হরিপদ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপের সূত্রেই দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পুলিশ সন্দেহবশে তাকে গ্রেফতার করে। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল নলিনী মজুমদারের মিনি সংস্করণ। একদিন সে অহেতুক বিপ্লবীদের নামে গালিগালাজ করায় প্রাণতোষ তাকে প্রচণ্ড প্রহার করে এবং তখন সে মেকি দেশভক্তি প্রকাশ করে ফেলে। বিপ্লবীরা তার সম্পর্কে সতর্ক হন।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তখন জেলার ছিলেন মিঃ সোয়ান (১৯৩২ সাল)। খুব রাগী এবং ক্রূর প্রকৃতির। রাজবন্দীদের মোটেই সমীহ করতেন না। আহারের ব্যবস্থাটি ছিল জঘন্য। একদিন দুর্গন্ধযুক্ত ডাল দেওয়া হল। প্রাণতোষ রেগে সেই বাটি-ভর্তি ডাল ছুঁড়ে দেন মিঃ সোয়ানের গায়ে। মিঃ সোয়ান রেগে টং। শাস্তি-স্বরূপ, প্রাণতোষকে ঠেলে দেওয়া হল ভূ-গর্ভস্থ সেল্-এ। একটা ছোট্ট ঘর। প্রমাণ-সাইজ কোনো লোক হাত-পা মেলে শুতে পারবে না। ঘরের উচ্চতা অবশ্য অনেকখানি। জানালা নেই, অনেক উঁচুতে শুধু লোহার-জাল দেওয়া একটা ঘুলঘুলি। মেজেতে ছড়ানো থাকত বালি। বালির মধ্যে অসংখ্য পোকা-মাকড়, ছোট ছোট বিছে। বন্দী যাতে আরামে শুতে বা বসতে না পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। দিনের বেলা ঘর তেতে উঠত গরমে আর রাত্রে ঠাণ্ডা।

সঙ্গী নেই—ওই পোকা-মাকড়গুলোই হয়ে উঠল তার সঙ্গী। তিনি তাঁর রুটির বরাদ্দ থেকে তাদের ভাগ দিতেন। তাদের নিয়ে খেলা করতেন। ভাগ্যক্রমে একটা বেড়াল জুটেছিল, সেও তাঁর সঙ্গী হয়। বই জুটত না। ফলে ধৈর্য ও বাক্-সংযম রপ্ত করেন।

সেল থেকে আবার তাঁকে আনা হল জেনারেল ওয়ার্ডে। এখানে আসার পর প্রাণতোষ শুনতে পেলেন কিছু বিপ্লবীকে আন্দামানে পাঠানো হবে সেলুলার জেলে। জানা গেল, প্রথম দলে যাবেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল-মামলায় ধৃত গণেশ ঘোষ আর দ্বিতীয় দলে সিরাজুল হক হরিপদ চৌধুরী প্রমুখ। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে প্রাণতোষ আকুল হয়ে উঠলেন। জেলার মিঃ সোয়ানকে জানালেন যে তাঁর অসুখ করেছে, হাসপাতালে না গেলে তিনি সুস্থ হবেন না, তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হোক। মিঃ সোয়ান বরাবরই প্রাণতোষের ওপর বিরূপ। তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন না।

সেদিন নিয়মমত কয়েদিদের তাড়িয়ে এনে ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে লক্-আপ করা হল। প্রাণতোষ ভাল প্রাণায়াম জানতেন। লক্-আপে ঢুকেই তিনি শুরু করে দিলেন প্রাণায়াম-সাধনা। ঠিক ছ'টার সময়

তাঁর দেহ হয়ে গেল মড়ার মত নিঃসাড়। ওয়ার্ডের বন্ধুরা হইহই করে উঠল। স্টেচারে করে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হল জেল-হাসপাতালে। উদ্দেশ্য সফল হল। হাসপাতালে দেখা করতে এলেন সিরাজুল হক হরিপদ চৌধুরী আন্দামানগামী বন্ধুরা। আবেগে জড়িয়ে ধরলেন পরস্পর।

নকল-জ্বরের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সেটাকেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলেন তিনি। অচৈতন্য থাকতেন অধিকাংশ সময়। ভূমিকাটি এত নিখুঁত ছিল যে, জেল-কর্তৃপক্ষ নোটিশ-বোর্ডে তাঁকে মৃতপ্রায়-রোগী বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। জেল-সুপারিন্-টেনডেণ্ট মিঃ প্যাটনই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের কাছে সুপারিশ করে তাঁকে অন্যত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তাঁকে ভর্তি করা হল শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। সঙ্গে অবশ্য কড়া পাহারা।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে সকালের ডিউটিতে যে নার্সটি থাকতেন তিনি খুবই স্নেহশীলা। প্রাণতোষকে স্নেহ করতেন, দিদির মত যত্ন করতেন। প্রাণতোষ মনোভাব বুঝে তাঁকে বলে ফেললেন নিজের মনোবাসনা। 'দিদিভাই, মাকে অনেকদিন দেখিনি। তাঁকে দেখতে বড়ো ইচ্ছে হচ্ছে।'

নার্সটি বললেন, 'কি করে যাবেন? তাছাড়া আপনি অসুস্থ।'

প্রাণতোষ বললেন, 'দিদিভাই, অসুখ আমার ভান। আপনি একটু সহযোগিতা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তাঁকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে নার্সটি দুধের সঙ্গে ব্রাণ্ডি মিশিয়ে দিলেন। প্রাণতোষ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। এবার হাসপাতাল থেকে বেরোবার ফন্দি-ফিকির। দু'জন আর্মড-পুলিশ পালা করে তাঁর বেড পাহারা দিত। সকালে ছ'ঘন্টা একজন বিকেলে ছ'ঘন্টা আর একজন। রাত্রেও ওইরকম। চব্বিশ ঘন্টা পাহারা। ডিউটি-বদলের সময় একজন চলে যেত আর দ্বিতীয়জন এসে সেই জায়গায় বসত। এই আসা-যাওয়ার মধ্যে খুব অল্প সময়ের ফাঁক থাকত। সেই ফাঁকটুকুই কাজে লাগালেন প্রাণতোষ। বালিশের ওপর চাদর

ঢাকা দিয়ে হাসপাতালের জানালা গলে' দিলেন এক লাফ। ভাগ্য ভালই বলতে হবে। নিচে কেউ ছিল না।

প্রাণতোষ সোজা-রাস্তায় না গিয়ে, এ-গলি ও-গলি দিয়ে দ্রুত হেঁটে মুক্তারামবাবু স্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের মুখে—ভগিনীর শ্বশুরালয়ে। ভগিনী হেমনলিনী ও ভগ্নীপতি ডাঃ কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং তাঁর ভাইপোরা ছিলেন 'অনুশীলন সমিতি'-র সভ্য। প্রাণতোষ যদিও 'যুগান্তর দল'-এ ছিলেন তবুও অনুশীলন-সমিতির সভ্যদের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল খুবই। ফলে ওঁরা খুব আনন্দ পেলেন। যত্ন করে রেঁধে বেড়ে খাওয়ালেন। আহারাদি শেষ হতে না-হতেই পুলিশের আবিভাব। কিন্তু এঁরাও সতর্কই ছিলেন ঘটনার জন্য। সময়মত পাশের বাড়ির অব্যবহৃত নোংরা একটি বাথ-রুমে আত্মগোপন করার ফলে সে-যাত্রায় রক্ষা পেলেন।

ভোর-রাত্রেই ট্যাক্সি। সোজা শিয়ালদা স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে নৈহাটি। অতঃপর নৌকোযোগে চুঁচুড়ার জোড়াঘাট। নৌকা থেকে নামতেই, গোয়েন্দা ইন্‌স্‌পেক্টর বিধু পাল ও সুরেন রায়ের মুখোমুখি। এঁরা দুজনেই ছিলেন প্রাণতোষের শুভার্থী। বিধু পাল বললেন, 'আসুন চাটুজ্জেমশাই, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।'

সত্যি সত্যি তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন বিধু পাল। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ গোয়েন্দা-পুলিশ তাঁর উপর নজর রাখলেন সর্বক্ষণ। রাজরাজেশ্বরী অনেকদিন পরে পুত্রকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। পরদিন মা-কে প্রণাম করে প্রাণতোষ বললেন, 'আসি মা।'

তিনি জানতেন পুলিশ অপেক্ষা করছে দরজার পাশে। এবার হুগলী জেল। তাঁর ঘরটি ছিল বেশ বড়ো, দরজা-জানালাগুলোও সেই রকম, লোহার খাট বিছানা মশারি, টেবিল ছিল, লেখার প্যাড কালি-কলম। তাঁর সহযোগী ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-দখল মামলার আসামী নীরোদ দাস। কিন্তু তাঁর ওপর জেল-কর্তৃপক্ষের ব্যবহার ছিল নিষ্ঠুর। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবং চিকিৎসাও হত না ঠিকমত। প্রাণতোষ ক্ষুব্ধ হন।

এই ক্ষুব্ধতা প্রকাশ পেল জেল থেকে ছাড়া পাবার পর। আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি একটি চিঠি লেখেন। বিষয়ঃ নীরোদ দাসের প্রতি অবহেলা। পত্রটি প্রকাশ পেতেই হুগলী-জেলের জেলার ও গোয়েন্দা-বিভাগ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। নামহীন পত্রটির লেখক-কে আবিষ্কার করবার জন্যে তারা আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার যদিও নামটি জানতেন তবু প্রকাশ করেননি। রক্ষা পেয়ে যান প্রাণতোষ।

এই সময়ই তিনি স্ব-গৃহে অন্তরীণ হয়ে থাকেন দীর্ঘকাল। সঙ্গী ছিল না তখন, সময় কাটাতে হত একা একাই। দিনমানে ছাড়া থাকতেন আর রাত্রে গৃহবন্দী। দিনের বেলা তাঁর যাতায়াত ছিল কাছারিঘাট পিপুলপাতি থানা নিয়োগী-গিন্নীর ঘাট ও চুঁচুড়া টাওয়ার ক্লাব-অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সপ্তাহে একদিন, শুক্রবার, চুঁচুড়া সদর থানায় হাজিরা দিয়ে খাতায় সই করিয়ে নিয়ে আসতেন। নজরবন্দী থাকাকালীন সরকারের কাছ থেকে মাসিক ১২৫ টাকা আর রাজরাজেশ্বরী দেবী ৭৫ টাকা করে পেতেন।

রাজনীতির ঊর্ধে একটি গুণী ছেলের সাক্ষাৎ পান এখানে। একদিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বছর চোদ্দ-পনেরো বয়সের একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। বলাই দাস। ছেলেটি নৈহাটির হুকুমচাঁদ জুটমিলে কাজ করত। কাজ চলে গেছে বলে মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রাণতোষ তাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন এবং থানায় জানালেন যে বাড়িতে টুকিটাকি কাজ করার জন্যে তাকে বাড়িতে রাখতে চান। থানা সম্মতি জানায়। কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করেন ছেলেটির অঙ্কনে প্রবণতা আছে। তিনি পরিতোষকে দিয়ে কিনে আনালেন আঁকার সরঞ্জাম। বলাই খুব খুশি। অঙ্কনকর্মে সে যাতে আরও উন্নতি করতে পারে সেজন্য তাকে পাঠানো হল শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর ছাত্র মহাদেব মণ্ডলের কাছে। তাঁর কাছে শিক্ষা সমাপ্ত করে বলাই চলে যায় বোম্বেতে। সেখানে সে প্রভূত উন্নতি করে।

এই সময়কালে তাঁর চিন্তার পরিবর্তন আসে। নজরবন্দী

থাকাকালীন মার্কসের বই তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ফলে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ফরিদপুরে পরিতোষের চিন্তাও অনুরূপভাবে আলোড়িত হয়। দুজনেরই তখন উত্তরণের কাল।

১৬ সাংবাদিকতা

প্রাণতোষকে লেখালেখির ব্যাপারে প্রেরণা দিয়েছেন গীষ্পতি ভট্টাচার্য। এই গীষ্পতি ছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ও ষড়দর্শনের পরীক্ষক সীতারাম বেদান্তশাস্ত্রীর পুত্র। তাঁর অন্যতম শিষ্য—সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ। পিতার নিকট সংস্কৃতচর্চা ছাড়াও, ইংরাজী ও বাঙলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পরীক্ষায় বৃত্তি পান। কাজী নজরুল ও প্রাণতোষ এঁর সান্নিধ্যে এসে বিশেষ-ভাবে উপকৃত হন।

গীষ্পতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কৃষ্ণকমল দত্ত। দুজনেই কৃতী ছাত্র এবং বৃত্তিভোগী। দুজনে স্থির করলেন বৃত্তির এই টাকায় বই কিনে পাঠাগার স্থাপন করবেন। পাঠাগার তৈরী হল চুঁচুড়া ভূদেব-ভবনের কাছে দত্ত লজ-এ এবং নাম রাখা হল—ছাত্র সম্মিলনী। গীষ্পতি ও তাঁর বন্ধু অতঃপর প্রকাশ করলেন 'ছাত্রবন্ধু' নামে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা। প্রাণতোষ সেই পত্রিকায় একটি অনুবাদ কবিতা লিখেছিলেন। গীষ্পতি প্রাণতোষের মনে লেখা ও পড়ার প্রেরণা যুগিয়েছেন। দেশ-বিদেশের বই পড়া এবং বিবিধ তথ্যাদি সংগ্রহ করে প্রবন্ধ রচনার চর্চা ও পরিণতি ঘটে এই সময়।

১৯৩৮ সালে প্রাণতোষ পাকাপাকি ভাবে মুক্তি পান। সেই সময় বন্ধুবর রমেশচন্দ্র বসু তাঁকে নিয়ে আসেন দৈণিক কৃষক পত্রিকায়। রমেশচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ ফরিদপুরে থাকাকালেই; তখন তিনি ঈশানচন্দ্র কলেজের ছাত্র, বয়সে বড়ো। ১৯৩৮ সালে কৃষক পত্রিকা প্রকাশ পায় মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক-সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায়। রমেশচন্দ্র ছিলেন তার ম্যানেজার। ১৯৩৮ সালে ওই পত্রিকায় যোগ

দেওয়ায়, প্রাণতোষ পেলেন রবিবাসরীয় ও ছোটদের বিভাগ পরিচালনার ভার। পত্রিকার নাম শুনে মনে হতে পারে পত্রিকাটি বুঝি কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে চালিত। মোটেই তা নয় বরং বিপরীত, পুঁজিপতিদের স্বার্থ-রক্ষক। ফজলুল হক সংস্রব ত্যাগ করার পর, সম্পাদক হলেন কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেকটর ধনপতি হেমেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর আমলে কাগজের অফিস ছিল ক্রীকরো-তে। হেমেনবাবুর সঙ্গে কর্মচারীদের বনিবনা হত না। ফলে গণ্ডগোল হত প্রায়ই। প্রাণতোষেরও ভাল লাগেনি তাঁকে।

'১৯৪২ সালে নলিনীরঞ্জন সরকার বার করেন স্বরাজ পত্রিকা। প্রাণতোষ এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন। ওদিকে 'নবযুগ' তখন চলছে হইহই করে। ১৯২০ সালে মে মাসে প্রথম প্রকাশিত এই পত্রিকা অল্পকাল চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।' —আমার জীবন ও কমিউনিস্ট পার্টি, মুজফ্ফর আহমেদ, পৃঃ ৯৬। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে যুক্ত বাঙলার 'কৃষক-প্রজা' দলের নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক-সাহেবের তদারকিতে কাজী নজরুলকে প্রধান সম্পাদক করে 'নবযুগ' আবার প্রকাশ পেল। কিন্তু তখন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় 'কাজী নজরুল' গ্রন্থে ২১৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : '১৯৪০ সালের ২২শে শ্রাবন রবীন্দ্র-তিরোধানের দিনেই নজরুলের এই ব্যাধি প্রকাশ পায়। ওইদিন রেডিও অফিসে নজরুল উপস্থিত ছিলেন এবং ওইখানে বসেই 'রবিহারা' নামে একটি কবিতা 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' নামে একটি গান লেখেন। 'রবিহারা' কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে শোকাচ্ছন্ন নজরুল আবৃত্তি করতে পারেন না, বারবার জিহ্বার অসাড়তায় আবৃত্তি ব্যাহত হতে থাকে। সেজন্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় উক্ত অসমাপ্ত কবিতা সম্পূর্ণ আবৃত্তি করে শোনান। কিন্তু ১৯৪০ সালে জুলাই মাসে এই রোগ ভালভাবে প্রকাশ পায় রেডিও স্টেশনে।' —নজরুল সচল হৃদপিণ্ড নিয়েও জীবন্মৃত হয়ে গেলেন।

'নবযুগ' ছিল দৈনিক পত্রিকা। কাজেই স্বরাজ-এ কাজ করতে করতেই নবযুগ-এ পার্ট-টাইম কাজ করতে থাকেন। এই দুই পত্রিকাতেও তাঁর ভূমিকা ছিল রবিবাসরীয় ও শিশু-বিভাগের দায়িত্বে।

স্বরাজ পত্রিকায় প্রাণতোষের চাকরি চলে যায় অন্যায়ের প্রতিবাদের কারণে। বিষয়টি একটু বিস্তারিত বলার প্রয়োজন আছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা-উপলক্ষে কলকাতায় বক্তৃতা দিতে এলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিশাল মঞ্চ, অজস্র মাইক। অসংখ্য মানুষের ভিড়। মাইক কোথায় কোথায় টাঙানো হবে এবং নারী ও পুরুষের বসার পৃথক পৃথক স্থান বিন্যস্ত করার পরিকল্পনা ও নক্সা রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল কংগ্রেস-কর্মী অমর ঘোষের উপর। তিনি ছিলেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কাছের লোক। পরিকল্পনা ও নক্সার জন্য অমর ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন চল্লিশ হাজার টাকার কনট্রাক্ট। কাজের অগ্রগতির জন্য তাঁকে অগ্রিম দেওয়া হয় পঁচিশ হাজার টাকা। কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়নি। জওহরলালজী গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত মঞ্চে উপস্থিত হন এবং বক্তৃতা দিতে গিয়ে দেখেন কোনো মাইকই কাজ করছে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, মাইক সচল হল না দেখে বিরক্ত প্রধানমন্ত্রী মঞ্চ ত্যাগ করে চলে যান। প্রাণতোষ ছিলেন মঞ্চের কাছেই সাংবাদিক হিসেবে। জওহরলালজী মঞ্চ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণতোষ দ্রুত চলে যান বৌবাজার স্ট্রীটের মোড়ে বেঙ্গল প্রভেন্সিয়াল কংগ্রেস-কমিটির অফিসে। সেখানকার এক কর্মীর কাছ থেকে শ্রীঘোষ কর্তৃক গৃহীত পঁচিশ হাজার টাকার রসিদের একটি ট্রিপলিকেট কপি সংগ্রহ করে সোজা স্বরাজ পত্রিকার অফিসে। রসিদের ব্লক হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। স্বরাজ পত্রিকার সম্পাদক তখন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে পরদিন কাগজে বড় বড় হেডিং-এ 'এ টাকা কার?' শিরোনামে সংবাদসহ ব্লকটি ছেপে দিলেন। কংগ্রেসী মহল রীতিমত বিচলিত হয়। অমর ঘোষ নিজেও ছিলেন আবার স্বরাজ-

পত্রিকার অন্যতম ডিরেক্টর। মুখ্যমন্ত্রী চাপ সৃষ্টি করলেন তাঁকে।

স্বরাজ-পত্রিকার বোর্ড অব ডিরেক্টরদের মিটিং বসে গেল। বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন কবি হুমায়ুন কবীর। প্রাণতোষকে ডেকে কংগ্রেস পার্টির পক্ষে ক্ষতিকারক এই-রকম কাজ করার কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। প্রাণতোষ শুধু বললেন, 'সাংবাদিক হিসাবে যা ভাল বুঝেছি তাই করেছি।' বোর্ড স্থির করেন, এই-রকম বিপদজনক সাংবাদিককে পত্রিকায় রাখা চলে না। হুমায়ুন কবীর বলেন, 'প্রাণতোষ এই পত্রিকার জন্য অনেক খেটেছে। মানুষটা একটু জেদী এবং সাংবাদিক-হিসেবে সৎ। তাকে কিছুদিন সময় দেওয়া হোক।' চারমাস যথেষ্ট সময়, বিনা কাজে তিনশো টাকা করে বেতনও পেয়েছেন প্রতিমাসে। কবীর-সাহেব ভেবেছিলেন প্রাণতোষ ক্ষমা চেয়ে মত-পরিবর্তন করবেন এই চার-মাস মাস ভাবনা-চিন্তা করে। কিন্তু তা হল না। প্রাণতোষ চাকরি খোয়ালেন।

এরপর 'যুগান্তর' পত্রিকায় মাসখানেক। এখানেও অনুরূপ বৃত্তান্ত। খবর এসেছিল, গ্রামের এক জমিদার এক কৃষক-প্রজাকে গুলি করে হত্যা করেছে। প্রাণতোষ সেই গ্রামে উপস্থিত হয়ে সংবাদ-সংগ্রহ করে রিপোর্ট দাখিল করেন। যুগান্তর পত্রিকার তৎকালীন সাংবাদিক-প্রধান (দক্ষিণারঞ্জন বসু) বললেন, 'সংবাদটি একটু অন্যভাবে লিখতে হবে।' প্রাণতোষ জানতে চাইলেন কিভাবে লিখতে হবে। দক্ষিণারঞ্জন জানালেন, 'লেখাটা ঘুরিয়ে দিন। লিখুন, ওই কৃষক-প্রজাটি আক্রমণ করতে আসায় আত্মরক্ষার্থে জমিদারবাবু বন্দুক তোলেন এবং আক্রান্ত হবার সময় বন্দুক নিয়ে টানাটানি করার ফলে বন্দুকের গুলি তার বুকে লাগে।'

প্রাণতোষ এক্ষেত্রেও মত পরিবর্তন করেননি এবং সেভাবে রিপোর্ট লেখেননি। কিন্তু বুঝতে পারলেন এখানেও সেই একই বৃত্তান্ত, ধনিক-বণিক শ্রেণীর তোষণ। আদর্শের গরমিল। তিনি যুগান্তরের চাকরি ছেড়ে দিলেন। সাংবাদিকতার কাজ এখানেই শেষ।

১৭· সংসার

১৯৪৩ সালে প্রাণতোষ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। স্ত্রী সুষমা দেবীর পিতা ঢাকা-নিবাসী নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। যে-কারণেই হোক রাজরাজেশ্বরী দেবী পুত্রবধূকে ঠিক আপন করে নিতে পারলেন না। মাতার সর্বময় কর্তৃত্ব ও পুত্রবধূর স্বীয় অধিকার—এই দুয়ের সংঘাতে বিব্রত প্রাণতোষ বাধ্য হলেন পৃথকান্ন হতে। অবশ্য মাতৃদেবীকে প্রাণতোষ যাবতীয় ব্যয়বাবদ অর্থ দিতেন। আর্থিক সংকট দেখা দিল স্বরাজ পত্রিকার চাকরি ত্যাগ করার পর।

গঙ্গা পেরিয়ে প্রাণতোষ মাঝে-মধ্যে নৈহাটির বাসন্তী কেবিনে আড্ডা দিতে যেতেন। বাসন্তী কেবিনের মালিক হরিবাবুর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয়। হরিবাবু একদিন বললেন, 'প্রাণতোষ, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমার এখানে রোজ আড্ডা দে তো। চা যত লাগে আমি দোব, ফ্রি।' হরিবাবুর দোকানে তখন মন্দার টান। প্রাণতোষ তাঁর সঙ্গী-সাথী নিয়ে কেবিন একেবারে জমাট করে তুললেন। খরিদ্দার বাড়তে লাগল। এই আড্ডায় যাঁরা আসতেন তারা হলেন—নীরোদ-বরণ মুখোপাধ্যায় সমরেশ বসু রমণীমোহন দত্ত এবং আরও অনেকে।

অবশ্য আড্ডা জমাট করার আগে, নৈহাটি কমার্সিয়াল কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন। সুযোগ এসেছিল হঠাৎ-ই। পূর্ব-পরিচিত শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন নৈহাটি কমার্সিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ। এই কলেজে বাঙলা-সাহিত্য বিষয়ে পড়াবার জন্যে তিনি প্রাণতোষকে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে আট মাস চাকরি করার পর বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রাণতোষের অধ্যাপনাতেও ইতি।

অনুরূপ আর-একটি প্রস্তাব আসে নীরোদবরণের কাছ থেকে। নীরোদবরণ চুঁচুড়া বড়বাজারের অধিবাসী। কলকাতায় রেডিয়েন্ট প্রসেস নামে ব্লক তৈরীর একটা কারখানা ও অফিস ছিল তাঁর। প্রাণতোষের বিস্তৃত পরিচিতি ও জন-সংযোগ থাকায় প্রাণতোষকে তিনি ওই অফিসে পাবলিক রিলেশন অফিসর নিযুক্ত করলেন। বেতন—তিনশত টাকা।

দুর্দিনে এরকম অভাবিত সাহায্য পাওয়ায়, প্রাণতোষ নিজের কাজের অতিরিক্ত, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে সুপারিশ করে রেডিয়েন্ট প্রসেসকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজ পাইয়ে দিয়েছিলেন। আরও ছোট-বড় বহু অর্ডার সংগ্রহ করে রেডিয়েন্ট প্রসেসের কাছে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

নীরোদবরণ প্রাণতোষের কাছে শুধু বস্ হয়ে থাকেননি, বন্ধুর মত থেকেছেন পাশে-পাশে। নজরুল-সম্বন্ধে লেখালেখির ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। এমনকি নিজ-ব্যয়ে অনুলেখকের কাজ দিয়ে 'মুদ্রণশিল্পের জয়যাত্রা' নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থও লিখিয়েছেন। প্রকৃত বন্ধুর মতই, প্রাণতোষ অসুস্থ হওয়ার পর দীর্ঘ সাত বছর তাঁকে বিনা-কাজে বেতন দিয়ে গেছেন। এখনও, প্রায় ষাট বছর পরেও, তাঁর সাহায্যের হাত প্রসারিত।

প্রাণতোষের পুত্র-সন্তান নেই, তিন কন্যা—১. গৌরী ২. ভারতী ও ৩. আরতি। মেজমেয়ে ভারতী পাঁচ বছর বয়সেই লিভারের অসুখে বাবা-মাকে কাঁদিয়ে চলে যায়। তাঁর দুর্ভাগ্য যে অপর দুই কন্যার কেউই পিতার কিঞ্চিন্মাত্র গুণপনা পাননি, বরং বিপরীত, স্বভাবে ও আচরণে।

১৮. কমিউনিজমের পথে

'১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত উজবেকিস্তান রিপাবলিকের রাজধানী তাশখন্দ শহরে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হয়। ওই পার্টি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত হয়।' —আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি : মুজফ্ফর আহমেদ। পৃষ্ঠা-৭৯। ভারত থেকে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায় তাশখন্দে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের প্রথম অধিবেশনে প্রেসিডিয়ামের একুশজনের মধ্যে একজন নির্বাচিত হন।

এম এন রায় কিন্তু নিজেকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি বলে

মনে করতেন না। ভাবতেন, নিজেই নিজের প্রতিনিধি। এরকম মানসিকতা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে ভারত তথা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রতিভূ বলে গণ্য করা যায় না। কারণ, একজন প্রকৃত কমিউনিস্টের প্রধান পরিচয় পার্টির প্রতি তাঁর আনুগত্য। এরকম আনুগত্য এম. এন. রায়ের ছিল না।

এদিকে দেশে তখন গোলমেলে অবস্থা। গান্ধী-পরিচালিত অহিংস অসহযোগ-আন্দোলনে দেশ উত্তপ্ত। এই আন্দোলনে তোষণবাদ ও আপোস-সম্মত সংগ্রাম ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। আর একদিকে, সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলন। এই বিপ্লববাদী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল তিনটি : ১. যুগান্তর ২. অনুশীলন সমিতি ও ৩. শ্রীসঙ্ঘ। সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ইংরেজকে ভারত-ত্যাগে বাধ্য করাই ছিল তিনটি বিপ্লবী-কেন্দ্রের লক্ষ্য। বিপ্লবীরা এবং গান্ধীবাদীরা, কোনো দলের সঠিক চিন্তা-ভাবনা ছিল না দেশ স্বাধীন হলে শাসক-শ্রেণীর চরিত্র কেমন হবে।

১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর বাঙলাদেশে ওয়াকার্স এন্ড পেজান্টস্ পার্টি গঠিত হয়। ১৯২৭ সালে বোম্বাই-তে এবং ১৯২৮ সালে পাঞ্জাবে ও উত্তরপ্রদেশে এই পার্টি জন্ম নেয়। বাঙলাদেশে এই পার্টির নামকরণ হয়, বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল।

হুগলী বিদ্যামন্দির-কেন্দ্রে ধরণীকান্ত গোস্বামী, আবদুল হালিম, সিরাজুল হক, ভূপতি মজুমদার প্রমুখ পরস্পর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মুজাফ্ফর-সাহেবের সঙ্গে ধরণীকান্তের পরিচয় করিয়ে দেন আবদুল হালিম। ধরণীবাবুর মনে সংশয় ছিল, বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক-দল এবং কমিউনিস্ট পার্টি এক কিনা। মুজাফ্ফর আহমেদ লিখেছেন : 'আমরা তাঁকে (ধরণীবাবুকে) বুঝিয়েছিলাম যে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক-দল ছদ্মাবরণে কমিউনিস্ট পার্টি নয়।' —আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি : মুজাফ্ফর আহমেদ, পৃ ৫৩৩।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতে কমিউনিস্ট-আন্দোলন একটা পৃথক ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল। দুই দলের কারো সঙ্গেই, জাতীয়

মুক্তি-আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না। মুজাফ্ফর আহমেদের সঙ্গে এম. এন. রায়ের যোগাযোগ যেমন ছিল, তেমনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল চিঠিপত্রে। মুজাফ্ফর সাহেব অবশ্য এম. এন. রায় নলিনী গুপ্ত বা অবনী মুখোপাধ্যায়ের মত বিদেশের সার-সংগ্রহ করে দেশের মাটি উর্বর করতে চাননি, তাঁর কর্ম ও চিন্তাধারা ছিল দেশের মাটির সঙ্গে জারিত। ওদিকে ১৯২৬ সালের ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল তিনদিন কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়ার এক গোপন কনফারেন্স হয়। এটা ছিল ধরণী গোস্বামী গোপেন চক্রবর্তী ও তাঁদের সঙ্গীদের আলাদা এক কমিউনিস্ট পার্টির কনফারেন্স। ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। এন. এন. রায় অবশ্য ব্যাপারটা জানতেন, কিন্তু মুজাফ্ফর আহমেদ একেবারেই অবহিত ছিলেন না। এইভাবে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপরীত ধারা পাশাপাশি চলছিল।

সশস্ত্র বিপ্লব-আন্দোলন থেকে বিযুক্ত হয়ে অনেকেই কমিউনিস্ট হয়েছেন। 'যুগান্তর'-দল ত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন, বিজয় মোদক, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-দখলের অন্যতম প্রধান নায়ক গণেশ ঘোষ। ভারতে মার্কসবাদ-চর্চা ও তার বিকাশে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের ভূমিকা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১. ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস পার্টি ২. কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন ৩ ইণ্ডিয়ান প্রলেতারিয়ান রেভলিউশনারি পার্টি ৪. ডেমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড (ওয়ার্কার্স পার্টি অব ইণ্ডিয়া) ৫. কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি ৬. রেভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া ৭. লেবার পার্টি। —ভারতে মার্কসবাদ : উৎপত্তি ও বিকাশ, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পরিবর্তন, ১৬ মার্চ ১৯৮৩, বর্ষ ৫ সংখ্যা ৩৬, পৃ ১২-১৭।

প্রাণতোষ কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হন ১৯২৩ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে চুঁচুড়ায়। গান্ধীবাদের প্রতি ছদ্ম-আনুগত্যে থেকে প্রকৃতপক্ষে যুগান্তর-দলের হয়ে কাজ করতে থাকেন। ১৯২২ সালে, ৩২ নং কলেজ স্কোয়ারে, মুজাফ্ফর-সাহেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়।

নজরুলও থাকতেন সেখানে। ১৯২৪ সালে মুজাফ্‌ফর-সাহেব কানপুর-কমিউনিস্ট-ষড়যন্ত্র-মামলায় আসামীরূপে চিহ্নিত হলে. দেশব্যাপী আলোচনার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। কাজী নজরুল উচ্ছ্বসিত হয়ে মুজাফ্‌ফর-সাহেবের গুণগান করতে থাকেন। ১৯২৬ সালে প্রাণতোষ আহমেদ-সাহেবের কাছের-মানুষ হন।

১৯৩০ সালে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান প্রোলেতারিয়ান রেভোলিউশনারি পার্টি গঠিত হলে, পরিতোষ এই দলে আসেন। আট বছর পরে, ১৯৩৮ সালে মতান্তরে ১৯৩৯ পরিতোষ সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত (১৯৮৯) তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। পার্টি ভাগ হবার পর তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-তে এসেছেন এবং হুগলীজেলার 'কৃষক-সভা'র বিশিষ্ট নেতা-রূপে কাজ করেছেন। বর্তমানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র হুগলীজেলার অন্যতম সহকারী সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ সি. পি. আই (এম) দলের অন্যতম সভ্য এবং বঙ্গীয় কৃষক-সভার সম্পাদক, পরবর্তীকালে সহ-সভাপতি।

পরিতোষের মনোভাব ও আদর্শ মুজাফ্‌ফর-অনুসারী। আর প্রাণতোষ একই মতাবলম্বী তবু পার্টির সভ্য না-হয়ে শুধু সমর্থক হয়েই রইলেন।

কালিচরণ ঘোষ তাঁর চন্দননগরের বাড়িতে কমিউনিজমের পঠন-পাঠনের জন্য স্কুল খুলেছিলেন। এই স্কুলে যাঁরা পাঠ নিতে আসতেন তাঁদের মধ্যে ভবানী মুখোপাধ্যায় মহীতোষ নন্দী লক্ষ্মী পাল, আনন্দ পাল, পুষ্প ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কালিচরণের স্কুলের এইসব ছাত্র/ছাত্রীরা শুধু ঘরে বসেই পাঠ নিতেন তা নয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও আদর্শ প্রচারের জন্য গ্রামে-গ্রামে চলে যেতেন। চন্দননগরে কমিউনিজম-চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে কালিচরণ ঘোষের ভূমিকা অনেকখানি।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সি. পি. আই. (এম). সদস্য ভবানী মুখো-

পাধ্যায় উত্তরকালে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পরিষদীয় মন্ত্রী এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পরিবেশ-মন্ত্রীর ভূমিকায় জনগণের সেবায় তাদের কাছের-মানুষ হয়ে উঠেছেন।

মহীতোষ নন্দী— চন্দননগরের বিখ্যাত নন্দী-পরিবারের সন্তান। চন্দননগর যখন বিপ্লবের অগ্নিশিখায় ঝলসে উঠেছে তখন এই নন্দী-পরিবারের ছেলেরা পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে বহু কাজ করেছেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ও, এই পরিবারের সন্তানগণ গুপ্ত-সমিতির ক্রিয়াকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। চন্দননগরের অন্যতম বিপ্লবী-নেতা ছিলেন —সন্তোষ নন্দী। তাঁর দুই ভাই গোপাল নন্দী ও মহীতোষ নন্দী বিপ্লবীদের চিঠিপত্র ও অস্ত্রাদি গোপনে চালান দিতেন। মহীতোষ নন্দী পরবর্তীকালে সি. পি. আই. (এম) পার্টিতে যোগ দেন। এখন তিনি হুগলি জেলার সি. পি আই. (এম) পার্টির অন্যতম সহকারী সম্পাদক। নিরলস ও নিরহংকার কর্মী।

পুষ্প ঘোষ তেভাগা-আন্দোলনে মহিলা-দলের নেতৃত্ব দেন। ওই দলের পাঁচজন মহিলা পুলিশের গুলিতে মারা যান। পুষ্প ঘোষেরও গুলি লাগে তবে চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় সেরে ওঠেন এবং আজও তিনি শোষণ-মুক্তির সংগ্রামে সামিল।

কমিউনিস্ট পার্টি যখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে তখন প্রাণতোষের বাড়িতে প্রায়ই গুপ্তসভা হত। প্রসঙ্গত, প্রতাপপুরের ওই বাড়িতে হুগলি জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। সেদিনের ওই প্রতিষ্ঠা-সভায় উপস্থিত ছিলেন, পি. সি. যোশী, বিজয় মোদক, প্রাণতোষ, পরিতোষ, হামিদুল হক, সুশীতল রায়চৌধুরী, ধরণী গোস্বামী, কালিচরণ ঘোষ, সন্তোষ ভড় প্রমুখ। হুগলি জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রস্তাব ও প্রেরণা মুখ্যত কালিচরণ ঘোষ বিজয় মোদক ও পরিতোষের। গুপ্তসভা চলত প্রাণতোষের দোতলার লাইব্রেরি-ঘরে। রাজরাজেশ্বরী দেবী তদারকি করতেন। তেল-মাখা মুড়ি আর চা যুগিয়ে যেতেন সকলকে। এই সংগ্রামী মহিলা সশস্ত্র-আন্দোলনে সহযোদ্ধা হিসাবে ও কমিউনিস্ট-আন্দোলনে কমরেডরূপে নীরব ভূমিকা পালন করে

গেছেন আজীবন।

আর-এক সংগ্রামী মহিলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রতিভা গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় ফরিদপুরেই ১৯৩৩ সালে। স্বামী কুলীন-বংশের এক কুসন্তান। মধ্যযুগীয় মানসিকতার ফলে স্ত্রীর উপর অত্যাচার ও পীড়নের শেষ ছিল না। একটি পুত্রসন্তান জন্মায়। এই পুত্রের প্রতি অবহেলা ও মাতার প্রতি অত্যাচার সীমাহীন হয়ে ওঠে। আহার জুটত না অধিকাংশ দিন। স্নান হত না নিয়মিত। অশান্তি প্রতিদিন।

এক ভাশুর হরেন্দ্রনাথ ছিলেন ঢাকা জেলার অন্যতম বিপ্লবী। গ্রামে তিনি এক প্রাইমারি স্কুল খুলেছিলেন, প্রতিভাকে সেই স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা নিযুক্ত করলেন। প্রতিভা এই সময় উচ্চশিক্ষার বাসনা জানিয়ে পরিতোষকে চিঠি লেখেন। পরিতোষ একথা জানায় দাদা প্রাণতোষকে। প্রাণতোষ এ ভার গ্রহণ করেন।

চুঁচুড়ায় এসে সপুত্র প্রতিভ ওঠেন প্রাণতোষের আশ্রয়ে। বন্ধু শিশির চট্টোপাধ্যায় তাঁকে চন্দননগর বুড়ো-শিবতলায় ভারতী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা করে দেন। সেটা ১৯৩৮ সাল।

প্রতিভা বহুশ্রমে অনলস পড়াশোনা শুরু করলেন। পাশ করলেন আই এ., বি. এ। এই পড়াশোনার সঙ্গে তাঁকে পুত্রের প্রতি যত্ন নিতে হত সংসার দেখতে হত পার্টির কাজ করতে হত। পরিতোষ বিজয় মোদক কালিচরণ ঘোষ কমল চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকের সঙ্গে পার্টির কাজ করতে হত। প্রাণতোষ নিয়মিত খবর নিতেন। এম. এ. পড়ার সময়েও তাঁর কাজ ছিল একই রকম।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, কোনো কোনো নেতা স্বার্থপর সুবিধাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল, রবিবার, তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে বন্দীমুক্তি ও বন্দীর মর্যাদাদানের দাবিতে এক দীর্ঘ মিছিল কলকাতার রাস্তায় নামে। মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী তখন ডঃ বিধানচন্দ্র রায় আর দেহরক্ষা-মন্ত্রী ভুপতি মজুমদার। এঁরা দুজন মিছিলের গতিরোধের আদেশ

দিলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল থেকে বেরিয়ে মিছিল বউবাজার স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলছিল কলেজ স্ট্রীটের দিকে—সেখানে আর-এক মিছিলের সাথে যুক্ত হবে বলে। পুলিশ পথরোধ করে। প্রতিভা ও সহযোদ্ধারা পুলিশ-ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যেতেই পুলিশ প্রথমে লাঠি চালায় পরে মিছিল রোধ করা যাচ্ছে না দেখে গুলি ছোঁড়ে। প্রতিভা লতিকা গীতা ও অমিয়া লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। ইংরেজ চলে গেছে কিন্তু রক্তবীজ রেখে গেছে। ভূপতিবাবুরা সেই রক্তবীজের ফসল। প্রতিভা গঙ্গোপাধ্যায়ের ভগিনী প্রভা জীবিতা এবং দিদির পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন আজও। দলত্যাগী আরও একজন—ধরণী গোস্বামী। তিনি যোগ দেন সি পি আই দলে।

হুগলি জেলার কমিউনিস্ট-আন্দোলনে আর-একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি রেবতী বর্মণ। অনুশীলন-সমিতি হতে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিলেন। সমিতিতে থাকাকালীন সাহিত্য-প্রচারের উদ্দেশ্যে 'বন্ধু' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। লেখার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। কমিউনিস্ট হবার পর মার্কসবাদ-সম্মত নানা রচনা লিখতে থাকেন। পাশাপাশি কমিউ-নিজমের ক্লাস নিতেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কমিউনিস্ট-আন্দোলনে সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

কারাবাস করেছেন দীর্ঘকাল। যৌবনকে কারাগারে বিসর্জন দিয়ে প্রৌঢ় বয়সে মুক্তি পান এবং সঙ্গে করে আনেন কালব্যাধি—কুষ্ঠ। এই ব্যাধি নিয়ে প্রতাপপুরে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা-অফিসে তিনি ওঠেন এবং বাস করেন। এখানেও তিনি পার্টির ক্লাস নিতেন এবং গ্রন্থাদি রচনায় ব্যাপৃত থাকতেন। 'সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ' তাঁর রচিত একটি গ্রন্থ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হল, কার্লমার্কসের 'ক্যাপিটাল'-গ্রন্থের সহজ অনুবাদ। বহু বাঙলা ও ইংরাজি পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু মূল্যবান রচনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেগুলি সংকলন প্রয়োজন।

মুজাফ্ফর আহমেদ খুবই স্নেহশীল ছিলেন প্রাণতোষের উপর। প্রাণতোষ নানা বিষয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ নিতেন। কেন্দ্রীয় সরকার

যখন স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের তাম্রপত্র ও মাসিক-ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তখন প্রাণতোষ তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন এটা গ্রহণ করা সংগত হবে কিনা। কংগ্রেস-দল কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি বলেন, 'ওটা নিয়ে নাও।' প্রাণতোষের সাংসারিক দুর্দশার কথা বিবেচনা করেই তাঁর এই সম্মতি দান।

পরিতোষ কিন্তু দাদাকে ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। দাদা যখন শ্রীরামপুরে শৈলেশ মিত্রের বাড়িতে পাঁচু ভাদুড়ী কালিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন তখন ছোটভাই লাল-ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন কৃষক-আন্দোলনের কণ্টকাবৃত পথে।

১৯৪৯ সালে পাণ্ডুয়ায় ক্ষেতমজুরদের নিয়ে যে মজুরি-আন্দোলন হয় পরিতোষ তার নেতৃত্ব দেন। পুলিশ তাঁর খোঁজ করছে বুঝতে পেরে তিনি পলাতক অবস্থায় কৃষকদের মধ্যে গোপনে কাজ করে যেতে থাকেন। বেশিদিন এই গোপনতা রক্ষা করা যায়নি। পুলিশ তাঁর আশ্রয়স্থল হঠাৎ ঘেরাও করে। পরিতোষ ধানক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। শ্যেনচক্ষু পুলিশ সেইদিকে ধাবিত হয়। একক খণ্ডযুদ্ধে পরিতোষ পরাস্ত হয় এবং তাঁর পাঁজরের ডান-দিককার এক-একটি জয়েণ্ট ভেঙে, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১৯. নজরুল-চর্চা

রেডিয়েণ্ট প্রসেস-এ চাকরি করতে-করতেই চিন্তাটা মাথায় আসে। বন্ধুদের কাছে জানালেন বাসনা—নজরুলকে নিয়ে একখানা বই লিখলে কেমন হয়। বন্ধুরা উৎসাহ দিলেন। প্রেরণা সঞ্চার করলেন শিল্পাচার্য ভোলা চট্টোপাধ্যায় (ভি. সি.) ও দেবদত্ত এণ্ড কোম্পানির অন্যতম মালিক অনিল দেব।

পনেরো দিনের মধ্যেই লেখা শেষ। 'কাজী নজরুল'। প্রকাশক – দেবদত্ত এণ্ড কোং, ৪/৩৮ চিত্তরঞ্জন কলোনি, কলকাতা-৩২।

প্রচ্ছদ—ভোলা চট্টোপাধ্যায় লাল-কালিতে কাজী আর দেবদত্ত এণ্ড কোং, মাঝখানে সাদা - নজরুল লেখা। আবছা কালো পটভূমির বাম থেকে ডানদিক বরাবর ধাবমান উজ্জ্বল এক ধূমকেতু। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১২১, প্রকাশকাল—১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৫৫ সাল। মুদ্রক – বি. বি. টাট, এইচ. এস. প্রেস বরানগর। উৎসর্গ—ভোলা চট্টোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য—গ্রন্থটি প্রকাশ পাবার আগে, হুগলি পিপুলপাতির 'নবারুণ সঙ্ঘ' কাজী নজরুল সম্বন্ধে কিছু লিখতে বলায় প্রাণতোষ 'হুগলিতে নজরুল' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ওই প্রবন্ধটি পরে ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পৃ ২৯২-৯৪। এই সূত্রে দেশ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে সখ্য হয়।

বইটিতে একটিমাত্র ছবি ছিল কাজী-সাহেবের। দল-মাদল কামানের গায়ে হেলান-দেওয়া কাজীর যৌবনদীপ্ত সেই ছবিখানি। আর, পিছনের মলাটে লেখক প্রাণতোষের ছোট্ট একটি আলোকচিত্র। 'নিবেদন' দিয়ে শুরু, পরে 'পথচারী' নামে কাজীর একটি কবিতা। এগারোটি অধ্যায়, উপসংহার এবং পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ'। সূচিপত্র ছিল না। বইটি লিখতে নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছেন কবি সুবোধ রায়, অরবিন্দ পোদ্দার, ব্রজবিহারী বর্মণ, কবি সরিৎ শর্মা, কবি প্রণব মিত্র, রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী, শান্তিরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে যায়। কারণ, এটিই কাজী নজরুলের প্রথম জীবনী-গ্রন্থ। পশ্চিমবাংলায় নজরুল-চর্চার সূত্রপাত এই গ্রন্থ প্রকাশ হতেই। ওপার বাঙলায় আবুল ফজল ১৩৫৪ সালে 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' নামে একখানি বই লেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এতখানি সার্থক রচনা হয়নি। আর একজন, পশ্চিমবাংলার আবদুল কাদির ১৩৪৮ সালে 'সাপ্তাহিক কৃষক' পত্রিকায় ঈদ সংখ্যায় ৯-১০ পৃষ্ঠায় 'নজরুল জীবনী' নামে একটি প্রবন্ধ

লেখেন। প্রাণতোষ তাঁর গ্রন্থের ২য় সংস্করণে উল্লেখ করেছেন। ।ঙ এম. লাইব্রেরি, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলকাতা-৬, থেকে নজরুলের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে আজাহারউদ্দীন খান প্রণীত আলোচনা-গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' প্রকাশিত হয়। এটি একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

প্রাণতোষের 'কাজী নজরুল' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ। এই সংস্করণের প্রচ্ছদ আঁকেন মার্কসবাদী নেতা ও বিধানসভা-সদস্য মনোরঞ্জন হাজরার ভাই প্রশান্ত হাজরা। ছাপা হয় গণশক্তি প্রেসে। প্রকাশ পায় ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ (ইং ২৫ মে, ১৯৭৩)। পৃষ্ঠাসংখ্যা বেড়ে তিনশো ছত্রিশ, অধ্যায় একত্রিশ। 'আমার কৈফিয়ৎ' নামে লেখকের ভূমিকা যুক্ত হয়।

তৃতীয় সংস্করণটি পরিবর্তন পরিমার্জন পরিবর্ধন না-করে প্রকাশ করেন এ. মুখার্জি এণ্ড কোং. ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট কলকাতা-৭৩। 'কাজী নজরুল' গ্রন্থে 'সাংবাদিক নজরুল' নামে যে অধ্যায়টি আছে সেটিকে আরও পরিশীলিত ও তথ্যসমৃদ্ধ করে প্রাণতোষ একটি গ্রন্থ লেখেন। 'সাংবাদিক নজরুল'। ১৯৭৮ সালে প্রকাশ করেন দি ভার্সেটাইলস্. ২ বি. শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট. কলকাতা-৭৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৩১, প্রচ্ছদ তরুণ দত্ত। মুদ্রক আনন্দ, ৩ বি. মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৬। প্রচ্ছদ আঁকেন – চারু রায়। প্রচ্ছদের বিষয়বস্তু : 'ধূমকেতু' আর 'লাঙলের' পটভূমিতে দেখানো হয়েছে ধনিক ডানহাতে শ্রমিকের রক্ত নিঙড়ে বাঁ-হাতে ধনসম্পদ সঞ্চয় করছে। এই বইটি রচনা করতে প্রয়োজন হয়, ধূমকেতু লাঙল গণবানী প্রভৃতি পত্রিকার অরিজিন্যাল কপি। 'লাঙল' পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায় কমরেড আবদুল হালীমের সংগ্রহ থেকে। ধূমকেতু পত্রিকা—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে। প্রাণতোষ ও নাট্যকার মন্মথ রায় উভয়ে মিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় 'কাজী নজরুল' নামে যে তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন সেই সূত্রেও পুরনো কাগজের ফাইল পেতে সুবিধা হয়। তাছাড়া. বিজয় সেন, পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, বাঁধন সেনগুপ্ত প্রভৃত সাহায্য করেন।

কাজী যখন কাব্যাকাশে জ্যোতিষ্করূপে প্রতিভাত তখন তাঁকে নিয়ে বাক-বিতণ্ডা ও আলাপ-আলোচনা তুঙ্গে। প্রাণতোষ দৃঢ়তার সঙ্গে তার জবাব দিতে লাগলেন নানান চিঠিপত্রে ও প্রবন্ধে। 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় পর-পর দুটি লেখা প্রকাশ পেল। এই-সব লেখালেখির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মনে হল নজরুল-সম্বন্ধে আরও কিছু লেখার আছে। তারই ফলস্বরূপ রচিত হল— কাজী নজরুল (২য়)। বইটি পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রণ্ট সরকারের আংশিক অনুদানে এবং বাকিটা পশ্চিমবঙ্গ হুগলি জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়।

এছাড়া, নজরুল-বিষয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন প্রাণতোষ। এ বিষয়েও তিনি পথিকৃৎ— নজরুলের উপর সমগ্র কাব্যগ্রন্থ এখনও কেউ লেখেননি। বইটি আজও পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে। সহৃদয় কোনো প্রকাশক অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতি-দপ্তর, এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিলে নজরুল-চর্চার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

নজরুল একটি নাম
জপি অবিরাম
জানাই প্রণাম।
নিপীড়িত জনগণ
দেবে তার দাম ॥

প্রাণতোষের লেখা কবিতা। এটাই তাঁর জীবন-বেদ।

২০. নজরুল-চর্চার নানাদিক

বর্তমানে নজরুল-চর্চা মূলতঃ দুটি ধারায় বিভক্ত। ১. বাণিজ্য ও ২. গবেষণা। বাণিজ্যিক ধারাটি সম্বন্ধে কোনো কথা না-বলাই ভালো, কেননা নজরুল তাদের কাছে শুধু এক পণ্য। গবেষণামূলক কাজে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন ঃ

মুজাফ্ফর আহমেদ, আজাহারউদ্দীন খান, প্রাণতোষ চট্টো-পাধ্যায়, গোপাল হালদার, ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখো-

পাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আতাউর রহমান, কল্পতরু সেনগুপ্ত, নারায়ণ চৌধুরী, মিলন দত্ত প্রমুখ।

নজরুল-চর্চার এই রথীবৃন্দ সকলেই কিন্তু সততার সঙ্গে কাজ করেননি। কেউ কেউ আবার নজরুলের গান ভাঙিয়ে বাণিজ্য করতে চেয়েছেন, অন্যপক্ষে দু-একজনকে বাদ দিলে সত্যিকার গবেষণাধর্মী কাজ করেছেন অনেকে। বাঙলা দেশে এইরকম গবেষণাধর্মী কাজের পথিকৃৎ শাহাবুদ্দীন আহমদ। তাঁর লেখা 'শব্দধানুকী নজরুল' প্রকৃত অর্থে একটি গবেষণা-গ্রন্থ। এছাড়া তাঁর 'নজরুল-সাহিত্যে দর্শন', 'তীরন্দাজ' প্রভৃতি গ্রন্থও উন্নত মানের। রফিকুল ইসলামের 'নজরুল জীবনী'-ও গবেষণাধর্মী রচনা। অধ্যাপক সৈয়দ আলি আশরফের 'নজরুল ঃ প্রেমের এক অধ্যায়' একটি তথ্যভিত্তিক মূল্যবান গ্রন্থ।

পশ্চিমবাংলার নজরুল-চচার প্রধান দুই লেখক ঃ মুজাফফর আহমেদ ও প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। নজরুল বহুবার তাঁর সতীর্থদের কাছে বলেছেন, 'মুজাফ্ফর-সাহেব ছিলেন তাঁর বন্ধু দাশনিক ও রক্ষক (Friend Philosopher and Guide)। তিনি না থাকলে তোদের কাজীকে তোরা পেতিস না।' এ-হেন মুজাফ্ফর নজরুল -সম্পর্কে দুটি গ্রন্থ লেখেন। একটি হল—কাজী নজরুল প্রসঙ্গে (১৩৬৬), অন্যটি—কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা (১৯৬৫)। এই দুটি গ্রন্থে তিনি নজরুলকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। তার পরই উল্লেখযোগ্য লেখক—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। তাছাড়া আরও তিনজন হলেন—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (আমার বন্ধু নজরুল। হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। প্রথম প্রকাশ ঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫, জুন ১৯৬৮)—তথ্যনির্ভর গল্পচ্ছলে নজরুল -জীবনী। ড. সুশীলকুমার গুপ্ত (নজরুল চরিত-মানস) ও কল্পতরু সেনগুপ্ত (নজরুল গীতি-অন্বেষা)- নজরুলের বহু দুষ্প্রাপ্য গান-সহ তথ্যনির্ভর বলিষ্ঠ আলোচনা-গ্রন্থ।

কিছু লেখক আছেন যাঁরা অর্থোপার্জনের জন্য বাণিজ্য করেছেন

নজরুলকে নিয়ে। ছোট্ট একটি উদাহরণঃ বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত 'নজরুল-স্মৃতি' (১৩৭৬) গ্রন্থটি। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ওই গ্রন্থে একটি রম্য-রচনা লিখেছেনঃ 'যদি নীরব কবির বোধ ফিরে আসে।' এ-জাতীয় রম্য-রচনা 'স্মৃতিকথা'-য় ঠাঁই পায় কিভাবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছাড়া? ইদানিং এমন বহু তথাকথিত গবেষক দেখা যাচ্ছে যাঁরা গবেষণা-পত্রটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে যশ ও অর্থ দুই-ই পাচ্ছেন। বিচিত্র এই দেশ!

নজরুল-সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও, শেষ-বয়সে, নজরুলের অধ্যাত্ম-সাধনায় বিবর্তনকে প্রাণতোষ বিকার বলেই মনে করেছেন। যদিও এই পর্বে রচিত তাঁর গীতসমূহ প্রতিভার আর-একটি উজ্জ্বল প্রকাশ বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

পুস্তকাকারে অগ্রথিত তাঁর বহু প্রবন্ধ নানা সময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

১ সাপ্তাহিক বসুমতী। ৭৪ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭।
— নজরুল ও তাঁর মা।

২ সত্যযুগ। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭, রবিবার।
- আমার দেখা নজরুল।

৩ পশ্চিমবঙ্গ। বিশেষ নজরুল সংখ্যা। ২৬ মে, ১৯৭৮।
- দারিদ্র ও নজরুল।
- পশ্চিমবঙ্গ, নজরুল ও নজরুল-চর্চা।

[এই প্রবন্ধ দুটি পরে 'কাজী নজরুল' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।]

পশ্চিমবঙ্গে নজরুল-চর্চার যথাযথ প্রচার ও প্রসারের জন্য একটি আকাডেমির প্রয়োজন উপলব্ধি করেন সাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্ত। আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হলে, তার প্রতিষ্ঠাতা-কোষাধ্যক্ষ হন শ্রী সেনগুপ্ত। প্রধান পৃষ্ঠপোষক কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ। সভাপতি - বিচার-পতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র। সহ-সভাপতিবৃন্দ—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জগৎ ঘটক মনোরঞ্জন হাজরা ও প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। ঠিকানা ছিল —৬,

এন্টনিবাগান লেন, কলকাতা-৯। আকাদেমি 'নজরুল-জয়ন্তী'-নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন মহাজাতি সদনে নজরুল-জন্মোৎসব উপলক্ষে। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ব্যাপকভাবে নজরুল-চর্চা শুরু করেন নজরুল আকাডেমি। কিন্তু তার পরমায়ু অধিককাল ছিল না।

পরবর্তীকালে বর্ধমান জেলার কবির জন্মস্থান চুরুলিয়া গ্রামে নজরুল আকাদেমির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন—রেজাউল করিম (সম্পাদক) মযাহার হোসেন জিয়াদ আলি প্রমুখ। এঁরা সবাই নজরুলের আত্মীয়বর্গ। নানান সুবিধার জন্য কল্পতরু সেনগুপ্ত ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায়কে আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠান যদিচ ভারতে নজরুলকে জনপ্রিয় করার জন্য জন্মভূমিতে প্রতি বৎসর তাঁর জন্মদিনে বৃহদাকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি করে থাকেন এবং বিভিন্ন গুণীজনকে সম্বর্ধনা ও পুরস্কার দিয়ে থাকেন—পুরস্কার-প্রাপক এই গুণীজনদের মধ্যে আছেন কল্পতরু সেনগুপ্ত, ইন্দুবালা দেবী, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, আবদুল কাদির, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আজাহারউদ্দীন খান প্রমুখ এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের পক্ষে প্রচারকর্মও চালাচ্ছেন, তথাপি, দুঃখের বিষয়, গবেষণাধর্মী কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে কিছুই হচ্ছে না। অথচ বাঙলাদেশে নজরুল আকদেমি হতে প্রকাশিত 'নজরুল আকাডেমি পত্রিকা'টি কেবল স্মারক পত্রিকা নয়, নজরুল-চর্চার এক দিশারীও বটে। নানান ধরণের গঠনমূলক রচনার দ্বারা নজরুল-চর্চার সহায়তা করা হয় এই পত্রিকাটির মাধ্যমে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নজরুল-আকাদেমির স্মারক পত্রিকায় ঠিক তেমনটি পাওয়া যায় না।

আকাদেমির আহ্বানে প্রাণতোষ দু'বার চুরুলিয়ায় নজরুল-মেলায় যোগদান করে বক্তব্য রেখেছেন বটে কিন্তু ঠিকমত সায় দিতে পারেননি। আকাদেমির সামগ্রিকতায় কেমন-একটা স্বজন-কর্তৃত্বের গন্ধ পেয়েছেন আর তাতেই তিনি আঘাত পেয়েছেন বেশি। কবিপুত্র সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধের পরিবারের অসহ দারিদ্র আর তার পাশে কবির ভ্রাতুষ্পুত্র-

দের উত্তেজক নজরুল-চর্চা কেমন-যেন নিঃসার মনে হয়েছে তাঁর।

প্রাণতোষ চেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে নজরুল-চর্চা হোক নির্লোভ ও নির্ভেজাল। রূপের চটক নয়- সনিষ্ঠ গবেষণায় কবির জীবন ও সাহিত্য ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের কাছে নতুন দ্বারউদ্‌ঘাটন করুক। কাজীর নব মূল্যায়ন হোক। এই কাজে প্রাণতোষ আহ্বান করেন সকলকে। এবং এই কাজে যাঁরা লিপ্ত আছেন তাঁদের অনেককেই সাহায্য করেন নানাভাবে। মুজফ্‌ফর আহমদ তখন থাকতেন ৬১, কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৯ এই ঠিকানায়। ওই ঠিকানা থেকে তিনি প্রাণতোষকে দীর্ঘ একটি চিঠি লেখেন তার কিয়দংশ : 'জমাদার শম্ভুরায় নিজহাতে তোমায় যা লিখে দিয়েছিলেন তার একটা প্রতিলিপি তুমি খুব শীঘ্র যদি আমায় পাঠিয়ে দাও তবে আমি খুশি হব। তিনি হয়ত তোমাকে মৌখিক অনেক কথা বলে থাকবেন। সে-সব কথাও তুমি আমায় লিখিতভাবে জানাবে। এত বেশী কষ্ট আমি তোমায় দিতে চাইনে।' (২২ জুলাই ১৯৬৪)। প্রাণতোষ তাঁকে সাহায্য করেছেন সাধ্যমত।

আবার ২২-১-৭৪ তারিখে ঢাকা নজরুল-আকাদেমি থেকে নজরুল-সাধক শাহাবুদ্দীন আহমদ এক চিঠিতে প্রাণতোষকে লিখলেন, 'আপনি আপনার গ্রন্থে যেসব তথ্য প্রকাশ করেছেন সেগুলো ছাড়া নতুন কোন তথ্য কি আপনার হাতে আর আছে? নজরুলের অন্য কোন ফোটো? হুগলিতে যে বাড়িতে নজরুল থাকতেন সে বাড়ির ফটোটা আপনার গ্রন্থে থাকলে বোধহয় ভাল হত।'

নজরুল-জীবনীকার আবদুল কাদির ঢাকা থেকে লিখলেন (১২-৬-১৯৬৫) : 'আপনি মন্মথ রায়ের বর্তমান ঠিকানা আমাকে দিতে পারেন? নজরুল ইসলাম দু'খানা চিঠি লিখেছিলেন মন্মথ রায়কে, তার নকল আমি চাই। যোগাড় করে দিতে পারেন? 'আত্মশক্তি'তে নজরুলের একটা দীর্ঘ পত্র বেরিয়েছিল আমার শ্বশুর সম্বন্ধে। তার নকল যোগাড় করে দিতে পারেন? কিম্বা কিরূপে যোগাড় হতে পারে তার উপায় বাতলাতে পারেন?'

মণি বাগচী কলকাতা-২৮ থেকে ১-১-৬৮ তারিখে লিখলেন :

'অসহযোগ-আন্দোলনে নজরুলের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন তা ঠিকই। আপনি ঐ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেশবন্ধুর জীবনের প্রেক্ষাপটে যেটুকু পারেন নজরুল সম্পর্কে একটা Note আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। দলিলের হদিস যা দিয়েছেন তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ।'

চন্দননগরের অমল মিত্র (২৯-৪-৭০): 'শৈলজাবাবুর 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' বইটি এনেছি। 'আমার বন্ধু নজরুলের' সঙ্গে তুলনা করব বলে। আপনার বাড়িতেই করব। আপনি একটা Bibliography-র জন্য যে কটা নাম মনে পড়ে একটা কাগজে লিখবেন।'

৭ অক্টোবর '৬৮ তারিখে বাঁধন সেনগুপ্ত (হালিশহর, চব্বিশ পরগণা): 'প্রাণতোষবাবু, মুজফ্ফর-সাহেবের পরামর্শ-অনুযায়ী অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এ-চিঠি লিখছি। আশাকরি আপনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। আমি কাজী নজরুলের গান সম্পর্কিত গবেষণার কাজে হাত দিয়েছি। গত ৬ মাস ধরে এ ব্যাপারে নজরুলের সঙ্গী, বন্ধু এবং সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যাক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করছি। এবং এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন।'

নিতাই ঘটকও নজরুলের গানের ব্যাপারে প্রাণতোষের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেছেন। একটি চিঠিতে (১৫-৯-৭০) তিনি লিখেছেন: 'ওঠরে চাষী' গানখানির একঘেঁয়েমি ভাঙার জন্য একটি লাইনের সুর একটু বদলেছি। অবশ্য আসল সুরের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে। সাক্ষাতে সবিশেষ আলাপ কর্ব।'

মাসিক বাঙলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক দুর্গাদাস সরকার: 'আপনি তো নজরুল-ভাণ্ডারী। কতো অজ্ঞাত কথাই তো আপনার স্মৃতির ঝুলিতে রয়েছে, যা কেউ জানে না, এমন-সব কথাও আপনি ইচ্ছে করলেই লিখতে পারেন। দয়া করে আমার অনুরোধ রক্ষা করে আমাকে বাধিত করবেন।'

এইভাবে নানাজনে নানা ধরণের সাহায্য চেয়েছেন এবং প্রাণতোষ পরম উৎসাহে তাঁদের সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু যাঁরা বিকৃত করেন তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত কঠোর। 'নন্দন' পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ শাহেদুল্লাহ-কে এই মর্মে তিনি একখানি চিঠি লেখেন, উত্তরে শাহেদুল্লাহ-সাহেব লেখেন, 'নজরুল বেঁচে থাকতেই তাঁর উপর অনেক-কিছু বর্ষণ হয়েছে কিন্তু সেসব ছিটানো-কাদার দাগ কিছুই গায়ে লাগেনি। নতুন করে উদ্যম নিয়ে যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁদের সে-চেষ্টাও বিফল হবে। আমার প্রতি (এবং আমাদের অনেকের প্রতি) আপনার স্নেহ আপনার নিজগুণে। এর যোগ্য হবার চেষ্টা করে যাব।'

৪-৬-৬৯ ইং তারিখে লেখা হুগলি জেলার কমিউনিস্ট পার্টির জিলা-অফিসকে লেখা এক পত্রে সাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্ত লিখেছেন ঃ 'প্রাণতোষবাবুকে কাজে লাগাতে চাই বলেই জন্মোৎসব-কমিটিতে তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিলাম, স্মারক-পুস্তিকায় লেখার জন্যও তাঁর নাম আমরাই দিয়েছিলাম। কারণ আমরা জানি, যথার্থ বিপ্লবী নজরুলকে উপস্থিত করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। বিশেষ করে যারা আধ্যাত্মিকতায় নজরুলকে আড়াল করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে।'

আবার আজাহারউদ্দীন খান লিখেছেন (৭-১-৫৬ ইং) ঃ 'আপনার রচিত 'কাজী নজরুল' বইখানা পড়ার সৌভাগ্য এতদিনে হল। স্থানীয় পাঠাগার থেকে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। খুব ভাল লাগল। অলিভার টুইস্ট এক-চামচ পরিচ খেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, আরো চাই। আপনার বইখানা পড়ে আমার অবস্থাও হয়েছে তাই।'

প্রাণতোষ এই-সব স্তুতির উর্ধে, নির্মোহ মনে আজও কাজ করে চলেছেন। এক ঐতিহাসিক কবি-পুরুষকে সামগ্রিক চিত্রায়িত করার সাধনাতেই তিনি মশগুল। তাই তিনি বলতে পারেন ঃ নজরুলকে নিয়ে/যে গাল-গল্প চলছে/তাকে বলিষ্ঠ সাহিত্য-চাবুক মেরে/অবিকৃত নজরুল-চর্চা/আনা হোক দেশবাসীর কাছে।

২১. সাহিত্য-চর্চার নানা দিক

কাজী নজরুলের কাব্যসাহিত্য-চেতনাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ

করেছিলেন গোপীপতি ভট্টাচার্য। গোপীপতিবাবুর ইংরেজি-সাহিত্যে জ্ঞান কাজীর কাছে এনেছিল এক নতুন জগতের সন্ধান। তিনি বহু বিদেশি-কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করে ঘরোয়া আলোচনায় শোনাতেন। নজরুলের সঙ্গে প্রাণতোষও সেখানে থাকতেন। গোপীপতিবাবুর 'Ode to the west wind'-এর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা নজরুলকে 'ঝড়' কবিতা লিখতে প্রেরণা দিয়েছিল। তিনি 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান থেকে নানা শব্দ চয়ন করে, সংস্কৃত-কাব্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক যোগসূত্র স্থাপন করে মনোরম আলোচনা করতেন। কাজীর কাব্যে পৌরাণিক উপমার যে-সব উল্লেখ পাওয়া যায় তার পিছনে গোপীপতিবাবুর এই পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনার পরোক্ষ অবদান অনেকখানি। প্রাণতোষের সাহিত্যিক মানসিকতাও গোপীপতিবাবুর হাতেই গড়া।

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের (১৯২৪) মোহন্ত অপসারণের দাবিতে গোপীপতিবাবু ধরা পড়েন এবং হাজত-বাস করেন। তরুণ-সমাজ এই ঘটনায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। নজরুল এবং প্রাণতোষ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গোপীপতিবাবুর কাছ থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা পেয়েছিলেন নজরুল ও প্রাণতোষ দুজনেই।

প্রাণতোষ নৈহাটীতে 'খেয়ালী' নামে একটি সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। 'খেয়ালী'-র আড্ডা ছিল নৈহাটীর বাড়ুয্যে-পাড়ার এড্‌ভোকেট সতীন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে। এই পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন—খগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং কবিকুল সুবোধ রায়, চণ্ডী মিত্র, হেম বাগচি, সুনির্মল বসু প্রমুখ। কাজী নজরুল পত্রিকাটিকে স্বাগত জানিয়ে প্রাণতোষকে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। কবিতাটি এই রকম:

আয় রে পাগল আপন বিভোল
খুশির খেয়ালী।
হাতে নিয়ে রবাব-বেণু
রঙীন পেয়ালী।

ভোজপুরীদের প্রমত্ততায়
মাতুক ওরা রাজার সভায়,
আঙ্গিনাতে জ্বাল্ রে তুই
অরুণ-দেয়ালী।
ওরে খুশির খেয়ালী।

হুগলী — শুভার্থী
২০ ১০-২৪ — নজরুল ইসলাম

শেওড়াফুলি মধুচক্র সাহিত্য-সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সলিলচন্দ্র ঘোষের পুত্র আশিস প্রকাশ করেন একটি সাহিত্য-পত্রিকা—'স্পন্দন'। সম্পাদক ছিলেন প্রাণতোষ। এক বছর পরমায়ুর মধ্যে এই পত্রিকায় লিখেছেন—বনফুল, হরপ্রসাদ মিত্র, সলিলচন্দ্র ঘোষ ও প্রাণতোষ প্রমুখ। পত্রিকাটিকে গণমুখী করার প্রচেষ্টা ছিল প্রাণতোষের।

কাব্য ও সাহিত্যের চরিত্র কি হবে তা নিয়ে একদা প্রাণতোষ অনেক বিতর্ক করেছেন। 'আর্ট ফর আর্ট'স সেক' কোনদিনই তিনি স্বীকার করেননি। তিনি বিশ্বাস করেন—'আর্ট ফর পিপল্স সেক'। মার্কসবাদী গণমুখী সাহিত্যের উপরই তাঁর আস্থা। তবে পরিতোষ যেমন মার্কসবাদী-সাহিত্যেই নিমগ্ন প্রাণতোষ ঠিক তেমন নন। তাঁর কৌতূহল রবীন্দ্রনাথে, নজরুলে। বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও।

কখনও রবীন্দ্রনাথ কখনও নজরুল তাঁর কবিতার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রথম দিককার টলোমলো কবিতার একটি উদাহরণ : 'যা পেলাম ধন্য তাতেই আমি/হোক-না ছোট, ক্ষণিক দেওয়া/আমার কাছে তাইতো জানি দামি/তারি লাগি' দেহ-মনে পথের ধূলায় নামি।'

তাঁর কবিতা নানা সময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'দেশ' পত্রিকায় কয়েকবার, পুজাসংখ্যা যুগান্তর, দৈনিক স্বাধীনতা, অভ্যুদয় প্রভৃতি। বর্তমানকালে গোধূলি-মন (চন্দননগর), জনরব (হিন্দমোটর), কৃষ্টিদীপ (কোন্নগর), রূপসী ধরিত্রী (আঁটপুর), জঙ্গম (জাঙ্গিপাড়া), প্রবাহ, পল্লীর ডাক (শ্রীরামপুর), নন্দন (কলকাতা), পর্যবেক্ষক

(আসানসোল), অর্পণ (বৈদ্যবাটি)।

প্রবন্ধকার হিসাবে বেশ বলিষ্ঠ এবং প্রভাবমুক্ত। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই অবশ্য নজরুল-বিষয়ক। অন্য বিষয়ের রচনাও কিছু আছে। যেমন ঃ 'হুগলি জেলা ও নগেন্দ্রনাথ'—গায়ত্রী পত্রিকায়। নন্দন-এ 'নজরুল কি মদ খেতেন ?' গবেষক সরোজমোহন মিত্রের বক্তব্যের প্রতিবাদে, এই প্রবন্ধটি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সরোজবাবুর বক্তব্য, নজরুল মদ্যপ ছিলেন এবং লেখাটি প্রকাশিত হয় ওই নন্দন পত্রিকাতেই।

লেখা অবিরাম চলছিলই। রূপসী ধরিত্রী পত্রিকায় (শারদ সংখ্যা, ১৩৮৯) 'নাট্যকথা, নাটের গুরু' ছোট একটি প্রবন্ধে নাটককে গণমুখী করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। নন্দন-এ 'শ্রমিক-কৃষকবন্ধু নজরুল' প্রকাশিত হয়। সমরেশ-জায়া গৌরী বসুর মৃত্যুর পর, সমরেশবাবুর অনুরোধে, স্মৃতিচারণ ঃ 'গৌরী বসু—কিছু কথা, কিছু স্মৃতি' রচনাটি সন্নিবিষ্ট হয় 'আমাদের গৌরী বসু' নামক গ্রন্থে। (মৌসুমী প্রকাশনী পৃ ১৭-২০)। টেগোর রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের সম্পাদক সোমেন্দ্রনাথ বসু-র অনুরোধে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন।

স্রষ্টা-রূপে প্রাণতোষের মূল্যায়ন করতে গেলে বলতে হয় প্রাবন্ধিক হিসাবেই তাঁর অধিক মুন্সিয়ানা। অথচ তাঁর নামের আগে চারণ-কবি কথাটা অনেক সময় ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর কবিতায় চারণের রূপ ও ধর্মের প্রকাশ আছে বই-কি। তবে তিনি গ্রামে ও গঞ্জে নিজের লেখা গান যত-না প্রচার করেছেন নজরুলের গানই প্রচার করেছেন বেশি। সেই হিসাবে 'চারণ' বিশেষণটি তাঁর নিজের ক্ষেত্রে অস্বস্তির কারণ হয়েছে। স্বরচিত গণজাগরণমূলক গান নিজে গেয়ে প্রচার করাই চারণের প্রকৃত ধর্ম।

একদা প্রচুর গল্প লিখেছেন প্রাণতোষ। সংরক্ষণের অব্যবস্থায় সেই-সব গল্প লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে। 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি চেষ্টা করলে হয়তো উদ্ধার করা যেতে

পারে। এই সময়ে নাম-বিভ্রাট দেখা দেয়। 'প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়' নামে অন্য এক লেখকের আবির্ভাব ঘটে। ফলে, পাঠক-সমাজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তখন তিনি 'চট্টোপাধ্যায়' বাদ দিয়ে, পৈত্রিক ব্যবসা-সূত্রে পাওয়া, 'ঘটক' লিখতে শুরু করেন। আবার আর-এক বিপত্তি। মাসিক বসুমতীর সম্পাদক ও সুলেখক প্রাণতোষ ঘটকের সঙ্গে নাম-সংঘাত। এই বিপত্তি ও বিরক্তি তাঁকে বিব্রত করে। ফলে গল্প-লেখার চর্চাই ছেড়ে দিলেন।

স্বভাব-কবি হিসাবে তিনি অজস্র কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্র-নজরুল প্রভাবমুক্ত কবিতার একটি নমুনা ঃ এই হোক রবীন্দ্র-জন্ম-তিথিতে/আমাদের শপথ, আমাদের সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহের সুর/মেহনতী মানুষের খবর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে যাক্। ('রবীন্দ্রনাথ ১৩৮৬-তে'। প্রতিনিধি পত্রিকা) আবার 'লেনিন' কবিতায় ঃ গভীরে তাকিয়ে দেখি শ্রম বেচে/না খেয়ে যারা পাড়ায় পাড়ায় বিত্ত উৎপাদন করে/তাদের পাড়ায় পাড়ায় তুমি আস-যাও/দারিদ্র-সীমার নীচে ক্ষুধায় অভাবে/ভোগে যারা তাদের চিত্তে চিত্তে/বাঁচার বাসনাই তুমি তো লেনিন।/কুসংস্কার মোসাহেবী ঘন কুয়াসা/ভেদ করে সংগ্রামের দৃঢ় মনে/পায়ে পায়ে মিছিলে মিছিলে/তুমিই এনেছ লেনিন এ মহা-নিখিলে /দুনিয়ার মজদুর এক হও এ-মহামন্ত্র।

বৈদ্যবাটি আঞ্চলিক কমিটির ভারতের গণতান্ত্রিক যুব-ফেডা-রেশনের অষ্টম সম্মেলন উপলক্ষে যে স্মারকপত্র প্রকাশিত হয় তাতে ঃ স্বাগত হে যুবশক্তি,/তোমাদের জন্য অতি আগ্রহে/সর্বহারা নর ও নারীরা সব/আগ্রহের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

ওই কবিতার অন্য এক অংশে মেহনতী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, কর্মীদের আহ্বান করেন তাঁরা যেন গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ মানুষের কাছে যান—যাতে ঠিকমত গঠনমূলক কাজ হতে পারে ঃ ওরা চিনুক জানুক, ওরাই বিশ্বকর্মা। নারী ও পুরুষ হাত লাগিয়ে পুঁজিপতির/'বাস্তিল দুর্গের' এক একখানি ইট/খুলে ফেলে ময়দান করে দিক।

ছন্দ-ভাঙার মধ্য দিয়েই সমাজ-ভাঙার কাজে কবিতাকে অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন তিনি। ছন্দোবন্ধ কবিতার মধ্যেও তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট। 'নজরুল' কবিতাটিকে উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যায়ঃ

অগ্নিবীণার নজরুল/জান কিসে মশগুল
শুধু গান বুলবুল/গেয়ে তাঁর বিলকুল
দিন শুধু কাটেনি।
পীড়িতের/শোষিতের/ক্ষুধিতের
কথা কাজ ছাঁটেনি।
পয়সার/লালসার/লেলিহান/রসনায়
সেই পথে কভু সে ত হাঁটেনি।
'অগ্নিবীণার' সুর/করেছিল ভরপুর
'ভাঙ্গার গান' দিয়ে/গড়বার গান গেয়ে
স্বাধীনতা লাগি যারা/ঢেলেছিল প্রাণধারা
শোষিত ও সর্বহারা/তারা ছিল তার জান্
চেতনার শেষদিনও/গেয়ে গেছে গণ-গান
খোঁজ রেখো কি করেছে দান।

('জনরব' পত্রিকা। ১ বর্ষ ৫ সংখ্যা, মার্চ '৮৩)

ব্যক্তি প্রাণতোষকে প্রত্যক্ষ করা যায় এমন একটি কবিতা ঃ

আমি থাকি একা
সকলের মাঝে এ-জীবন-ভরে
পাই না তোমার দেখা
আমি থাকি একা।

এই বিষন্নতা ও বেদনা যে সাময়িক নয় তার প্রকাশ অন্য কবিতায় বিধৃত।

শত নিষেধের মাঝে/গোপনে যে সুর বাজে
হৃদয়-বীণার তারে/কে দেবে সেখানে বাধা ?
শত আয়াসের হাত/দিনকে বানায় রাত,
মনের দিবসে চলে/মনের গহীনে সাধা

পায় কি কখনো বাধা ?

পরক্ষণে ঃ

হেলাভরে চলে গেলে/দলিয়া কুসুম পায়,
অসহায় চোখে শুধু/চেয়ে থাকি নিরাশায়।

আবার ঃ

একলা ঘরে বসে বসে/গেয়েছি কত গান,
তবু তো হায় জুড়ালো না
এ মোর পোড়া প্রাণ।

ব্যক্তি-মানসের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে মথিত এইসব রচনাগুলিকে কবিতা না বলে গান-রূপেই চিহ্নিত করা যায়। এইরকম প্রায় ষাটটি গানের সংকলন, 'গীতিমালা' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে, মহিলা-সমিতির অধ্যক্ষা শ্রীমতি কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ করেন এবং তাঁর হাতেই তুলে দেন। বইটির স্বত্বও থাকে তাঁর নামে।

কবি বুদ্ধদেব বসু একবার নজরুল সম্পর্কে বলেছিলেন, নজরুলের কবিতার ভাবে অভিনবত্ব আছে, আঙ্গিকে নেই। একথা নজরুলের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সত্য না হলেও, প্রাণতোষের ক্ষেত্রে নির্মমভাবে সত্য। তিনি এজন্য সংকুচিত নন। কবিতায় আঙ্গিকের চেয়ে ভাবকেই বেশি গুরুত্ব দেন তিনি। প্রাণতোষ বিশ্বাস করেন, মানুষই দেবতা। মানুষেরই জয়গান প্রকৃত কাজ। এই কাজ করার ব্যাপারে কবিতা অন্যতম অস্ত্র। এই বিষয়ই তাঁর কবিতার মূলধন। এতেই তাঁর শান্তি এবং পূর্ণতা।

সংযোজন ঃ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-কমিটির সদস্য, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, সারাভারত কৃষক-সভার পশ্চিমবঙ্গ-শাখার সহ-সভাপতি পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় ২২ মার্চ, ১৯৮৯—নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ-হাসপাতালে, সকালে, শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

বেশ কয়েকমাস ধরেই ভুগছিলেন তিনি। প্রথমবার পেটে অপা-রেশন হবার পর, পার্টির প্রতিনিধি-হিসেবে, ত্রিবান্দ্রামে গেলেন পার্টির

সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দিতে, ভঙ্গুর শরীর নিয়ে। তাঁর দুর্দম প্রাণশক্তি এমনই ছিল যে কিছুতেই বোঝা যায়নি তাঁর শেষদিন এত সন্নিকটে।

নিত্য-সহচর, কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনে জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে—এ-নিয়ে অনেকের সংশয় ছিল। সব সংশয় দূর করে এই বৃদ্ধ বয়সে (৮৪), অসুস্থ শরীরে, তিনি চিঠি লিখে পাঠান শ্রীরামপুর পার্টি-অফিসে কমরেড মহীতোষ নন্দীকে। তাঁর এই চিঠির সম্পূর্ণ বয়ান 'গণশক্তি' পত্রিকায় অবিকল ছাপা হয় ২৪-৩-৮৯ তারিখের সংখ্যায়।

বিশাল শোকমিছিল। ২৪ মার্চ, ১৯৮৯। সকাল। হুগলি জেলা-অফিস থেকে মরদেহ বের করা হয়। ৭৭টি মাইকে ৭৭ জন নওজওয়ান। গায়ে জড়িয়েছে রক্ত-পতাকা। লাখো মানুষের মিছিল। প্রাণতোষ ও তাঁর অসুস্থা সহধর্মিনী সুষমা দেবী, বিদ্যুৎ-মন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত, পরিবহন-মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী, 'গণশক্তি'-সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, কমরেড বিজয় মোদক, মহীতোষ নন্দী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি গাড়িতে-মিছিলে সামিল। এই ঐতিহাসিক মহামিছিল শেষ হয় হুগলি বাবুগঞ্জ ঘোলঘাট মহাশ্মশানে। অগ্রভাগে প্রাণতোষ।

মাত্র নয় বছর বয়সে এই চুঁচুড়াতেই, কনিষ্ঠ সহোদরকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন প্রাণতোষ। সেই বালক-কাল থেকে এই দীর্ঘ-জীবন দুজনে পথ চলেছেন কখনও একসাথে কখনও-বা পৃথকভাবে। কারাগার, হাসপাতাল, আত্মগোপন। পুলিশি তল্লাসী তাঁদের স্থির থাকতে দেয়নি কোন সময়। তবু একাত্ম, গভীর অনুরাগ, হৃদয়ের মেলবন্ধন। ছিন্ন হয়ে গেল মৃত্যুতে, সেই যোগসূত্র।

প্রাণতোষ, তবুও, অচঞ্চল অটল। সূত্র তো ছিন্ন হয় না। প্রাণতোষ তাকিয়ে আছেন আরও-আরও অনেক পরিতোষ আসবে। আসবে দলে-দলে। ছিন্নসূত্র জুড়ে তারা আসবে দেশ-গঠনের কাজে, নিপীড়িত মানুষের উদ্ধার-কল্পে। সাম্য-সুন্দর হবে এই দেশ।

সেইদিকে তাকিয়ে আছেন এক সৌম্য-শান্ত মূর্তি—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় যাঁর নাম।

২২· কিছু স্মৃতি কিছু কথা

[প্রাণতোষ তাঁর ৮৪ বছরের দীর্ঘজীবনে বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। খ্যাত-অখ্যাত অসংখ্য জনের সমাগমে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়েছে। তাঁদেরই কিছু কথা কিছু স্মৃতি এখানে সংকলিত হল।]

১· সাহিত্যিক সমরেশ বসুর স্ত্রী শ্রীমতী গৌরী প্রাণতোষকে 'দাদা' সম্বোধন করতেন। সমরেশ বসুকে সাহিত্যিকরূপে গড়ে তোলার পিছনে গৌরী দেবীর প্রয়াস অসামান্য। গৌরী দেবী সু-গায়িকা ছিলেন এবং নানা ধরণের গান গাইতে পারতেন। 'কালকূট' হওয়ার পিছনে গৌরী দেবীর এই গান অনেকখানি উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছে। বয়সে ছোট হলেও, গৌরী দেবীর এই অনলস প্রয়াস, প্রাণতোষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

গৌরী দেবী একবার প্রাণতোষের শেওড়াফুলির বাড়িতে এসে দেখেন সেখানে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা নেই। তিনি বললেন, 'দাদা, যে মানুষ সারা জীবন আলোর সাধনা করেছেন তিনি অন্ধকারে থাকবেন এ কেমন করে হয়?' তিনি বাড়ি ফিরে তাঁর ছাত্র অলক মিত্রের হাতে দুশো টাকা পাঠিয়ে দিলেন। আলোর প্রাথমিক ব্যবস্থাদি হয়।

গৌরী দেবী মারা যাবার মাস-কয়েক আগে তাঁর নৈহাটীর বাড়িতে সস্ত্রীক প্রাণতোষ দেখা করতে গিয়েছিলেন। গৌরী দেবী তখন অসুস্থ। ওষুধের ক্রিয়া চলছিল। তিনি চেয়ারে বসেছিলেন মোহ্য-মানের মত দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তারপর যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। হাসিমুখে বললেন, 'দাদা, অনেকক্ষণ বসে আছেন তো? আমার এখন এরকমই চলছে। কিছু মনে করবেন না।' সেদিন এক আশ্চর্য মহিলাকে দেখেছিলেন প্রাণতোষ।

চলে আসার সময় গৌরী দেবী 'শাম্ব' বইটি নিজে স্বাক্ষর করে প্রাণতোষকে উপহার দিয়েছিলেন।

২· চুরুলিয়া নজরুল-আকাদেমির আমন্ত্রণে ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ সাল (২৮ মে ১৯৭৮) প্রাণতোষ উপস্থিত হয়েছেন আকাদেমি-ভবনে।

রেজাউল করিম-সাহেব ব্যবস্থাদিতে ব্যস্ত। ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরেছে প্রাণতোষকে ঃ অটোগ্রাফ চাই। তিনি অটোগ্রাফ দিচ্ছেন, দু'চার লাইন কবিতাও কারো কারো খাতায়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এসে গেলেন। নজরুল-মহাবিদ্যালয়ের শিলান্যাস করবেন। উভয়ের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় ও পরিচয় হয়।

৩. প্রাণতোষের স্ট্রোক হয়েছে মোট তিনবার। প্রথমবারের আক্রমণটা ছিল মারাত্মক। প্রাণতোষের মনে হত সেই-সময় তিনি যেন এক অনাস্বাদিতপূর্ব সুরলোকে ভেসে বেড়াচ্ছেন। সূক্ষ্ম আত্মা লোক হতে লোকান্তরে বিচরণ করছেন। এই মনোরম আস্বাদনের কথা, চেতন-মার্গে ফিরে আসার পরই, লিখে ফেললেন একটি কবিতা ঃ 'মৃত্যুর স্বাদ'।

৪ প্রাণতোষের জন্ম-তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। একবার গুণগ্রাহী আমরা সকলে মিলে ঠিক করলাম জন্মদিনের ঘরোয়া উৎসবটি একটু ধুম করে করতে হবে এবং তা হবে আন্তরিক। সেই-রকম ব্যবস্থা হল। নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন—সিরাজুল হক-সাহেব সাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্ত, গবেষক বাঁধন সেনগুপ্ত, কমিউনিস্ট-নেতা পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরশিল্পী সলিলচন্দ্র ঘোষ, সুহৃদোত্তমা লাবণ্যপ্রভা সরকার, বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। মিলন-সভার স্থান নির্দিষ্ট হল স্থানীয় সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের প্রশস্ত হল-ঘরে আর আহারাদি—'সুষমালয়ে'। প্রাণতোষ সহধর্মিণী সুষমা দেবী একাধারে আপ্যায়নে ও রন্ধনে ব্যস্ত। ছোট ঘরটি ধুতি বই পুষ্পস্তবক প্রভৃতি শ্রদ্ধার্ঘ সামগ্রীতে পূর্ণ। আনন্দের এই দুধ-সাগরে হঠাৎ একটি গো-চনা। বাঁধন সেনগুপ্ত রহস্য করেই বলে উঠলেন, 'প্রাণতোষদা ব্যবসাটা ভালই ফেঁদেছেন।' এই অশোভন তিক্ত রহস্য তাঁর অন্তরে শেলের মত বিদ্ধ হয়।

অতঃপর প্রাণতোষ তাঁর বাড়িতে জন্মতিথি পালনে সম্মতি দেননি।

৫. একবার কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি ঈশ্বর মানেন কি?'

উনি জবাবে বললেন, 'দুর্বলতা নেই।'

'আপনার উপলব্ধিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি?'

উনি বললেন, 'মাঝে মাঝে একটা অদৃশ্য সুতোর টান অনুভব করি। তবে দুর্বলতা নেই। তোমাদেরও দুর্বল হতে বলি না। আমি চাই তোমরা স্বনির্ভর হও। কাজীদার কবিতার সেই লাইনটা মনে রেখো: 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।' বাবা, নিজেকে চিনতে শেখ। নিজের শক্তির ওপর আস্থা রাখ।'

৬. একদিন সন্ধ্যাবেলা চন্দননগর থেকে কবি অরুণকুমার চক্রবর্তী এলেন প্রাণতোষের সঙ্গে আলাপ করতে। গুণীব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করাই তাঁর এক-রকম সখ। মুজফ্ফর আহমদ-সাহেব নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি সাহিত্যিক-সুহৃদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে এবং ছবি তুলেছেন। তিনি ছবিগুলো দেখালেন। প্রাণতোষেরও একখানি ছবি তুললেন ফ্ল্যাস-ক্যামেরায়। অরুণ প্রণাম করে চলে যাবার উদ্যোগ নিলেন। প্রাণতোষ বললেন, 'আবার এসো। আমার এই দোতলার ঘরটি সকলের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। যখন খুশি আসতে পারো।'

৭ একবার কাজী নজরুল চিত্রশিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায় (ভি. সি.) আর প্রাণতোষ চলেছেন কলেজ স্ট্রীট ধরে এলবার্ট হল-এর দিকে। পড়ন্ত বিকেল। রাস্তার ধারে একটি শিশুকে কোলে নিয়ে এক দঃখিনী মা দাঁড়িয়েছিলেন ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে। মাথায় ঘোমটা সলজ্জ চাহনি। পথের 'পরে নিবন্ধ মুখ ফুটে ভিক্ষা চাইতে পারছেন না। নজরুলের পাশে-পাশে চলেছেন আর-এক চিকন-কালো বাঙালি-সাহেব। হ্যাট-কোট পরা। সে হঠাৎ ভিখারিণীর উদ্দেশ্যে বলে, 'যত্ত সব। পেটে ভাত জোটে না, ছেলে হওয়ার সখ ষোল আনা।' কাজীর কানে যায় কথাটা। তিনি দ্রুতপায়ে গিয়ে লোকটির কোটের কলার চেপে ধরে বললেন, 'শালা তুই যে ওই শিশুর বাপ নয় তাই-বা কে জানে। বার কর্ পকেটে যা আছে' কাজীর রুদ্রমূর্তি দেখে লোকটি পকেটে যা ছিল সব দিয়ে দেয় আর কাজী সেই অর্থ সমর্পণ

করেন ভিখারিণী মায়ের হাতে।

ভি. সি. নীরবে এসব দেখলেন। পরে তিনি 'শিশু-ক্রোড়ে দুঃখিনী মা'-র একটি তৈলচিত্র অংকন করেন। চিত্রটি তখনকার বাজারে পনেরো হাজার টাকায় বিক্রি হয়। ভি. সি. সব টাকা দিয়ে আসেন ওই দুঃখিনীকে। সেই টাকায় বরানগরে একটি বাড়ি তৈরী হয়। দুঃখিনী আশ্রয় পায়।

৮. এই ভি. সি.-র একটি আলোকচিত্র রাখার বড় ইচ্ছা হয় প্রাণতোষের। মহাত্মা গান্ধী রোডে ভি. সি.-র কাছে পাঠালেন স্ত্রী সুষমা দেবীকে। সঙ্গে দমদমের স্নেহভাজন সুজিত ভট্টাচার্য। প্রচার-বিমুখ ভি. সি. ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে রাজী হলেন না। অনেক পীড়াপীড়ি করে, একরকম জোর করে, ফটো তোলা হল। তিনটি শট নেওয়া হল! ফিল্ম ওয়াস করার পর, আশ্চর্য, দেখা গেল তিনটি ছবিতে উঠেছে বিচ্ছিন্নভাবে ভি. সি.-র শরীরের তিনটি অংশ। একটিতে শুধু চিবুক একটিতে কপাল আর অন্যটিতে যে রুমাল পেতে তিনি বসেছিলেন সেই রুমালটি! ভি. সি.-র এই অলৌকিক ইচ্ছাশক্তির কথা প্রাণতোষ প্রায়ই স্মরণ করেন।

৯. প্রাণতোষ তখন চুঁচুড়ায়। বিপ্লবী দলেই আছেন। একদিন কি-কারণে মন বড় বিষন্ন। গঙ্গার ধার ঘেঁসে হেঁটে চলেছেন একাকী। সন্ধ্যাবেলা। এক বাড়ির ভিতর থেকে রেওয়াজি-গলায় ভেসে এল রবিঠাকুরের গান ঃ 'অশান্তি যে আঘাত করে তাইতো বীণা বাজে।'—গানটা বারংবার অনুরণিত হতে থাকে প্রাণতোষের মনে। বিষন্নতা কেটে যায়। অশান্তি দূর হয়। নতুন উদ্যম পান তিনি।

১০. সেবার মিনার্ভা থিয়েটারে নাটক দেখতে গেছেন প্রাণতোষ। 'কল্লোল'। প্রাণতোষ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে টিকিট কাটতে যাচ্ছেন এমন সময় পি. এল. টি.-র কর্ণধার, প্রযোজক ও পরিবেশক উৎপল দত্ত তাঁকে দেখতে পান। টিকিট কাটতে না-দিয়ে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন ব্যালকনিতে। নাটক-শেষে আবার এলেন উৎপলবাবু। প্রাণতোষকে দিয়ে 'কল্লোল' সম্পর্কে মতামত লিখিয়ে নিলেন।

প্রতিবেশী স্নেহভাজন নাট্যামোদী যুবক হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় (হারু)-কে একবার পাঠিয়েছিলেন উৎপলবাবুর কাছে। উৎপলবাবুরা তখন নাটকের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মঞ্চে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও চিঠি-খানি তিনি পড়লেন এবং বললেন, 'আরে তুমি লিট্‌ল কমরেডের কাছ থেকে আসছো। বেশ বেশ—'

১১. ১৯২২ সাল। হুগলি বিদ্যামন্দিরে আছেন নজরুল। বিদ্যামন্দিরের হলঘরে আহূত সাহিত্য-সভায় প্রাণতোষ আবৃত্তি করলেন—'বিদ্রোহী'। তাঁর পৌরুষদীপ্ত-কণ্ঠে আগুন-ছড়ানো ওই আবৃত্তি শুনে নজরুল আসন ছেড়ে উঠে এসে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। বললেন, 'এ কী আবৃত্তি করলি রে তুই! আমার গায়ে শিহরণ বয়ে যাচ্ছে।'

১২. কাজী একবার প্রাণতোষকে নিয়ে গেলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির কাছে। প্রাণতোষ নাট্যাচার্যকে আবৃত্তি করে শোনান 'বিদ্রোহী' ও 'ঝড়'। ওই দুটি কবিতাই পাল্টা আবৃত্তি করলেন শিশিরকুমার। প্রাণতোষ শুধরে নিলেন তাঁর ভুলত্রুটি। —শিশিরকুমারের বদনাম ছিল দাম্ভিক বলে, প্রাণতোষ তার পরিবর্তে পেলেন এক সহৃদয় আন্তরিক মানুষের পরিচয়।

১৩. ১৯৮০ সাল। আমি তখন 'বাংলা কাব্যে লেলিন' নামে একটি বই লিখছিলাম। প্রাণতোষদাকে একটা কবিতা লেখার কথা বললাম। সামান্য ইতস্ততঃ করার পর যে কবিতাটি তিনি লিখলেন তার কয়েকটি ছত্র এই রকম: 'সমাজের চালচিত্রে তোমার চিত্র/উজ্জ্বল রঙে জ্বলজ্বল করে দেখি/কাজ ছাড়া শুধু প্রচারেতে/বড় বড় কথার ফুলঝুরির আলো/ক্ষণপ্রভায় মনেরে চমকায়/চলে মিছিল, উচ্চকণ্ঠে শ্লোগানের/হুল্লোড় হুল্লোহুলির মধ্যে/উচ্চবিত্তের আদর্শবাদের বিলাসিতায়/তোমাকে ঢেকেছে বিভ্রান্তির মেঘে মেঘে,/তুমি সেখানেও আছ বিপ্লবী লেনিন।'

১৪ 'কাজী নজরুল' (প্রথম সংস্করণ) বইটি উপহার দিতে গেছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে। রাজনৈতিক সূত্রে পরিচয় ছিল

আগে থেকেই। প্রাণতোষ বললেন, 'আপনি বলেছেন নজরুলের সিফিলিস হয়েছে। আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত নই। আমার মতে, যৌগিক ক্রিয়ায় ভুল হওয়ায় তাঁর এমনটা হয়েছিল। কাজেই তাঁকে সুস্থ করতে হলে ডাক্তারি মতের পাশাপাশি যৌগিক বিধিপদ্ধতিও প্রয়োগ করতে হবে।'

ডাঃ রায় বিশ্ববিখ্যাত এবং স্পষ্টবক্তা। কিন্তু সকলের সঙ্গেই কথা বলতেন অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে। হেসে বললেন, 'তোর সাহস তো কম নয়। আমার মুখের উপর কথা কোস্!'

এই সাহসিকতার জন্য ডাঃ রায় প্রাণতোষকে খুব ভালবাসতেন। বললেন, 'হ্যাঁরে স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা সকলে সাহায্যের আবেদনপত্রে সই করেছেন। তুই করিসনি কেন?'

প্রাণতোষ চুপ করে রইলেন। কেননা তখনও তিনি মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি।

১৫. আর-একবার।

প্রাণতোষের অনুরোধে ডাঃ রায় রেডিয়েন্ট প্রসেস কোম্পানীকে বিদেশ থেকে সামগ্রী আমদানী করার ব্যাপারে শুল্ক সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। অনুমতি দেওয়ার পর ডাঃ রায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হ্যারে এতে তোর নিজের কি ইন্টারেস্ট?'

প্রাণতোষ বলেছিলেন, 'আমার ফার্মের ২৫০ জন কর্মীর কল্যাণ হলে মালিক নিশ্চয়ই আমার কথাও চিন্তা করবেন।'

ডাঃ রায় মুচকি হেসে: 'মালিক কখনও কর্মীদের ভাল করে না রে।'

১৬. ইলিশিয়াম রো-তে ১৩ ও ১৪ নম্বর বাড়ি দুটি ছিল পাশাপাশি। এক বাড়ি থেকে আর-এক বাড়িতে যাতায়াত করা যেত। ১৪ নং বাড়িটা ছিল গোয়েন্দা-দপ্তরের স্পেশাল ব্রাঞ্চের। ওই অফিসে পুলিশ-কমিশনার টেগার্ট-এর পরেই, দুঁদে অফিসার ছিলেন - নলিনী মজুমদার। তাঁর দাপট ছিল অসীম, ব্যবহার ছিল ভয়াবহ।

প্রাণতোষকে এই বাড়িতে আনা হলে, নলিনী মজুমদার তাঁর

অনমনীয় মনোভাব দেখে তীব্র ব্যঙ্গে বলেছিলেন, 'দেখ্ তোদের এত সাধের বিপ্লবী পার্টি, বুকের রক্ত দিয়ে তোদের শপথ গ্রহণ করতে হয়। জানিস, সেখানে দশজনের মধ্যে আটজন আমার লোক !'

প্রাণতোষ ঘৃণায় কোনো উত্তর দেননি। পরে নলিনী মজুমদারকে নিয়ে তাঁরা গান বেঁধেছিলেন ঃ

(তোরে) নলিনী নেয় না কেন যম
(এই) এত লোকের গোরু মরে
(শালা) তোর বেলাতেই ভ্রম।

১৭. একবার এক উপন্যাসের তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে সাহিত্যিক সমরেশ বসু চলেছেন গুপ্তিপাড়ায়। সঙ্গে আছেন প্রাণতোষ, উদ্দেশ্য ভানুমতির (ভোজরাজ-কন্যা) বাপের বাড়ি সন্ধান করা। পথে যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই সমরেশ জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা ভানুমতির বাপের বাড়িটা কোন্‌খানে বলতে পারেন ?' কেউ বলতে পারে না। চলতে চলতে মাঠের ওপর দিয়ে আলের পথ ধরলেন দুজনে। অপর দিক থেকে এক দরিদ্র বৃদ্ধ আসছিলেন। প্রাণতোষ এবার তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, 'বাবা, ঠিক বলতে পারিনে। তবে একটা খুব পুরানো বাড়ি আছে বটে। লোকে বলে ওটাই নাকি ভানুমতির বাপের বাড়ি। চলুন, আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বাড়িটা দেখে সমরেশ ভদ্রলোককে দশটাকা দিলেন তাঁর নাতি-নাতনিদের মিষ্টি খেতে।

১৮. নজরুল-পুত্র কাজী সব্যসাচী একবার প্রাণতোষের কুশল-সংবাদ নিতে এলেন। নানা খবরাখবর আদান-প্রদানের পর আবৃত্তি-সম্পর্কিত কথাবার্তায় প্রাণতোষ বললেন, 'সানি, তোমার আবৃত্তির গলাটি খুব ভাল। তবে কি জানো, তুমি যখন 'বিদ্রোহী' আবৃত্তি করো তখন মনে হয় যেন প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করছো।'

সব্যসাচী হেসে বললেন, 'কাকাবাবু, আমি গলা বেচে খাই।'

১৯. শেওড়াফুলির 'উদয়ন' সিনেমা-হলে 'মৃগয়া' দেখতে

গেছেন প্রাণতোষ। তাঁর ফরিদপুরের বিপ্লবী-বন্ধু দীনেশ সেনের ছেলে মৃণাল সেন এ-ছবির পরিচালক। ছবি দেখতে দেখতে প্রাণতোষ মোহিত হয়ে গেলেন। গ্রামীণ জমিদারের অত্যাচার ও প্রজার বিদ্রোহ—শোষণ-মুক্তির সংগ্রাম,—ছবিটি অনবদ্য। বিপ্লবী পিতার চলচ্চিত্র-পরিচালক পুত্রের এই বৈপ্লবিক উত্তরণে প্রাণতোষ আনন্দ পেলেন।

প্রাণতোষ একদিন বাড়িতে, হঠাৎ শ্যামবর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত একটি যুবক এসে বললেন, 'চিনতে পারেন?'

প্রাণতোষ চিনতে না পেরে তাকিয়েই রইলেন।

'আমি দীনেশ সেনের ছেলে।'

'ওঃ তুমি মৃণাল!' প্রাণতোষ বুকে জড়িয়ে ধরলেন একালের বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক মৃণাল সেন-কে।

২০ সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। বহু গল্প-উপন্যাস লিখে বাংলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তিনি। আশুতোষবাবু তখন কিশোর। বাবা পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় স্কুল-ইনস্পেক্টরের বদলী চাকরি নিয়ে চুঁচুড়ায় এলেন। এখানে তিনি সন্ধান পেলেন প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর আড্ডাস্থল 'পারিপিচুয়াল ক্লাব'। এখানে আসা-যাওয়া শুরু করলেন আশুতোষ।

একদিন আশুতোষ বললেন, 'প্রাণতোষদা, আমার বড্ড মাথার যন্ত্রণা হয়। কি করি বলুন তো?'

প্রাণতোষ রহস্য করে বললেন, 'হয় লেখ, না-হয় বিয়ে কর।'

প্রথম পরামর্শটি মাথায় ঢুকল আশুতোষের। সেই প্রেরণাতেই শুরু হল সাহিত্য-সাধনা। একথা আশুতোষবাবু বলেছেন, 'আকাশ-বাণী কলকাতা'র এক সাক্ষাৎকারে।

বিশিষ্ট কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিক 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকায় আশুবাবুর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের এক জায়গায় তিনি লেখেন ঃ

'সাহিত্যে আসার জন্য প্রথম উৎসাহ পান আশুদা, চুঁচুড়ার নজরুলভক্ত প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।'—কলেজ স্ট্রীট, নভেম্বর ১৯৮২, কার্তিক ১৩৮৯। পৃষ্ঠা ১৭।

চিঠিপত্র

(প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ হ'তে)

মুজফ্‌ফর আহমদের চিঠি

২২শে জুলাই
১৯৬৪

১.

61 KARAYA ROAD
Calcutta-19
Telephone-44-7205

প্রিয় প্রাণতোষ,

তোমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটউটে সেদিন আমার কথা হয়েছিল। তুমি বলেছিলে বেঙ্গলী রেজিমেন্টের জমাদার শম্ভু রায় তোমার সঙ্গে দেখা করে তোমাকে লিখিতভাবে একটা খবর দিয়েছিলেন। অক্টোবর-বিপ্লবের খবর সেনানিবাসে পেঁছানোর পরে নজরুল খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিল এবং বন্ধুদের খাইয়েছিল এটাই যে খবর তুমি তা আমাকে বলেছিসে। জমাদার শম্ভুরায় নিজ হাতে তোমায় যা লিখে পাঠিয়েছিলেন তার একটা প্রতিলিপি তুমি খুব শীঘ্র যদি আমায় পাঠিয়ে দাও তবে আমি সুখী হব। তিনি হয়তো তোমায় মৌখিক অনেক কথাই বলে থাকবেন। সে সব কথাই তুমি আমায় লিখিতভাবে জানাবে এতবেশী কষ্ট আমি তোমায় দিতে চাইনে।

শম্ভু রায়ের পরিবারের লোকেরা কি এখনও হুগলিতে আছেন? তাদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে যদি তুমি আমায় জানাও যে চাকরি হতে অবসর নেওয়ার সময়ে তিনি কি হয়েছিলেন তবে বড় ভালো হয়। তিনি যে সব-ডেপুটি কালেকটর হয়ে চাকরিতে ঢুকেছিলেন সেটা আমি জানি।

আশা করি তুমি ভালো আছ। তুমি আমার ভালোবাসা নাও।

তোমার
মুজফ্‌ফর আহমদ
২২শে জুলাই ১৯৬৪

[সূত্র ঃ] বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের জমাদার শম্ভু রায় □

করাচীর গ্যাজা লাইনে-৪৯ নং বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের জমাদার ডিসিপ্লিন-ইন-চার্জ। এই রেজিমেণ্টে নজরুল যোগ দেবার পর থেকে রেজিমেণ্ট উঠে যাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময় শম্ভু রায়ের সঙ্গে নজরুলের বন্ধুত্ব ছিল। অতএব নজরুলের পল্টন-জীবনের অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য শম্ভু রায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন নজরুল-জীবনী-কার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত বলে রাখা যাক ডিসিপ্লিন-ইন-চার্জ হিসেবে সৈনিকদের ওপর শম্ভু রায়ের দাপট ছিল প্রচণ্ড। নজরুল রেজিমেণ্টে ছিলেন কোয়ার্টার-মাস্টার হাবিলদার হিসেবে। তাঁর কাজ ছিল সৈনিকদের পোশাক সরবরাহ করা।

শম্ভু রায় নিজ হাতে তোমায় যা লিখে পাঠিয়েছিলেন □

৪৯ নং বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে শম্ভু রায় নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন নজরুল-জীবনীকার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় নির্ভরযোগ্য তথ্যের সন্ধানে যোগাযোগ করেছিলেন। তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে শম্ভু রায় বেশ কয়েকটি পত্র প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে প্রেরণ করেন। চিঠি-গুলির তারিখ যথাক্রমে ২৪-৬-৫৭, ২৭-৬ ৫৭, ২৯-৬-৫৭, ৩০-৮-৫৭, ৯-১০-৫৭। চিঠিগুলি লেখা হয়েছে বাবুগঞ্জ-হুগলি থেকে। আগ্রহী পাঠক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজী নজরুল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (৩য় সংস্করণ, এ মুখার্জী) পরিশিষ্টে মুদ্রিত শম্ভু রায়ের এই চিঠিগুলির সন্ধান পাবেন (পৃষ্ঠা ২৮৯—২৯৮)।

শম্ভু রায়ের পরিবারের লোকেরা কি এখনও হুগলিতে আছেন □

১৯৫৭-তে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা শম্ভু রায়ের চিঠিগুলি থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা তখন হুগলি বাবুগঞ্জ অঞ্চলে বাস করতেন। ১৯৭৩-এ প্রকাশিত 'কাজী নজরুল' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণেও প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে বর্তমানে তাঁর পুত্রেরা চন্দননগরে হাটখোলা দয়েরধারে বাস করেন। শম্ভু রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম অরবিন্দ রায়।

চাকরি হতে অবসর নেওয়ার সময়ে তিনি কি হয়েছিলেন □

১৯২০-তে ৪৯ নং বেঙ্গলী রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে শম্ভু রায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পান। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ-অনুসারে শম্ভু রায় ট্রেজারি অফিসার হয়ে ১৯৫২-তে অবসর গ্রহণ করেন।

২২শে সেপ্টেম্বর
১৯৬৪

২.

61 KARAYA ROAD
Calcutta-19
Telephone-44-7205

প্রাণতোষ,

কাল তোমার চলে যাওয়ার পরে আমার মনে পড়ল। ভূপতিবাবু ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে Regulation III of 1818 অনুসারে রাজবন্দী হয়েছিলেন। ১৯২৭-২৮ সালের আগে তিনি কি ছাড়া পেয়েছিলেন? ১৯২৪ সালে তিনি নজরুলকে কি করে হুগলি নিয়ে গেলেন? তুমি ভালোভাবে খবর নিয়ে আমাকে জানাবে। কমরেড বিজয় মোদকের কাছ হতেও তুমি খবর নিতে পার।

তোমার
মুজফ্ফর আহমদ

[সূত্র :] ভূপতিবাবু □

ভূপতি মজুমদার (১. ১. ১৮৯০—২৭. ৩. ১৯৭৩)। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী। জাতীয় কংগ্রেস, যুগান্তর দল ও স্বরাজ্য পার্টির নেতৃবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯০৬-তে কারারুদ্ধ হন। আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ-স্থাপনের জন্য ১৯১১-তে তাঁকে আমেরিকা পাঠানো হয়। কিন্তু আর্থিক সংকটের জন্য তাঁকে ফিরে আসতে হয়। পরে সিঙাপুরের পথে আমেরিকা যান ও ফেরবার পথে ১৯১৫ তে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপের কাছে

গ্রেপ্তার হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-দখলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকেন। ভারত-ছাড়ো আন্দোলন-কালেও তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। বিভক্ত স্বাধীন বাংলায় প্রথমে ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের ও পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। এরপর দু'বার নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ১৯৫৭-তে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। [সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান থেকে সংগৃহীত]

Regulation III of 1818 ☐

সম্ভবত অসাবধানতা-বশত ১৮১৮ লেখা হয়েছে। সালটি হবে ১৯১৮। ভূপতি মজুমদার ১৯১৮-র তিন নম্বর রেগুলেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী রাজবন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু এই ভ্রান্তিটি শুধু শ্রীআহমদের চিঠিতেই নয়, শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থেও রয়েছে। 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা' গ্রন্থের ১৯৮৫ সংস্করণ ১৮৩ পৃষ্ঠায় শ্রীআহমদ সঠিক সালটি নির্দেশ করেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দমনের উদ্দেশ্যে তিন নম্বর রেগুলেশন আইন (১৯১৮)-টি প্রণয়ন করেছিলেন।

১৯২৪ সালে তিনি নজরুলকে কি করে হুগলি নিয়ে গেলেন ☐

১৯২৪ থেকে ১৯২৬-এর ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত নজরুল ছিলেন হুগলিতে। অনেকের মতে, এমনকি প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজী নজরুল'-এর প্রথম সংস্করণেও এরকম বলা হয়েছে যে, ভূপতি মজুমদারই নজরুলকে হুগলিতে নিয়ে আসেন। এই মত তথ্যের ভিত্তিতেই খণ্ডন করেছেন মুজফ্‌ফর আহমদ—

"১৯২৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীমজুমদার ১৯১৮ সালের তিন নভেম্বর রেগুলেশন অনুসারে গিরেফ্‌তার হয়ে রাজবন্দী (স্টেট্ প্রিজনার) হয়েছিলেন, আর ছাড়া পেয়েছিলেন ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে। 'ধূমকেতু' কাগজ বা'র করার পরে শ্রীভূপতি মজুমদারের মারফতে হুগলির কয়েকজন যুবকের সহিত নজরুলের পরিচয় হয়েছিল। হুগলির এই যুবকদের উপলক্ষ করেই নজরুল

সেখানে বাসা বাঁধতে গিয়েছিল। জেল হতে ফিরে আসার পরে এই রকম খবরই আমি পেয়েছিলাম এবং এটাই সঠিক খবর।''

[কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা। ১৯৮৫ সং। পৃষ্ঠা ১৮৩]

কিন্তু নজরুল-জীবনীকার এবং মুজফ্‌ফর আহমদের উদ্ধৃত পত্রের প্রাপক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা কিছুটা অন্যরকম। গান্ধীজীর জাতীয় শিক্ষা তথা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উত্তেজনা হুগলিতে পৌঁছলো ১৯২১-এ। হুগলি জেলা-কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হল ১৯২১-এর এপ্রিলে এবং তারই অধীনে জাতীয় বিদ্যালয়ের আদর্শে হুগলিতে তৈরী হল বিদ্যামন্দির। হুগলি জেলার অন্যতম বিশিষ্ট বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার ১৯২১-এই নজরুলকে হুগলিতে এনেছিলেন বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থের সাম্প্রতিক সংস্করণে বলা হচ্ছে ঃ

''কবি নজরুল প্রথমবার হুগলিতে আসবার পর কলকাতা থাকার সময় থেকেই শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। 'ধূমকেতু' বার হবার পরই তাঁর ইচ্ছা হতে লাগল যে, কবি নজরুলকে হুগলিতে নিয়ে গেলে হুগলি জেলার আন্দোলনের কাজে বিশেষ সাহায্য হবে।''

[কাজী নজরুল, ১ম খণ্ড ২য় সং। পৃষ্টা ৬৮]

অর্থাৎ ১৯২৩-এ ভূপতি মজুমদার বন্দী হলেও মূলত হুগলির ছাত্র ও তরুণেরা নজরুলকে হুগলিতে নিয়ে এসে ভূপতি মজুমদারের ইচ্ছাকেই রূপায়িত করেছিলেন। যে তরুণেরা নজরুলকে হুগলিতে নিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন অন্যতম একজন। ফলে নজরুলকে হুগলিতে আনার পিছনে কার ইচ্ছা ও কোন্ অভিপ্রায় কাজ করেছিল তা তাঁর পক্ষেই ভালোভাবে জানার কথা। অপর পক্ষে মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন যে, জেল থেকে ফিরে তিনি এ বিষয়ে খবর পেয়েছিলেন। অতএব প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মতই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা সঙ্গত।

Superintendent ৩. দমদম সেনট্রাল জেল
DUM DUM CENTRAL JAIL কলকাতা-১৮
CENSORED AND PASSED ২৯শে জানুয়ারী
For DIGIBCIDW Bengal ১৯৬৫

প্রিয় প্রাণতোষ,

তোমায় বোধ হয় আমি বলেছিলাম যে তোমার বইখানা (কাজী নজরুল) শ্রীসুধাংশু সরকার আমার কাছ থেকে নিয়ে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে দিয়েছিলেন। তিনি "জ্যৈষ্ঠের ঝড়" নাম দিয়ে নজরুলের একখানা জীবনী লিখেছেন।

শ্রীসরকারকে অনেক লিখে লিখে এতদিন পরে এখানে বইখানা আমার হাতে এসেছে। আজই তা সেন্সর হয়ে এসেছে। আর আজই আমি তোমায় পত্র লিখতে বসেছি। অবশ্য আমি পত্রখানা জেল অফিসে দেব ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে।

তুমি লিখেছ কৃষ্ণনগরে যে (কংগ্রেসের) প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল (১৯২৬) তার সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আর বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন ছাত্র ও যুব সম্মেলনের সভাপতি। কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনের সভাপতি ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু অনেক আগে ফেব্রুয়ারী মাসে তোমার লেখা হতে মনে হয় যে এক সঙ্গেই তিনটি সম্মেলন হয়েছিল। সম্মেলনে যাওয়ার সময়ে তুমি নৈহাটি স্টেশনে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলে। আর সবই তো আমার পরিষ্কার মনে আছে তবুও তোমার লেখা হতে আমার মনে একটা ধোঁকার সৃষ্টি হয়েছে। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তই কি কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন? আমার মনে পড়ছে যে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলই ছিলেন নির্বাচিত সভাপতি। অভিভাষণে তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সমালোচনা করেছিলেন। তাতে একটা গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং শ্রীশাসমল সম্মেলন ছেড়ে চলে যান। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আবহাওয়ায় কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল। সেই আবহাওয়ার ভিতর দিয়েই কংগ্রেস কর্মী-সংঘ

সম্মেলনকে কব্জা করে নেন। এই ঝগড়ার ফলে বাঙলায় প্রাদেশিক কংগ্রেস দু'টি হয়ে যায়। একটির সেক্রেটারী হন শ্রীশাসমল এবং অন্যটির ডাক্তার জে. এম. দাশগুপ্ত। অনেক দিন পরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে মাওলানা আকরম্ খানের সভাপতিত্বে একটি ঐক্য সভা হয় তাতে দুটি কংগ্রেস আবার এক হয়ে যায়।

এসব তো হলো পরের ঘটনা। আসল কথা হচ্ছে কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি কে ছিলেন? এটা জানা দরকার। কার কাছ থেকেই-বা জানা যাবে? সব লোক তো একে একে মরে গেলেন। তুমি শ্রীভূপতি মজুমদারের সঙ্গে একবার টেলিফোনে কথা বলে নাও। যদিও তিনি তখনও বন্দী ছিলেন তবুও ঘটনাটা তাঁর মনে থাকা সম্ভব।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তার পরের বছর কিম্বা পরের বছরের পরের বছর বসিরহাট প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এত ঘন ঘন কি কেউ সভাপতি নির্বাচিত হন? তুমি আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিয়েছ। এখন তোমারই কাজ এই সন্দেহের নিরসন করা। মুশকিল হচ্ছে এই যে তুমি চলাফেরা করতে পারনা। ভূপতিবাবু যদি তোমায় তথ্যটা না দিতে পারেন তবে আর কে যে দিতে পারেন তা জানিনে। সরস্বতী প্রেসের শ্রীশৈলেন গুহরায়ও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তোমার সঙ্গে যদি পরিচয় না থাকে তবে আর কাউকে দিয়ে মাখন সেনকেও একবার টেলিফোন করে দেখতে পার। তিনিও সম্মেলনে ছিলেন। সব চেয়ে সঠিক ব্যবস্থা হত কেউ যদি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ১৯২৬ সালের এপ্রিল-মে মাসের "অমৃত বাজার পত্রিকা" পড়ে দেখতে পারতেন। কিন্তু তোমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

যাই হোক, তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে আমায় তা জানাবেই। না পেরেলেও জানাবে।

আমার বইটি ধীরে ধীরে ছাপা হচ্ছে। ১১২ পৃষ্ঠা (সাতফর্মা) পর্যন্ত ছাপা হয়ে গেছে। তুমি এই ফর্মাগুলি পড়ে দেখতে পার। গণপতি প্রিন্টার্স কিম্বা ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর অফিস-এ দু জায়গার

যে কোনো জায়গায় গেলেই তুমি ফর্মাগুলি পড়তে পাবে।

তোমার শরীর এখন কেমন আছে? আমার ভালবাসা নাও।

শুভার্থী—

মুজফ্‌ফর আহমদ

(ডি, আই, আর, ডেটেনিউ)

[সূত্র ঃ ৩] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত নজরুল-জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়'। ১৩৭৬-এ প্রকাশিত। প্রকাশক শঙ্খ প্রকাশন।

১৯২৬-এর ৬ই—৭ই ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নিখিল বঙ্গীয় প্রজা-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন। ১৯২৬-এর মে মাস পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে অনেকগুলি সম্মেলন হয়। নিখিল বঙ্গীয় প্রজা-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কৃষ্ণনগরের সভ্যগণ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনও কৃষ্ণনগরে করার ব্যবস্থা করেন। এ সম্পর্কে 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা'-তে মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন 'কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল ১৯২৬ সালের ২২শে ও ২৩শে মে তারিখে।' [পৃঃ ১৯২ / ১৯৮৫ সংস্করণ] এই মে মাসেই কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ছাত্র-সম্মেলন এবং যুব-সম্মেলনও।

কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি কে ছিলেন ☐

শ্রীআহমদের সন্দেহ যথার্থ। তিনি লিখেছেন 'আমার মনে পড়ছে যে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলই ছিলেন নির্বাচিত সভাপতি।' শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর নজরুল-জীবনী গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নাম উল্লেখ করে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে নিজেই সংশোধন করেছেন। 'কাজী নজরুল'-এর সাম্প্রতিক সংস্করণের ১০১ পৃষ্ঠায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'প্রাদেশিক সভার সভাপতি হলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল।'

'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা'। নজরুল-বিষয়ে

মুজফ্ফর আহমদের স্মৃতিকথা প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকায়। 'বিংশ শতাব্দী প্রকাশন।' ১৯৫৯-এ 'কাজী নজরুল ইসলাম; স্মৃতিকথা' নামে ১৬৬ পৃষ্ঠার বইটি প্রকাশ করেন। ১৯৬৩-তে মুজফ্ফর আহমদ স্থির করেন বইটি আবার নতুন করে লিখবেন। এইভাবে ধীরে ধীরে বইটি লেখা ও ছাপার কাজ শুরু হল।

'স্মৃতিকথা'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'যখন ১৯৬৪ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে আমি জেলে এলাম তখন পুস্তকখানার ৪৮ পৃষ্ঠা মাত্র ছাপা হয়েছে এবং আরও ৪৮ পৃষ্ঠা ছাপা হওয়ার মতো পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আছে।' বর্তমান চিঠিটি দমদম সেনট্রাল জেল থেকে লেখা হয়েছে ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৬৫। তখন পর্যন্ত ছাপা হয়েছে ১১২ পৃষ্ঠা (সাত ফর্মা) মাত্র। বইটি সম্পূর্ণ হয়ে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-তে। যদিও গ্রন্থকার ভূমিকাটি লিখেছেন ২৬শে জুলাই, ১৯৬৫।

ডি. আই. আর. ডেটোনিউ □

ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া রুলস্। ডেটোনিউ—বিচারাধীন বন্দী।

Sd/-
SUPERINTENDENT
DUM DUM CENTRAL JAIL
Censored and Passed
Sd/-
For DIGIECIDW, Bengal

৪.

দমদম সেনট্রাল জেল
কলকাতা-২৮
১৯-২-১৯৬৫

প্রিয় প্রাণতোষ,

তোমার ১২ই তারিখের পত্র কাল রাত্রে পেয়েছি। তোমার রক্তের চাপটা বেড়েছে জানতে পেয়ে চিন্তিত হয়েছি। আশা করি, সাবধানে থাকছ। প্রাদেশিক সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। শাসমল নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন তাও জানি। তবুও তোমার বই পড়ে

ধোঁকা লেগেছিল। তোমাকে পত্র লেখার পরেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলাম। শুধু ছাত্র-যুব সম্মেলনে আমি যাইনি বলে তার প্রেসিডেন্ট কে হয়েছিলেন তা মনে ছিল না। এখন জেনেছি যে সরোজিনী নাইডু প্রেসিডেন্ট ছিলেন। টাউন হলে যে মিটিং তুমি দেখেছিলে সেটা বোধ হয় B. P. C. C.-র মিটিং ছিল, ছাত্রযুব'র নয়। ছাত্র-যুব সম্মেলন মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে হয়ে থাকবে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন কণ্টই দিলে তখন তাঁর কাছ থেকে তারিখটাও জেনে নিলে হতো। বরাবর ইষ্টারের ছুটিতে এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছে। সেবারে কেন মে মাসে হতে গেল? এটাও একটা খটকা।

যাক। তুমি কোন চিন্তা ক'রোনা। অন্য সূত্র থেকে আমি সব জেনে নেব। আমি তো কংগ্রেসের কোনো ইতিহাস লিখছিনে। নজরুল ইসলামের সংস্রবে আমার কয়েকটি সঠিক তথ্য মাত্র জানা প্রয়োজন।

আমার ভালোবাসা নাও।

শুভার্থী—

মুজফ্‌ফর আহমদ

[সূত্র ঃ ৪] কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। ঐ একই সময়ে কৃষ্ণনগরে আরো দুটি সম্মেলন হয়েছিল,—ছাত্র-সম্মেলন ও যুব-সম্মেলন। মুজফ্‌ফর আহমদ সরোজিনী নাইডুকে ছাত্র-যুব সম্মেলনের সভানেত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর গ্রন্থে একই কথা বলেছেন। কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার ছাত্র ও যুব সম্মেলন দুটি পৃথক সম্মেলন। সরোজিনী নাইডু ছিলেন ছাত্র-সম্মেলনের সভানেত্রী এবং যুব সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন মানিকতলা বোমা-মামলার শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুবাদে প্রখ্যাত,—দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার এসিস্ট্যান্ট এডিটর।

B. P. C. C-র মিটিং □

Bengal Pradeshik Congress Committee কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনে শ্রীশাসমল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সমালোচনা করেছিলেন। 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার এসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসেবে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শাসমলের অভিভাষণের কপি আগেই পেয়েছিলেন। সি. আর. দাসের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট নাকচ করে দেবার জন্য তিনি এবং তাঁর গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিলেন। এরমধ্যে শ্রীশাসমল—যিনি স্বরাজ-দলভুক্ত লোক—লিখে বসলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য। ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে উপেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর-সম্মেলন ভেঙে দেবার ইচ্ছাতেই কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর এসেছিলেন। কিন্তু কার্যত কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলন ভাঙা যায়নি এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই শ্রীশাসমলের মন্তব্যে সভায় গোলমালের সৃষ্টি হয় ও শাসমল সম্মেলন ত্যাগ করে চলে যান। এই গোলযোগ ও সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে কৃষ্ণনগর সম্মেলন হয়। এই গোলমালের ফলেই বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় কৃষ্ণনগর-সম্মেলনের অস্থির সময়টায় B.P.C.C-কে নিশ্চিত ভাবেই জরুরী বৈঠকে বসতে হয়েছিল।

শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মনোমোহন ঘোষ অরবিন্দের অগ্রজ। তথ্যানুসন্ধানে জানতে পারা যায় কৃষ্ণনগরের ছাত্র-যুব আন্দোলনকে যিনি সর্বতোভাবে সহায়তা করেছিলেন তিনি অরবিন্দের অগ্রজ মনোমোহন ঘোষ নন, তিনি ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ। ১৯২৬-এ ছাত্র-যুব সম্মেলনটি তাই ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়িতেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যদিও মনে রাখতে হবে ১৮৯৬-তেই ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ লোকান্তরিত হয়েছেন।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশনাল লাইব্রেরির তৎকালীন এ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান।

১৯২৬-এ প্রাদেশিক সম্মেলন এপ্রিলে হওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা এপ্রিল মাসে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়।

দফায় দফায় এই দাঙ্গা তিনবার সংঘটিত হয়েছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক, ছাত্র এবং যুব—এই তিনটি সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল। প্রস্তুতি চললেও সেই দাঙ্গার উত্তেজক আবহাওয়ায় সম্মেলন করা সম্ভব ছিল না, এ কথা সহজেই অনুমেয়। ফলে সম্মেলন সামান্য পিছিয়ে মে মাসে হয়।

Sd/- DUM DUM Central Jail
Superintendent ৫. Calcutta-28
DUM DUM Central Jail 4. 3. 1965

প্রাণতোষ,

তোমার ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র সবে গত রাত্রে পেয়েছি। আগেকার পত্রে তোমাকে তো বলেই দিয়েছিলাম যে অসুস্থ শরীর নিয়ে তোমায় আর কিছু করতে হবে না। তবুও তুমি কেন যে কৃষ্ণনগর সম্মেলনের কথা এখনও ভাবছ তা বুঝতে পারছিনে। আমার যা দরকার ডাক্তার মহাদেব সাহা তার সবকিছু তখনকার খবরের কাগজ হতে কপি করে পাঠিয়েছেন। প্রমোদ সেনগুপ্তও তথ্য পাঠিয়েছেন। কাজেই আমার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। এ চিন্তা ছেড়ে দিয়ে তুমি এখন নিজের অসুখ সারাবার কথা ভাবতে থাক।

তুমি আমার ভলোবাসা নাও।

শুভার্থী—

মুজফ্ফর আহ্মদ

[সূত্র ঃ ৫] ডাক্তার মহাদেব সাহা। 'ডাক্তার' নন, 'ডক্টর'। বিশিষ্ট গবেষক। নজরুল-জীবনী রচনার কাজে শ্রীআহমদকে সাহায্য করেছিলেন। 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রন্থের 'কৈফিয়ৎ'-এও এঁর সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। (নাম—ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা।)

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৯২৬-এ কৃষ্ণনগরের যুবকদের অন্যতম। ১৯২৭-এ বিলাত যান ও বিলাতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

দেশে ফেরেন ১৯৪৬-এ। দেশে ফিরেও সক্রিয়ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। সুলেখক ও গ্রন্থকার। তাঁর রচিত গ্রন্থ— 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ', 'নীলবিদ্রোহ ও তৎকালীন বাঙালী সমাজ', 'কালান্তরের পথিক রম্যাঁ রলাঁ', 'বিপ্লব কোন পথে ?' প্রভৃতি।

Sd/-
Superintendent
DUMDUM CENTRAL JAIL

৬.

দমদম সেনট্রাল জেল
কলকাতা-২৮
৯ই আগস্ট, ১৯৬৫

প্রিয় প্রাণতোষ,

আমার জন্মদিনে শুভেচ্ছা যে জানিয়েছ তার জন্যে তোমায় ধন্যবাদ। তোমার স্বাস্থ্যের কথা তো কিছু লেখনি। আশা করি, এখন ভালো আছ তুমি। আমার পুস্তকখানা দশ-বারো দিনের ভিতরে বাজারে বের হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তোমায় একখানা পুস্তক দেওয়ার জন্যে আমি ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড্‌কে লিখে দিয়েছি। পুস্তকখানা বার হলে তার ঘোষণা কোথাও না কোথাও ছাপা হবে। তখন তুমি একখানা পুস্তক অফিস (২, সূর্য সেন স্ট্রীট) হতে নিয়ে যাবে। তোমার রক্তের চাপ বেশী। যদি তেতালায় উঠতে তোমার কষ্ট হয় তবে তুমি সুরেন দত্তকে একখানা পত্র লিখে অনুরোধ করবে যে তোমায় যেন কাউন্টার হতে (১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট) একখানা বই দেওয়া হয়। তা হ'লে তিনি কাউন্টারকে সেই রকম উপদেশ দিয়ে রাখবেন।

আমার বইখানা পড়লে তুমি হয়তো তোমার পুস্তকের কোনো কোনো স্থলে পরিবর্তন ক'রে নিতে পারবে।

বেশ কয়েকদিন আগে আমি আমার মেয়েকে একখানা পত্র লিখেছি। হয়তো সে পত্র পাওয়ার আগে তারা তোমার নিকট হতে খোঁজ নিয়েছে কিংবা হতে পারে যে পত্র তারা পায়ই নি। বুঝতেই তো পারছ যে এত নিকটের ঢাকা এখন আমাদের নিকট বিদেশ বিভুঁই।

তুমি আমার ভালোবাসা নাও।

তোমার

মুজফ্‌ফর আহমদ

[সূত্র ঃ ৬] 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা'। চিঠিটি লেখা ৯ই আগস্ট ১৯৬৫। কিন্তু এর 'দশ-বারো দিনের ভিতরে' বইটা প্রকাশিত হয়নি। বইটি প্রথম প্রকাশিত সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫-তে।

সুরেন দত্ত নিউ বুক সেন্টারের মালিক। সে সময় N.B.A-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

'আমার মেয়ে' আফিফা। সাহিত্যিক আবদুল কাদিরের পত্নী।

৭.

Sd/-
Superintendent
DUM DUM Central Jail

দমদম সেনট্রাল জেল
কলকাতা-২৮
১১ই ডিসেম্বর ১৯৬৫

প্রিয় প্রাণতোষ,

খবর পেয়েছিলেম কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে তুমি দোকানে গিয়ে আমার বইখানা নিয়ে যাবে বলে তাদের জানিয়েছিলে সে তো ক'মাস আগেকার কথা! এত দীর্ঘ দিনের ভিতরে তুমি বইখানার প্রাপ্তি-সংবাদ দিলে না এটা আমার নিকটে খুব আশ্চর্য ঠেকছে। তুমি কি বইখানা নিয়ে যাওনি? খুব কি অসুখে পড়েছ তুমি? তোমাকে যখন বই নিয়ে যেতে লিখেছিলেম তখন পবিত্র গাঙ্গুলীকেও লিখেছিলেম। সে তো বই নিয়ে গিয়ে প্রাপ্তি-স্বীকার করেছে। ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর লোকদের সঙ্গে আমার কমই দেখা হয়। শেষ যে দেখা হয়েছে তখন জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলেম।

ভালোবাসা নাও।

তোমার

মুজফ্‌ফর আহমদ

[সূত্র ঃ ৭] কবি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৬১, কড়েয়া রোড

৮.

কলকাতা-১৯

২৪-৭ ১৯৬৬

প্রিয় প্রাণতোষ,

তোমার সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়ার প্রয়োজন আছে। যদি তোমার শরীর ভালো থাকে তবে একবার আসবে। আসার আগে টেলিফোন করতে ভুলে যেও না। আমি বাইরে খুব কমই যাই। এমন ঘটা আশ্চর্য নয় যে তুমি যে দিনটিতে এলে ঠিক সেদিনই আমি বাইরে চলে গেলাম। এই জন্যে তোমায় টেলিফোন করে আসতে বলছি।

ভালোবাসা নিও।

তোমার

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

৯

টেলিফোন:
৪৪ ১৫৮৯

৬১, কড়েয়া রোড
কলকাতা-১৯
সেপ্টেম্বর ২, ১৯৬৬

প্রাণতোষ,

তোমার পোস্টকার্ড ঠিক সময়ে পৌঁছেছে। আমি কিছু দেরীতে তোমায় উত্তর লিখছি। আগেই আমি বুঝেছিলেম যে তোমার অসুখ-বিসুখ একটা-কিছু হয়েছে। দেরী যা হবার তাতো হয়েই গিয়েছে, এখন উৎকণ্ঠিত হয়ে কোনো লাভ নেই। লোক না থাকলে কত অসুবিধায় পড়তে হয় তা আমার চেয়ে ভালো আর কে বুঝবেন? তোমাদের ওখানকার কলকাতায় যাঁরা চাকরি করেন তাঁদের কোনো একজনের সাহায্যে রবিবারে কিছু করতে পার কিনা চেষ্টা করে দেখবে।

পরিতোষ নাকি ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে বলে গেছে যে 'নজরুল রচনাবলী' একখানা তুমি পেয়েছ। কাদিরের সঙ্গে আমাদের অনেক গরমিল। যে সকল কবিতা দৌলৎপুরে রচনা হয় নি সে লিখেছে সে-সব কবিতার রচনাস্থল দৌলৎপুর। এর ভিতরে নার্গিস বেগম ও তাঁর মামার দোষক্ষালনের একটা প্রচেষ্টা আছে।

তুমি নিরাময় হয়ে ওঠ এই কামনা আমি করছি। তোমার জীবনী-শক্তি-তোমাকে সুস্থ করে তুলবে এই বিশ্বাস আমার আছে। কিছুতেই ঘাবড়ে যেও না।

তোমার

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

[সূত্র ঃ ৯] পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। [পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

১৯২১-এর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ নজরুল আলী আকবর খান নামক জনৈক ব্যক্তির প্ররোচনায় তাঁর সঙ্গে কুমিল্লা যান। আলী আকবর খান শিশুদের জন্য স্কুলপাঠ্য বই লিখে বিত্তশালী হবার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তাঁর কাব্য-প্রতিভা ছিল না। নজরুলের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে কোনো ভাবে করায়ত্ত করে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করাই ছিল আলী আকবর খানের উদ্দেশ্য। এইজন্য তিনি কুমিল্লা হয়ে নজরুলকে তাঁর দেশের বাড়ি দৌলৎপুরে নিয়ে যান এবং ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুনকে নজরুলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে প্ররোচিত করেন। সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে নজরুলের এই অন্তরঙ্গতা বিবাহ পর্যন্ত প্রায় অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলী আকবর খানের উদ্দেশ্য নজরুলের কাছে গোপন থাকে নি। তীব্র অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে নজরুল বিবাহের দিন দৌলৎপুর ত্যাগ করে কুমিল্লা চলে আসেন। পরে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কলকাতা থেকে কুমিল্লা গিয়ে নজরুলকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। এই সৈয়দা খাতুনকেই নজরুল ডেকেছিলেন 'নার্গিস' বলে। এ বিষয়ে শ্রীআহমদ তাঁর নজরুল-বিষয়ক 'স্মৃতিকথা'তে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

১০.

৬১, কড়েয়া রোড
কলকাতা-১৯
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

প্রাণতোষ,

তুমি অসুস্থ হয়ে আছ। তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনে। সেই

'কথাসাহিত্য'-খানা আমার একান্ত দরকার। আমার পুস্তকখানার দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপার কাজ আটকে আছে। নলিনীবাবুর সেই লেখাটি সম্বন্ধে একটি ছোট্ট ফুটনোট দিতে হবে। লেখাটার শিরোনাম পর্যন্ত আমি ভুলে গেছি। শুনলাম আমাদের মলয় চ্যাটার্জির বাড়ি হতে বেশী দূর নয়। তিনি ব্যাঙ্কে চাকরি করার জন্যে রোজই কলকাতা আসেন। তাঁর মারফতে কাগজখানা অবশ্য পাঠিয়ে দিও। তাঁকে বলে দেবে যে তাঁর চাকরির কাজ শেষ ক'রে কাগজখানা যেন অবশ্য আমার হাতে পৌঁছিয়ে দেন।

তোমাদের ওখানে নাকি একবার মাত্র চিঠি-পত্র ডেলিভারি হয়। চিঠি যেতে কত সময় যে লাগে তাও বুঝিনে। যদি লণ্ডনের জন্যে ও কলকাতার অন্য একটি এলাকার জন্যে একই সঙ্গে চিঠি ডাকে দিই তবে লণ্ডনের চিঠিখানা আগে পৌঁছয়। আমাদের ডাক-বিভাগের কত অধঃপতন যে হয়েছে তা ভাবতেও কষ্ট হয়।

ভালোবাসা নিও।

তোমার

মুজফ্ফর আহমদ

[সূত্র ঃ ১০] ১৩৭৩ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় নলিনীকান্ত সরকার একটি বিতর্কিত প্রবন্ধ লেখেন। বিতর্কটা ছিল নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কে প্রথম প্রেসে দেন, তা নিয়ে। 'বিদ্রোহী' প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে ১৯২২, ৬ জানুয়ারী। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৩৬২, কার্তিক সংখ্যার 'মাসিক বসুমতী'-তে একটি প্রবন্ধে বলেন যে, তিনিই 'বিদ্রোহী' কবিতাটি 'বিজলী'-তে এনেছিলেন। ১৩৭৩, আষাঢ়ের 'কথাসাহিত্য'-তে নলিনীকান্ত সরকারও দাবী করলেন 'বিদ্রোহী' প্রেসে দেবার গৌরব তাঁর নিজের। এ বিষয়ে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং মুজফ্ফর আহমদ উভয়েই ছিলেন অবিনাশচন্দ্রের পক্ষে। নলিনীকান্ত সরকারের দাবীটি খণ্ডন করার জন্যেই তাই ঐ বিশেষ সংখ্যার 'কথাসাহিত্য'টি প্রয়োজন ছিল। 'কথাসাহিত্য'টি সংগ্রহ করার পর শ্রীআহমদ সেই লেখাটি

সম্পর্কে 'ফুট নোট' দেন। ['কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা' (১৯৮৫-র সংস্করণের ১২১ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।]

লেখাটার শিরোনাম ☐

নলিনীকান্ত সরকারের লেখাটির শিরোনাম ছিল 'নজরুলের স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে।'

টেলিফোন ঃ ১১. ৬১ কড়েয়া রোড
৪৪-১৫৮৯ কলকাতা-১৯
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

প্রাণতোষ,

তোমার পাঠানো লেখা ও পত্রিকা মলয় চট্টোপাধ্যায়ই আমায় দিয়ে গেছেন। লেখাটি পড়ে আমি ডাক-যোগে 'কথাসাহিত্য'-কে পাঠিয়ে দিয়েছি।

তুমি এখনো বিছানায় পড়ে আছ জানতে পেয়ে চিন্তিত হলাম। মনে হচ্ছে এবারে বেশী দিন বিছানায় পড়ে থাকবে। নিশ্চয় চিকিৎসা হচ্ছে। কেমন থাক খবর দিও।

কাদির তোমায় 'আত্মশক্তি' হতে নজরুলের খোলা-চিঠি কপি করে পাঠাতে লিখেছিল। কোন্ সময়কার 'আত্মশক্তি' তোমার কি মনে আছে? সম্ভব হলে লিখে জানিও।

তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠ, এই কামনা করি।

তোমার

মুজফ্ফর আহমদ

[সূত্র ঃ ১১] মুজফ্ফর আহমদের অনুরোধে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় মলয় চ্যাটার্জী মারফত ১৩৭৭, আষাঢ় সংখ্যার 'কথাসাহিত্য'টি আহমদ-সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেইজন্য 'কথাসাহিত্য'তে প্রকাশিত নলিনীকান্ত সরকারের লেখাটির ত্রুটির ওপর আলোকপাত করে একটি প্রবন্ধ লিখে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় মুজফ্ফর আহমদকে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীআহমদ প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি 'কথাসাহিত্য'তে

প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ-দলের অন্যতম মুখপত্র সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'র ১৯২৬-এর ২০শে আগস্ট সংখ্যায় পুস্তক-পরিচয় বিভাগে শ্রীতারানাথ রায় 'তারা-রা' ছদ্মনামে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপত্র 'গণবাণী'র সমালোচনা করেন। তারই জবাবে নজরুল 'আত্মশক্তি'তে 'গণবাণী ও মুজফ্‌ফর আহমদ' শীর্ষক একটি খোলা চিঠি প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

টেলিফোন ঃ ৪৪-১৫৮৯ ১২. ৬১, কড়েয়া রোড কলকাতা-১৯

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

প্রাণতোষ,

তোমার পত্র ও কবিতা পেয়েছি। কবিতাটি ব্যক্তি-পূজার পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে। এই জাতীয় লেখা যত কম লেখা যায় ততই ভালো। তবুও কবিতার ভিতর দিয়ে আমার প্রতি যে-ভালোবাসা তুমি প্রকাশ করেছ তার জন্যে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

তোমার লেখাটা 'বিংশ শতাব্দী' নিয়ে গেছেন। 'কথাসাহিত্যে'র চেয়ে 'বিংশ শতাব্দী'র প্রচার অনেক বেশী। ওঁদের 'কার্তিক' সংখ্যাক কাগজখানা ১লা নভেম্বর তারিখে বা'র হবে। তাতেই ছাপা হবে তোমার লেখা।

তুমি অনেক দিন বিছানায় পড়ে রইলে। সুস্থ হয়ে উঠতে হবে তোমাকে। কেন মৃত্যুর কথা তুলছ? মানুষের তো একটি মাত্র জীন। পুনঃজন্ম তো শোষক-সম্প্রদায়ের বাহানা। বেঁচে ওঠার কথাই ভাবতে থাকবে। একবার চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লে আর কোথাও কিছু নেই। যতদিন সম্ভব এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চেষ্টা ক'রে যাও।

কাদির এখনও তোমায় খাটিয়ে মারছে। এটা তার বড়ো অন্যায়। ওঁরা হাই-কমিশনের মারফতে চেষ্টা ক'রে অনায়াসে একজন লোক এখানে পাঠাতে পারেন।

আচ্ছা, 'আত্মশক্তি'তে 'খোলা চিঠি'টা কি? কি লেখা আছে

তাতে ? কোন্ বছরের কোন্ তারিখের 'আত্মশক্তি' এটা ?

আমার ভালোবাসা নিও।

তোমার

মুজফ্ফর আহমদ

[সূত্র ঃ ১২] মুজফ্ফর আহমদের ৭৭ তম জন্মদিনে (৫ই আগস্ট, ১৯৬৬) প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় একটি কবিতা রচনা করে তাঁকে উপহার পাঠান।

'কথাসাহিত্য'তে প্রকাশিত নলিনীকান্ত সরকারের প্রবন্ধের অন্তর্গত দাবীটিকে খণ্ডন করে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় যে রচনাটি মুজফ্ফর আহমদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, শ্রীআহমদ সেটি 'কথা-সাহিত্যে'তে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। 'কথাসাহিত্য' প্রবন্ধটি প্রত্যাখ্যান করে ফেরৎ পাঠায়। সঙ্গে ছিল একটি চিঠি—

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় সমীপে ১৪-৯-৬৬

সবিনয় নিবেদন,

আপনার লেখা পাইয়াছি। লেখাটি মুজফ্ফর আহমদ মহাশয়ের স্বলিখিত হইলে ছাপিতে পারিতাম। উনি যদি নিজে প্রতিবাদ পাঠান ; স্বচ্ছন্দে পাঠাইতে পারেন। আপনার লেখাটি এই সঙ্গে ফেরৎ পাঠাইলাম।

নমস্কারান্তে

ভানু রায়

[প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজী নজরুল' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বের পরিশিষ্ট থেকে। পৃষ্ঠা ২০৭]

'কথাসাহিত্য' প্রত্যাখ্যান করলে প্রবন্ধটি 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকায় যায়।

ঢাকার কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড থেকে যে নজরুল রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ তখন নেওয়া হয়েছিল তার প্রকাশক ছিলেন আবদুল কাদির। নজরুল-রচনা সংকলনের প্রয়োজনেই আবদুল কাদির প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড নজরুল রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা

গ্রহণ করেন ১৯৬৪-র শেষদিকে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ৮৪ শান্তিনগর, ঢাকা-২ থেকে ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩/২৫শে মে ১৯৬৬। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১০ গ্রীন রোড (গ্রীন স্কোয়ার), ঢাকা-২ থেকে ৯ই পৌষ ১৩৭৪/২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৭-তে।

১৩

৬১, কড়েয়া রোড
কলকাতা-১৯
২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬

প্রাণতোষ,

তোমার পত্র ক'দিন আগে পেয়েছি। তোমার লেখাটি 'বিংশ শতাব্দী'র 'কার্তিক' সংখ্যায় ছাপা হয় নি। ওঁরা আমায় টেলিফোনে জানিয়েছেন যে তা অগ্রহায়ণে ছাপা হবে। ছাপতে দেরী হওয়ার কারণে লেখাটার মূল্য কমে গেল। হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়রা স্বামী-স্ত্রীর কেউ আমায় অবশ্য বলেননি, তবে শুনলাম ওঁদের ঘর-বদল করার কারণে তোমার লেখাটা কোথাও পড়ে গিয়েছিল। সেই জন্যে তাঁরা কার্তিক সংখ্যায় তা ছাপাতে পারেন নি।

আমি কোন কাজই করতে পারছিনে। ১৪ বছর বাস করার পরে এ বাড়িটিও এখন ছাড়তে হবে। বাড়িওয়ালা ভাইয়ে-ভাইয়ে পার্টিশন হলে আমরা বাড়ি ছেড়ে দেব ব'লে কথা দিয়েছিলেম। আমাকে কোথাও দূরে চলে যেতে হবে। সেই পার্টিশনটা এখন হচ্ছে।

শুনলাম শ্রীনলিনীকান্ত সরকার কলকাতায় এসেছেন। পরশু সন্ধ্যায় নাকি নজরুলদের বাড়িতে এসেছিলেন।

তুমি কি অফিসে যাচ্ছ? কেমন আছ এখন? আমার ভালোবাসা নিও।

তোমার
মুজফ্ফর আহমদ

[সূত্র ঃ ১৩] হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'বিংশ শতাব্দী'র পরিচালক, সম্পাদক এবং মালিক।

৬১, কড়েয়া রোড, কলিকাতা ১৯-এর বাড়িটি। বাড়িটি

মুজফ্‌ফর আহমদ ছেড়েছিলেন বটে, তবে ১৯৬৭-র আগস্ট মাস পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৭-তে তিনি নতুন বাড়িতে ওঠেন।

9, Dilkusha Street
১৪. Calcutta-17
20. 9. 1967

প্রাণতোষ,

এ মাসের ১লা তারিখে আমি বাড়ি বদল করেছি। তোমার ১৬ই তারিখের চিঠি আজ পেলাম। এর আগে যে পত্র এসেছিল তাতে তোমার বেড্‌ নম্বর ইত্যাদি ছিল না। পরিতোষের সঙ্গে পি সি· মিটিংএ দেখা হয়েছিল। আমার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ একখানা লোক পেলে পাঠাব। ধার হিসাবেই পাঠাব। উপহার দিতে প্রকাশকরা হয়তো রাজী হবেন না। কাজেই কথাটা তাঁদের নিকটে তুলিই নি।

তুমি কিঞ্চিৎ ভালো হয়েছ জেনে খুশী হলাম।

তোমার
মুজফ্‌ফর আহমদ

[সূত্র ঃ ১৪] ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরে 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তার ন-দশ মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রেসে পাঠাতে হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৭-তে।

Telephone ১৫. 49, LAKE PLACE
46-0551 CALCUTTA-29
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

প্রিয় প্রাণতোষ,

পরে পরে তোমার দু'খানি পত্র আমি পেয়েছি। কিন্তু উত্তর একখানিরও দিইনি। আমার বয়স বাড়ছে। মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি বাড়ছে। জ্ঞানে বোধ হয় যে গত ৫ই আগস্ট তারিখে আমি আশি বছরে

পড়েছি। শুধু বয়সই বাড়ছে না, সঙ্গে সঙ্গে জড়তাও বাড়ছে। তার মানে কাজ করার ইচ্ছা ও শক্তি দুই কমছে।

যে বইটি লিখছিলাম তার কাজও এগুচ্ছে না। আমার শরীরের অবস্থার সঙ্গে লেখারও যে সম্পর্ক রয়েছে তা তো বোঝ। আমার যদি ক্ষমতা থাকত, সব কাজ যদি আমি মুখ বুজে নিজে করতে পারতেম তবে কারুর নিকটে কোনো জবাবদিহি আমার করতে হত না। এখন কারুর নিকটে কোনো সাহায্য চাইলে তিনি যত-না সাহায্য দেন বইটি সম্পর্কে প্রচার করেন তার পাঁচগুণ। এতেই আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি কিছুতেই লোকের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারব না, আসলে বইটির লেখাই শেষ হবে না।

আমি যতটুকু লিখছি, ততটুকুই প্রেসে পাঠাচ্ছি। 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা'তেও তাই করেছিলেম। এখন ৩০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কম্পোজ হয়েছে। আর লেখা নেই। যদি প্রথম খণ্ড আলাদা বা'র করি তবে ১৭৫ পৃষ্ঠা হতে ২০০ পৃষ্ঠা ছাপানোর মতো লেখা আরও লিখতে হবে। এতটা লেখার ভরোসাও পাচ্ছিনে।

অনেক দিন পরে ঢাকার পত্র পেয়েছি। কাদির 'নজরুল রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড পাঠিয়েছে। লিখেছে তোমাকে ও আরও কয়েকজনকে বই পাঠিয়েছে। আমি বইখানি পেয়ে গেছি। আশা করি, তুমিও পেয়ে গেছ।

'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা' তৃতীয় মুদ্রণের জন্যে প্রেসে পাঠাব। এবার আর কোনো কিছু যোগ করব না। তবে, কোনো ভুল ধরা পড়লে সেটা শুধরে দেব। তোমার পাঠানো মালমসলাও বইতে দেব না। তোমার সঙ্গে কোনো দিন দেখা হলে ওই বিষয়ে আলোচনা করব। কি চিঠি তুমি পেয়েছ সেটা তখন নিয়ে আসবে।

ভালোবাসা নিও।

শুভার্থী—

মুজফ্ফর আহমদ

[সূত্র ঃ ১৫] মুজফ্ফর আহমদের জন্য ৫ই আগস্ট, ১৮৮৯

সন্দীপের মুসাপুর—নোয়াখালীতে।

'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'। ১৯৬৭-র ৭ই জুন প্রথম বইটির পাণ্ডুলিপি (আংশিক) প্রেসে পাঠানো হয় ও ত্রিশ-বত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এখানে-ওখানে ছাপা হয়। প্রথমে পরিকল্পনা ছিল ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ঘটনার স্মৃতি বইটিতে সন্নিবেশিত হবে। শেষে অবশ্য ১৯২০-১৯২৯-এর ঘটনাধারাই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৯, ডিসেম্বরে। প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সী।

'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা' তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯-তে।

Telephone ১৬. 49, Lake Place
46-0551 Calcutta-29
19. 11. 1968

প্রিয় প্রাণতোষ,

তোমার ১৮ই তারিখের পত্র আজ পেয়েছি। ইতোমধ্যে কোনো রকম দুর্ঘটনা যদি না ঘটে তবে ২৫শে তারিখে আমি বাড়িতেই থাকব। সাধারণত বাড়িতেই থাকি, ক্বচিৎ কদাচিৎ একদিন হয়তো পার্টি অফিসে যাই।

শুভার্থী—
মুজফ্ফর আহমদ

Telephone ১৭. 49, Lake Place
46-0551 Calcutta-29
28. 11. 1969

প্রাণতোষ,

তোমার ২৬শে তারিখের পত্র পেলাম। তুমি যে বিষয়টার কথা জিজ্ঞাসা করেছ সেটা তোমার পত্র পড়েই আমার মনে পড়ল। কাজেই এ পুস্তকে তা আর লিখিনি। এখন আর কোনো উপায় নেই।

'আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (১৯২০—১৯২৯)' এখন শেষ স্তরে আছে। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী বিজ্ঞাপন দিতে যাচ্ছেন যে পুস্তকখানি ১২ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁদের কাউন্টার হতে বিক্রয় হবে। ৭০৪ পৃষ্ঠার পুস্তক। ষোল টাকা দাম।

এখন আমি ঘাবরে গেছি। এত বড় পুস্তকে কি লিখলাম বুঝতে পারছিনে। লোকের কি ভালো লাগবে এই পুস্তক ?

তুমি আমার ভালোবাসা নিও।

তোমার

মুজফ্ফর আহমদ

[সূত্র ঃ ১৭] ২৮শে নভেম্বর, '৬৯ বইটির কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কেননা ১২ই ডিসেম্বর থেকেই N. B A কাউন্টার থেকে বইটির বিক্রয় শুরু হয়।

Telephone 46-0551 — ১৮. — 49, LAKE PLACE Calcutta-29

৬ই আগস্ট, ১৯৭০

প্রাণতোষ,

তোমার কালকের লেখা পত্র আজ পেলাম। জন্মদিনে চিঠি লিখে আমার শতায়ু কামনা করেছ। এটা শুভ কামনা কিনা বুঝতে পারছিনে।

শতায়ু হওয়ার আগে কোনো লোক যদি শুধু একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয় (তার সম্ভাবনাই তো বেশী) তবে শতায়ু হওয়ার দুঃখটা একবার কল্পনা ক'রে দেখছ কি ?

তোমার আবার করোনারি আক্রমণ হয়েছিল শুনে খুবই চিন্তিত হয়েছি। এদিকে তোমার পুস্তকের ছাপা কতটা এগিয়েছে তা তো লিখলে না, নজরুল ইসলামের চুলের কাঁটার সঠিক তথ্য আমি জানিনে। যা জানিনে তা লিখব কি করে ? এ ব্যাপার চাপা পড়ে থাকবে কিনা তা ভবিষ্যৎ জানে।

তুমি বোধ হয় সংবাদ-পত্রে পড়েছ পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান নির্দেশ দিয়েছেন যে সমগ্র পাকিস্তান হতে কোন পুস্তক ও সংবাদপত্র ভারতে আসতে পাবে না। দীর্ঘ সময় নিলেও চিঠিপত্র যায় ও আসে। তবে, কাদিরেরা প্রায় চার পাঁচ মাস আমাকে লেখেনি। এখন মাঝে মাঝে পত্রাদি আসছে। কাদির বাঙলা উন্নয়ন-বোর্ড হতেও অবসর গ্রহণ করেছে। নজরুল-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের ছাপা শেষ হয়েছে। ইয়াহিয়া খানের অর্ডার উঠে না গেলে আসবে না।

ভালোবাসা নিও।

শুভার্থী—

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

[সূত্র ঃ ১৮] প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজী নজরুল' গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ।

নজরুলের 'ব্যথার দান' পুস্তকের উৎসর্গপত্রে আছে—

'মানসী আমার!
মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে
ক্ষমা করনি,
তাই বুকের কাঁটা দিয়ে
প্রায়শ্চিত্ত করলুম।'

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন—'কে ছিলেন এই কাঁটার মালিক তাঁর নাম সে আমায় কোন দিন বলেনি। ['৮৫ সংস্করণ পৃঃ ১৭] নজরুল-জীবনীকার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ও এই কাঁটার মালিকের সন্ধান করেছেন অক্লান্তভাবে। জানা গিয়েছিল কিশোর-নজরুল কোন একটি প্রেমঘটিত ব্যাপারে উদভ্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত চুরুলিয়া ত্যাগ করে পল্টনে যোগ দেন। এই সূত্র ধরে অগ্রসর হয়ে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্য করেন নজরুলের সৈনিক জীবনে লিখিত 'রিক্তের বেদন' গল্পে নজরুল 'শহীদা খানম' নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসার কথা লিখেছেন। 'শহীদা' নামটি অবশ্যই

আসল নাম নয়। তবে কবির জীবনে এই ভালে বাসার ঘটনাটি বাস্তব সত্য। এই প্রেমকে কেন্দ্র করে পারিবারিক অশান্তিও সৃষ্টি হয়। তাই একদিন প্রেয়সীর চুলের কাঁটা মাত্র সম্বল করে গ্রাম ছাড়লেন ;—চলে গেলেন পল্টনে। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—'যে ভাগ্যবতীর খোঁপার কাঁটা সম্বল করে পল্টনে নাম দিয়ে সৈনিক-বৃত্তি নিয়ে কবি চুরুলিয়া ত্যাগ করেছিলেন -তিনি কে? [কাজী নজরুল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩] এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর সন্ধানের জন্যই প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং চুরুলিয়া যান। সেখানে নজরুলের এক বন্ধু শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে নজরুলের দিওয়ানা হবার কারণ ও মেয়েটির আসল নাম ও ঠিকানা দেন। মেয়েটি তখন বড়-পরিবারের গৃহিণী। এই বিবাহের সংবাদ নজরুল করাচী ক্যাম্পেই পেয়েছিলেন। 'রিক্তের বেদন' গল্পের এক জায়গায় আছে—

'যেদিন চিঠি পেলুম, শহীদার, আমার গোপন ঈপ্সিতার বিয়ে হয়ে গেছে—সে সুখী হয়েছে। মনে হল, যেন এক বন্ধন হতে মুক্তি পেলুম।' [রিক্তের বেদন, প্রথম সংস্করণ ১৩৩১, ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, পৃষ্ঠা—২৪]

শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহে নজরুল ইসলামের উপহার দেওয়া 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের যে কপিটি আছে, তার মলাটের পরপৃষ্ঠাতে শ্রীচট্টোপাধ্যায় স্বহস্তে লিখে রেখেছেন—শহীদার আসল নামটি। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে আমরা শহীদার আসল নামটি প্রকাশ করতে সক্ষম হলাম না। ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে নামটি অবশ্যই প্রকাশ পাবে।

Telephone 41-1891 | ১৯. | 49, Lake Place Calcutta-29 27.7.1972

প্রাণতোষ,

কালকের তারিখের পত্র এসেছে। হাতের লেখার টান দেখে মনে হচ্ছে এবার কিছু ভালো আছ।

৩১শে তারিখে নিশ্চয়ই এসো। আমি তো বাড়ীতেই পড়ে আছি তুমি এলে ঢাকার কথা গল্প করব।

অনেক দিন পরে তোমার পত্র এলো, নয় কি? আমি প্রায় অন্ধ হয়ে গেছি। লিখতে গিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে হয় কালির আঁচড় ঠিক পড়ছে কিনা।

তোমার

মুজফ্ফর আহ্মদ

"আজকের অধিকাংশ লোক অল্পাংশ লোকের দ্বারা বিলুপ্ত হচ্ছে। এরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিলে আমাদের জাতীয় শক্তি-সমূহের সংহতির স্বপ্ন কোনোদিনই সফল হবে না। শ্রমিকদের ভিতরে মাথা তুলে উঠেছে, আজকের বাজে ঐক্যের দোহাই দেওয়া আর চলবে না। শ্রমিকদের জাগরণ অবশ্য অ-শ্রমিক লোকেরা খুব ভাল চোখে দেখে না। যেহেতু এতে তাদের স্বার্থের হানি যথেষ্ট হবে। এখন তারা পরের পরিশ্রমের কড়ি খুব আমোদ করে উপভোগ করছে। শ্রমিকেরা জেগে উঠলে তা আর সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।"

মুজফ্ফর আহমদ

'লাঙল'। 'কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন'

১৯২৬, মার্চ।



□ বিভিন্ন গুণিব্যক্তির চিঠি □

১. সুভাষ চক্রবর্তী, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী,
যুবকল্যাণ ও শিক্ষা (ক্রীড়া) বিভাগ
এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী, দুগ্ধ প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
তারিখ ২৮শে জুলাই '৮৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র আমাকে অভিভূত করেছে। আমি কৃতজ্ঞ যে আপনি আমায় মনে রেখেছেন। বয়সের ভার যে আপনার কাছে কিছু না, সেদিন মঞ্চে আপনাকে দেখে বুঝতে পারলাম। মানুষের মনের জোর, গভীর আত্মবিশ্বাস এবং স্বনির্ভর-ভাবনা মানুষকে মহৎ ও মহান করে তোলে। আপনাকে ঐদিন প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়ে আরও বেশী করে বুঝতে সক্ষম হলাম। শ্রীবুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটি পেলাম। আগামী সংখ্যায় ছাপার ব্যবস্থা নেব। শ্রদ্ধান্তে---

সুভাষ চক্রবর্তী

শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

[সূত্র : ১] । ১৯৮৬ সালের ২৫শে মে নজরুল-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রাণতোষবাবু চুরুলিয়া নজরুল-একাডেমীর আমন্ত্রণে চুরুলিয়ায় যান। মন্ত্রীবর শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির (সদ্যপ্রয়াত ২২-৩-১৯৮৯) কৃষক-নেতা পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়ও নজরুল-মেলা উপলক্ষে চুরুলিয়া যান। এখানেই প্রাণতোষবাবুর সঙ্গে সুভাষবাবুর আলাপ হয়।

১৪ জানুয়ারী, ১৯৮৫ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রাণতোষ-বাবুর 'কাজী নজরুল (২য় পর্ব)' গ্রন্থের সমালোচনায় 'নজরুল কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না' এমত উল্লেখ করে প্রাণতোষবাবুর লেখাটিকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে বর্ণনা করা হয়। এর জবাবে বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় 'যুবমানস', (সম্পাদক : সুভাষ চক্রবর্তী) পত্রিকায় ছাপবার জন্য একটি লেখা নিয়ে যান প্রাণতোষবাবুর চিঠি সহ। সেই চিঠির জবাবে সুভাষবাবুর উপরের পত্রটি।]

সম্পাদকত্রয় একজন। কবি ও গল্পকার।

Sachindranath Adhikary ১.

শরৎনলিনী
গড়পাড়
Chandannagar

ভারতবর্ষে কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী কবি' নামেই চিরপূজিত। তাঁর প্রকৃত পরিচয় আজো বিশেষ আলোচিত হয়নি। আজও তিনি জীবিত, কিন্তু জীবন্মৃত অবস্থায়, মৌনমূলক অসহায়, ছিন্ন তার বীণার মতো মহাকালের চরম নির্দেশের অপেক্ষায় জীবন-যন্ত্রণা ভোগ করছেন। যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের রণভেরী বারবার তাঁর কণ্ঠে গর্জে উঠেছিল, সেই কালজয়ী কণ্ঠ আজ আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর যখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেই সময়েই নীরব। জাতির এতবড় দুর্ভাগ্য আর হতে পারে না। তাঁর মরণজয়ী জীবন-ইতিহাস বাংলার অনেক সাহিত্যিক লিখেছেন। কিন্তু সে জীবনী খণ্ড, বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ বলে আমার ধারণা।

নজরুলের যৌবনের সাথী ও কর্মজীবনের অকৃত্রিম ভক্ত ও বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'কাজী নজরুল' বইখানা পড়ে আমি নজরুল-মানসের সঠিক পরিচয় পেয়ে খুব উপকৃত হয়েছি। তিনি পরম নিষ্ঠার সহিত নজরুল-জীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য পরিবেশন করেছেন। কয়েকখানা দুষ্প্রাপ্য ছবিও বইয়ে দিয়েছেন। বন্ধুবর প্রাণতোষ বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপরিচিত নন। তিনি নিজে নিষ্ঠাবান সংগ্রামী জীবন-যাপন করেছেন; তিনি কবি রসিক ও মরমী সাহিত্য-সাধক। নজরুল-জীবনী রচনায় আমি তাঁর এই অবদান সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রামাণ্য জীবনী-সাহিত্য হিসাবে মূল্যবান মনে করি। নজরুল-চরিত্রের ও সাহিত্যের তিনি স্বকীয় স্বাধীন-চিন্তার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন নিরপেক্ষ এবং বলিষ্ঠ লেখনী-মুখে। তাঁর চেয়ে খ্যাতিমান লেখকেরা এতদূর কৃতকার্য হয়েছেন কিনা সন্দেহ।

বাংলা-সাহিত্যে এইরকম একখানা প্রামাণ্য পরিপূর্ণ নজরুল-

জীবনীর যে অভাব ছিল, তা বন্ধুবর প্রাণতোষ তাঁর বর্তমান ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও বহু পরিশ্রমে পূরণ করেছেন, এজন্য বাঙালি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ; আমিও আজ বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানাই।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

৯ই আগস্ট, ১৯৭৩

[সূত্র : ১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কাছারি-বাড়ির, খাজাঞ্চি, 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' 'রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে' 'রবিতীর্থে' 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ' 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' 'কবিতীর্থের পাঁচালী' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা সুলেখক প্রয়াত শচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রাণতোষের 'কাজী নজরুল' গ্রন্থটি পাঠ করে চিঠিটি লেখেন। চিঠিতে প্রাণতোষের নিষ্ঠা ও নজরুল-জীবনী হিসেবে 'কাজী নজরুল' গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত।

সি ১০০৫ SARADA CHARAN MUSEUM সেওড়াফুলি

১. ২১-১০-৫৫

মান্যবরেষু,

আপনার আবেদন অনুসারে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে আমাদের গ্রন্থশালায় নজরুল-প্রণীত 'রুদ্রমঙ্গল' নামক পুস্তকটি রক্ষিত আছে। যদি প্রয়োজন মনে করেন তো যে কোনদিন এখানে আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন।

নজরুলের জীবনের কয়েকটি দিন সেওড়াফুলি চ্যাটার্জীপাড়া লেনের ৺হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে অতিবাহিত হইয়াছিল। পূর্ণাঙ্গ জীবনীতে এর পরিচয় লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন বোধ করি।

আমরা হুগলি জেলার পুরাবস্তু, পুঁথি, পুস্তক, চিত্র, কুটির-শিল্পের নমুনা, লেখকদের পরিচয় ও তাঁহাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, পল্লীসঙ্গীত প্রভৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের চেষ্টা করিতেছি। এ বিষয়ে

আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করিতেছি। নমস্কারান্তে ইতি

বিনীত—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

From : President, MOHAMAYA SAHITYA MANDIR
(Regd Under Act. XXI of 1860)
P O. Serophuli
6, Chatterjee Para Lane,
Dist. Hooghly.

To : Prantosh Chottopadhya
Gopi Mohan Sinha Lane
Seoraphuli, Hooghly.

[সূত্র] প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজী নজরুল' গ্রন্থের জন্য এই তথ্যানুসন্ধান প্রয়োজন হয়েছিল।

১.

University of Karachi
DEPARTMENT OF ENGLISH

Head of Department :
Professor S. A. Ashraf
M. A. (Dacca), M. A. Ph. D. (cantab)

University of Karachi
Karachi-32
West Pakistan
Telephone : 45012/30

29. 5. 1970

প্রিয়বরেষু,

আপনার ১৩ই ফেব্রুয়ারীতে লেখা চিঠি আজ হস্তগত হল। চিঠি হাওয়াই-ডাকে পাঠাননি বলে মন্থরগতিতে এসেছে আমাদের চিরন্তন গোবৎসের মত। সুতরাং আপনার চিঠি 'হেরাল্ড্ পাবলিসিটি'র কর্তা সিরাজউদ্দীন সহেবের বদৌলতে দেরী করে এসেছে। আশা করি আমাকে দোষ দেবেন না।

নজরুলের লেখা চিঠি (মিস্ ফজিলতুন্নেসাকে) আপনি ফটোস্টাট্ করে ছাপতে পারেন কিন্তু সেই ফটোস্টাটের উপরে কোত্থেকে এ-চিঠি পেলেন তা উল্লেখ করবেন। অর্থাৎ আমার অনুমতি যে

পেয়েছেন এবং যে বই- এ এ-চিঠি মুদ্রিত হয়েছে তার উল্লেখ থাকা দরকার।

আপনি ঠিকই বলেছেন। কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব অনেক কথা বলেছেন যা মুদ্রণের অযোগ্য, কারণ, তার কোন সত্য প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি। এবং অর্ধসত্যভাষণ অথবা গুজবের এবং ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রবন্ধ-রচনা করা গবেষণাকারী এবং সমালোচকের জন্য শুধু নিন্দনীয়ই নয়, গুরুতর অপরাধ। সেইজন্যই বিশেষভাবে সাবধান হতে হয়েছে।

আপনি আপনার বইতে উক্ত গ্রন্থটির বিষয় আলোচনা করবেন শুনে খুশী হয়েছি। আশা করি আপনার বইএর এক কপি পাব। কারও মারফৎ পাঠাতে পারলে ভাল হয়।

আদাব। ইতি

সৈয়দ আলী আশরাফ

To

Pranotosh Chottopadhyay

[সূত্র ঃ] মিস্ ফজিলতুন্নেসা ছিলেন নজরুলের পরিচিত ও অন্তরঙ্গ। তৎকালে এম এ পাশ করার পর বিলাত যান। এই বিলাত গমন উপলক্ষে নজরুল 'জাগিলে 'পারুল' কি গো 'সাত ভাই চম্পা' ডাকে ?' -গানটি রচনা করেন।

আপনার বইতে অর্থাৎ 'কাজী নজরুল' ২য় খণ্ড।

২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড, ১.
কলিকাতা-৬, ফোন ঃ 353125 ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

পরমপ্রীতিভাজনেষু ভাই প্রাণতোষ,

তোমার ৩/২/৭০ তারিখের পত্র পাইয়া তোমার অসুস্থতার সংবাদে দুঃখিত ও চিন্তিত হইলাম। ঐ অসুখে খুবই সাবধানে থাকিতে হয়, তাহাই থাকিবে। সংসার ও সমাজকে তোমার এখনো অনেক-কিছু দেওয়ার আছে। ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানাই, তিনি তোমার আরোগ্য বিধান করুন, কর্মশক্তি অটুট রাখুন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় নজরুল-রচনাবলী প্রকাশে তোমার সহযোগিতা কামনা করিয়া উপযুক্ত লোককেই খুঁজিয়া লইয়াছেন এজন্যে তিনি অভিনন্দনযোগ্য। নজরুলের প্রথম সার্থক জীবনী লেখক তুমিই। নজরুলের জীবনালেখ্য চিত্রায়িত করিতে গিয়া আমি তোমার যে অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করিয়াছিলাম সেজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু যেসব বিষয়ে তুমি আমার সাহায্য কামনা করিয়াছ আমি তাহাতে অক্ষম দেখিয়া লজ্জিত ও ব্যথিত।

১, বেতার-নাটকগুলি বা তাদের গানগুলির কোন খবর আমি রাখিনা, কোথায় মিলিবে তাহাও বলিতে পারিনা। ২ বিদ্যাপতি ও সাঁপুড়ে নাটকদ্বয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কেও আমার কোন খবরই জানা নাই। ৩. আমার সাবিত্রী মহুয়া কারাগার ও সতী নাটকে নজরুলের গান-গুলি আমি দেখাইতে পারি—কোন লোক পাঠাইয়া নকল করিয়া লইতে হইবে। সতী Out of print. কারাগার Out of print. সাবিত্রী এবং মহুয়াও Out of print কোনও ছুটির দিন কোন লোক পাঠাইয়া দিও। আমি আমার ঐ বইগুলি বাহির করিয়া দিব। আমার এখানে বসিয়া নকল করিয়া লইয়া যাইবে।

আমার স্নেহাশিস জেনো।

২

শুভার্থী—

মন্মথ রায়

[সূত্র ঃ] নজরুলের জীবনালেখ্য নিয়ে একটি ডকুমেন্টারী ফিল্‌ম্‌ তৈরী হয়েছিল। এই ফিল্‌ম্‌ তৈরীতে প্রাণতোষের সর্বৈব সক্রিয় সহযোগিতার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নজরুলের জীবনালেখ্য ফিল্‌ম্‌ তৈরীর কাজে প্রাণতোষের ভূমিকা অনেকখানি।

৩.

২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড।
কলিকাতা-৬, ফোন-359977

১লা আগস্ট, ১৯৭৩

পরম প্রীতিভাজনেষু,

ভাই প্রাণতোষ, শ্রীমান রণজিৎ চক্রবর্তীর সৌজন্যে তোমার অশেষ প্রীতির নিদর্শন তোমার রচিত নজরুল জীবনী-গ্রন্থ এবং তৎপর

অতিরিক্ত শুদ্ধিপত্র যথাসময়ে পেয়ে পরম আনন্দিত হয়েছি।

পরিবর্ধিত এই সংস্করণটি নজরুল-জীবনের সম্পূর্ণ এবং সামগ্রিক আলেখ্য। প্রথম সংস্করণে যা ছিল বীজ, বর্তমান সংস্করণে তা হয়েছে মহীরুহ। নজরুলের সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গতায় গ্রন্থটি মানুষ-নজরুলের অন্তর্লোকের দ্বার উদ্ঘাটন করেছে, এবং এদিক দিয়ে এই নজরুল-জীবনীটি অনন্য। তোমার এই অমূল্য গ্রন্থে আমাকে স্থান দিয়ে ধন্য করেছ আমাকে। আজ শুধু এই কামনা করি তুমি আনন্দ-উজ্জ্বল কর্মক্ষম দীর্ঘ আয়ু লাভ করে নব নব সৃষ্টিতে উদ্ভাসিত থাকো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে কল্যাণীয়া বধূমাতার সেবা ও শুশ্রূষায় আমাদের এ-কামনা পূর্ণ হবে। জয়োস্তু। গুণানুরক্ত।

শুভার্থী

মন্মথ রায়

[সূত্র] পরিবর্ধিত এই সংস্করণটি নজরুল-জীবনের সম্পূর্ণ এবং সামগ্রিক আলেখ্য ঃ বাংলা একাঙ্ক নাটকের স্রষ্টা মন্মথ রায় প্রাণতোষের লেখা কাজী নজরুল (২য় সংস্করণ ২৫ মে, ১৯৭৩) গ্রন্থটি পড়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। গ্রন্থটি যে নজরুল-জীবনী হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান তা স্বীকার করেছেন তিনি।

রণজিৎ চক্রবর্তী হলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক জরাসন্ধের (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী) ভাইপো। ইনি নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত-বিষয়ে বই লিখেছেন।

---

২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড 　　　৩. 　　　৯ই বৈশাখ, ১৩৮১

কলিকাতা ৭০০০০৬

পরম প্রীতিভাজনেষু,

শুভ নববর্ষে বধূমাতা-সহ তুমি আমার পরম প্রীতি ও স্নেহাশিস গ্রহণ কর। কে তোমার নাম রেখেছিলেন প্রাণতোষ জানি না, কিন্তু

তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন সন্দেহ নেই। দেশ-সেবা সমাজ-সেবা এবং মানব-প্রেমে চির উদ্বুদ্ধ তুমি, সত্যই তুমি দেশ ও জাতির প্রাণতোষ। নিজের স্বার্থ পদদলিত করে দেশের স্বার্থ তুমি চিরদিন দেখেছ, এই ভগ্ন স্বাস্থ্যের মধ্যেও সে-আদর্শ এখনো প্রতিফলিত তোমার কর্মে। 'কাজী নজরুল—সাংবাদিক' রচনা সেই আদর্শেরই ফলশ্রুতি। তোমার জয় হোক্। কল্যাণীয়া বধূমাতার পরম-সেবা তোমাকে সঞ্জীবিত রাখবে আজ এই আমার কামনা এবং প্রার্থনা। নীতিশ আশাকরি আরো সুস্থ হয়ে উঠেছে! বৃষ্টি নামলে, তোমাদের একবার দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা রইল। অত্র কুশল।

শুভার্থী

মন্মথ রায়

[সূত্র] মন্মথ রায় প্রাণতোষকে ছোট-ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। প্রাণতোষের 'সাংবাদিক নজরুল' বইটি পড়ে তিনি এই চিঠিটি লেখেন। 'কল্যাণীয়া বধূমাতা' অর্থে প্রাণতোষের সহধর্মিনী সুষমা দেবীকে বোঝানো হয়েছে।

'নীতিশ' অর্থে প্রয়াত নীতিশ বাগচি। প্রাক্তন প্রশাসন অধিকারিক, রবীন্দ্রসদন, কলকাতা। দেশসেবা সমাজসেবা সংস্কৃতি-চর্চায় আদর্শ পুরুষ। হুগলি বাবুগঞ্জে বাস ছিল।

৪. ২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

৬ ১১-৭৮

পরম প্রীতিভাজনেষু,

পি জি হাসপাতালে কয়েক সপ্তাহ থেকে ভগ্ন-হৃদয় জোড়াতালি দিয়ে বিজয়া-দশমীর দিন ঘরে ফিরেছি। এখনও গৃহবন্দী।

বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশাকরি সকলে কুশলে আছ। বৌমা এবং তোমার অন্যান্য পরিজনকে আমার স্নেহাশিস জানাই। বৌমা সুস্থ থাকলে তুমিও সুস্থ থাকবে এ আশা আমার

আছে। নীতিশ কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে এসে আমাকে ফোন করেছিল। সে অনেকটা সুস্থ আছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। আমি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করলেও পূর্বের স্বাভাবিক জীবন আর ফিরে পাব বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে তোমাদের সংবাদ পেলে সুখী হব। শরৎচন্দ্রের জীবনভিত্তিক আমার লেখা একটা নাটক 'অমৃত' পত্রিকায় মাস-দুয়েকের মধ্যেই প্রকাশিত হবে জেনেছি। তোমার পড়ার সুযোগ হলে কেমন লাগে আমাকে জানাবে। তুমি আর এখন কিছু লিখছ কি?

নিয়ত শুভার্থী

শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় সমীপে — মন্মথ রায়

[সূত্র] নীতিশ—নীতিশ বাগচি (অন্যত্র আলোচনা আছে)।

নাট্যকার — টেলিফোন ৩৫-৯৯৭৭

মন্মথ রায় — ৫. — ২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড

এম, এ, বি, এল, সাম্মানিক ডিলিট্ — কলিকাতা-৭০০০০ ৬

১০/৩/৮২

পরম প্রীতি-শ্রদ্ধাভাজনেষু,

তোমার চিঠিটি এক অপ্রত্যাশিত আনন্দ। আনন্দে মাথায় ঠেকালাম। পড়া-মাত্র যেন স্মৃতির একটা রুদ্ধ জানলা খুলে গেল! নজরুল ইসলামের সেই ফিল্ম তৈরীকালে তোমার সেই আনন্দ— তোমার সেই সাহায্য।

আমি মাঝে-মাঝে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ি—এখন শ্বাস কষ্টে ভুগছি। কথা বলতেও কষ্ট হয়। আবার কমেও যায়। শুনছিলাম আজ প্রলয় হবার কথা। হলে সব একসঙ্গে চোখ বুঁজতাম। সে বেশ ভাল। কিন্তু একজন আগে যাবে একজন পরে যাবে—এতে বড় কষ্ট হয়। আমার আগে তুমি যেতে পারবে না—এই আদেশটা শুনবে। বৌমা ও তুমি স্নেহাশিস জেনো। তোমার বই বেরুচ্ছে,

জেনে খুবই খুশি হচ্ছি। নাতি-জামাইকে যা বলার বলে দিলাম। আজ এইখানেই ইতি।

তোমার

শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় সমীপে মন্মথদা

[সূত্র] মন্মথ রায় এ-চিঠিটিতে প্রাণতোষের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কথা জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজী নজরুলকে নিয়ে যে তথ্যচিত্র প্রস্তুত করেন, তাঁর প্রযোজক ছিলেন মন্মথ রায়। এই মহৎ কাজে মন্মথ রায় কাজী নজরুলের বড় ভাইয়ের ছেলে আবদুস্ সালামের মাধ্যমে প্রাণতোষের পরিচিতি ও সহায়তা লাভ করেন। প্রাণতোষ 'ধূমকেতু' পত্রিকার কপি-যোগাড় করে দেন। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা—অফিস, ৩৭ নং হ্যারিসন রোডের (মহাত্মা গান্ধী রোড) দোতলায় উত্তর-কোণের ঘরে (এখানে নজরুল 'লাঙল' 'গণবাণী' প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন) মন্মথ রায়কে নিয়ে যান এবং তথ্যচিত্রের ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন। এখানে সেই 'ফিলমের' কথা এসেছে।

'বৌমা'- সুষমা দেবী।

১.

Central Board for Development of Bengai
84, Shantinagor, Dacca-2
24 10.66

প্রীতিভাজনেষু,

নজরুলের 'ফণি-মনসা' কাব্যের 'ইন্দু-প্রয়াণ' কবিতাটির ২৪শ চরণ কলিকাতা নলেজ-হোমের প্রকাশিত সংস্করণে ছাপা আছে এরূপঃ 'এবার হে কবি কবির পূর্ণ' এ চির কবি পুরে!' 'এ চির কবি' পর্বে পাঁচ মাত্রা—ছয় মাত্রা নয়, কাজেই এখানে ছন্দঃপতন ঘটেছে। তাছাড়া, এ-পর্বটার কোনো অর্থই করা যায় না। তাই আমার মনে হচ্ছে, এখানে মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। আপনি আপনার 'ফণি-মনসা' দেখে এ

চরণটা আমাকে সত্বর লিখে পাঠাবেন। আমি এ-ফর্মাটার Print order দিতে গিয়ে এ-ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম।

আপনার প্রেরিত প্যাকেট আজও পাইনি। একসঙ্গে সব লেখা পাঠিয়েই এ-ঝামেলা ঘটিয়েছেন। 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'। সত্বর কপি করিয়ে পাঠাবেন।

—আবদুল কাদির

[সূত্র] কমু মুজফ্ফর আহ্‌মদের শ্বশুর আবদুল কাদির একজন বিশিষ্ট লেখক ও নজরুল-গবেষক। 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'ইন্দু-প্রয়াণ' কবিতার একটি চরণ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে তিনি প্রাণতোষকে চিঠিটি লিখেছেন। প্রাণতোষের কাছে নজরুলের প্রায় সমস্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ আছে। এটা জেনেই কাদির-সাহেবের এই প্রার্থনা।

১

গোবরডাঙ্গা
২৪-পরগণা
৮/৮/৬৯

পরম পূজনীয়
দাদা,

আপনার স্নেহমাখা পত্র পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম ঐ সঙ্গে একটু লজ্জাও পেলাম। আপনার কাছ থেকে আসার পর আমারই আগে চিঠি দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঘাড়ের একটা ব্যথার দরুণ দিয়ে উঠতে পারিনি। ব্যথাটা এখনও যায়নি তবে কমেছে।

সেদিন আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি তা' সকলের পক্ষেই অমূল্য সম্পদ—একমাত্র 'জেলের গান' ছাড়া সব কটারই স্বরলিপি করে ফেলেছি। বাদবাকী কয়েকটা অন্যগানের (অবশ্যই উদ্দীপক) স্বরলিপি করে আপনাকে Complete list জানাব। আপনি একটা ভূমিকা লিখে দেবেন। এমাসে একদিন পান্নালাল ঘোষের (বাবু) কাছে গিয়েছিলাম তার খুব ইচ্ছে আমার সঙ্গে আপনার ওখানে যাবে। আমার ইচ্ছে আছে আগামী ১৬ই আগস্ট শনিবার বাবুকে নিয়ে

আপনার কাছে যাব। আপনার বউমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না — সামনের পূজোর সময় তাঁকে নিয়ে যাব। বর্তমানে তিনি চোখ নিয়ে খুব ভুগছেন।

আপনার শরীরের জন্য খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি। একটু সাবধানে থাকবেন—যখন ভাগ্যক্রমে এতদিন পরে আপনাকে পেয়েছি —আরও কিছুদিন আপনার স্নেহ ভোগ করতে চাই। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানবেন, বৌদিকেও জানাবেন। ছোটদের স্নেহাশিস জানাবেন। ইতি—

নিতাই ঘটক

[সূত্র ঃ] নিতাই ঘটক প্রখ্যাত নজরুল-স্বরলিপিকার। তিনি জগৎ ঘটকের কনিষ্ঠ। তিনি এবং তাঁর দাদা কাজী নজরুলের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। নজরুলের উদ্দীপক ও দেশপ্রেমমূলক বহু গান তিনি প্রাণতোষের গলায় শুনে নেন। সেই সুর শুনে তিনি নোটেশন করেন এবং নজরুল-গীতির স্বরলিপি প্রকাশ করেন। স্বরলিপি-পুস্তকটির ভূমিকা লিখে দেন প্রাণতোষ।

নজরুল একাডেমী
৩৫৫, মাউটার সারকুলার রোড
১ ঢাকা-২। ২২. ১ ৭৫

শ্রদ্ধেয় প্রাণতোষদা,

আপনার চিঠি দিতে দেরী দেখে বৌদির কাছে চিঠি দেব ভাবছিলাম। এমন সময় আপনার পোস্টকার্ড এল ৭/১/৭৪ তারিখে লেখা। জানতে পারলাম এর আগেও আপনি একটা চিঠি দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে-চিঠি আমাদের হাতে আসেনি। কি লিখেছিলেন সে চিঠিতে জানার আগ্রহ ছিল। কিন্তু সে-কথা কি আর লিখতে পারবেন আপনি!

আমার সন্দেহ হচ্ছিল আবার বুঝি আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন ? সেজন্যই বৌদির কাছে চিঠি লিখব ভাবছিলাম। কিন্তু স্বস্তি পেলাম কার্ডটি পেয়ে।

আমাদের পত্রিকা পেয়েছেন জেনে খুশী হলাম। শতায়ু কেন কামনা করলেন? বর্তমানে জীবন এতটা দুর্বহ হ'য়ে উঠেছে যে এটাকে টেনে আর লম্বা করার সাধ নেই। মানুষের মধ্যে বাস করেও মানুষের মধ্যে আছি এই কথা ভাবতে কুণ্ঠা জাগে। কেননা সেটা হয়ত সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণ করা যাবে না। আপনার চিঠি নজরুল-একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশ করার চেষ্টা করব।

আপনি আপনার গ্রন্থে যে সব তথ্য প্রকাশ করেছেন সেগুলো ছাড়া নতুন কোন তথ্য কি আপনার হাতে আর আছে? নজরুলের অন্য কোন ফটো? হুগলীতে যে-বাড়ীতে নজরুল থাকতেন সে-বাড়ীর ফটোটা আপনার গ্রন্থে থাকলে বোধহয় ভালো হত।

আমার বার বার মনে হয় শম্ভুরায়ের চিঠিগুলো আপনার চেষ্টা ছাড়া কোনদিন প্রকাশ হোত কিনা। আপনার গ্রন্থ থেকেই শম্ভুরায়ের চিঠি এখন সব গ্রন্থে ঠাঁই পাচ্ছে। এই চিঠির যে অপরিসীম মূল্য তার দাম ত' আপনাকেই দিতে হবে। নজরুল-জীবনের যে অধ্যায়-গুলো আপনি লিখেছেন সে-গুলোর আর কে লিখতে পারত! আপনার বই-ই প্রমাণ করে শুধু কবি নয়—মানুষ নজরুল এক অতিমানুষ। আমরা কি সত্যিই তার মূল্য দিতে পেরেছি?

আচ্ছা প্রাণতোষদা, আপনি আফসারউদ্দীন সাহেবকে চেনেন? সাহিত্যিক আফসারউদ্দীন? আপনার আবৃত্তির প্রশংসা করছিলেন তিনি। একদিন নাকি তাঁকে দরোজা-আটকে কবিতা আবৃত্তি শুনিয়েছিলেন?

চিঠি দিয়ে আপনাদের সংবাদ জানান। আপনার সুস্থ শরীর কামনা করি। সবাইকে সশ্রদ্ধ নমস্কার দিই।

স্নেহাস্পদ

সাহাবুদ্দীন আহমদ

[সূত্র] বিশিষ্ট নজরুল-গবেষক ও সুসাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহ্মদ বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের

'কাজী নজরুল' গ্রন্থটি পড়ে প্রশংসামূলক এই চিঠিটি তিনি লিখেছেন। প্রাণতোষের সঙ্গে শাহাবুদ্দীন-সাহেবের ঘনিষ্ঠতা এবং নজরুল-গবেষণায় প্রাণতোষের আন্তরিকতা এখানে স্বীকৃত। শম্ভুরায় —নজরুল যখন বাঙালী পল্টনে, শম্ভু রায়ও বাঙালী পল্টনে ছিলেন। [অন্য পত্রে বিস্তৃত আলোচনা আছে।]

MINERVA THEATRE PHONE : 55-4489

১. Date 13. 9. 66

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার অসুস্থতার সংবাদে আমরা সবাই বিশেষ চিন্তিত এবং আশা করছি খুব শীঘ্র আরোগ্য লাভ ক'রে আপনি পুনরায় গণনাট্য-আন্দোলনকে আপনার উপদেশ ও নেতৃত্ব দিয়ে সাহায্য করবেন।

আপনার 'বাশিল-দুর্গ' কবিতা আমাদের সকলের ভাল লেগেছে, তবে 'প্রসেনিয়মে' কি ক'রে ছাপি সেই উপায় হাতড়াচ্ছি। দেখা যাক্।

'প্রসেনিয়ম' আপনার ভাল লেগেছে জেনে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি। 'অজেয় ভিয়েৎনাম'—নাটক দেখতে আপনাকে সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আপনি আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন। ইতি সেবক

উৎপল দত্ত

পুঃ আপনার চিঠি বড় বিলম্বে পেয়েছি। আপনি লিখেছেন ৫ তারিখে আর পেলাম আজ।

[সূত্র] নট, নাট্যকার, অভিনেতা উৎপল দত্ত প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে এই চিঠি দেন ১৯৬৬ সালে। এই সময় প্রাণতোষবাবু প্রথমবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে সবে সামাল দিয়েছেন। তাই উৎপল বাবু তাঁর আরোগ্য কামনা করেছেন এবং যেহেতু প্রাণতোষ অল ইণ্ডিয়া থিয়েটারিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁর নেতৃত্ব সে কারণে প্রার্থনা করেছেন। 'প্রসেনিয়ম' পি. এল. টি-র তরফে

জোছন দস্তিদার সম্পাদিত পত্রিকা। এই পত্রিকায় প্রাণতোষের 'বাস্তিল দুর্গ' নাটকটি ছাপা হয়। 'অজেয় ভিয়েৎনাম' পি. এল. টি-র নাটক, উৎপলবাবুর রচিত ও অভিনীত।

Residence : 15, Bechulal Road,
Block A, Flat-1, Calcutta-14 ২. 15. 3. 69

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

প্রাণতোষদা, প্রথমেই আপনাকে আমার নববর্ষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। আপনার 31. 3. 69 তারিখের চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি এবং ও-কাজটাও আমাদের যতটুকু করবার তা করা হয়েছে। আশাকরি কোন অসুবিধা হবে না। আপনি তো শান্তিদার মারফৎই তার খবর জানতে পারবেন।

'একসাথে' আপনার নামে প্রতিবারই পাঠান হয়। ফাল্গুন সংখ্যা পাননি কেন জানিনা। নিশ্চয়ই পোস্ট-অফিসের গোলমাল। যা' হক আর-একখানা পাঠালাম। আমার উপন্যাসখানা আপনার ভালো লাগছে জেনে আনন্দিত হলাম। বাস্তবিকই জেলখানায় বসে উপন্যাসটি লিখেছিলাম।

আমাদের বাড়ীর ঠিকানা দিলাম। আমরা সকলে ভাল আছি। বাবলু বি. এ, অনার্সসহ পাস করে এখন একসঙ্গে এম, এ, ও ল' পড়ছে। সময় পেলে আসবেন একবার। রেণুরা এসেছিল ক'দিন আগে। আমরাও গিয়েছিলাম দীপুর জন্মদিনে। আপনি ও বৌদি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানবেন। ছোটদের স্নেহ জানাবেন। ইতি—

আপনার বোন, কনক

[সূত্র] কনক মুখোপাধ্যায়। পুত্র—বাবলু। (৭ পৃ. দ্রষ্টব্য)

নন্দন ১.
২, সূর্য সেন স্ট্রীট কলিকাতা-১২ তারিখ ৪. ৬. ৬৯

প্রিয় কমরেড,

আপনার ২/৬ তারিখের চিঠি আজ ৪/৬ তারিখে পেলাম।

রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানে ওরা তারিখ ভুল লিখেছে। সেটা বুঝে নেওয়া উচিৎ ছিল—কারণ কাগজে সংবাদ এবং বিজ্ঞাপন বের হয়েছিল। স্মারক পুস্তিকায় প্রাণতোষবাবুর লেখা ছাপা হয়েছে। কিন্তু Complementary Copy আমরাও পাইনি। সঙ্গে সঙ্গে সব বিক্রি হয়ে গেছে। পুস্তিকাটি খুবই ভাল হয়েছে। প্রাণতোষবাবু কপি চেয়ে চিঠি দিয়ে ভাল করেছেন। তাহলে পেতে পারেন, আমার জন্যে নীতিশ বাগচি কয়েকটি কপি রেখে দিয়েছেন।

প্রাণতোষবাবুকে কাজে লাগাতে চাই বলেই জন্মোৎসব কমিটিতে তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিলাম ; স্মারক-পুস্তিকায় লেখার জন্যও তাঁর নাম আমরাই দিয়েছিলাম। কারণ আমরা জানি যথার্থ বিপ্লবীর দৃষ্টিতে নজরুলকে উপস্থিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব, বিশেষ করে যারা অধ্যাত্মিকতায় নজরুলকে আড়াল করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে।

প্রাণতোষবাবুকে আমরা নজরুল-একাডেমির সদস্য করে নিয়েছি এবং সহ-সভাপতি করেছি। ৭ই জুনের অনুষ্ঠানে তাঁর নামে চিঠি যাবে। কার্ড মাত্র আজ ছাপা হয়ে এসেছে। তাঁকে আসতে অনুরোধ করেছি বলবেন। বিকাল ৬ টায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। প্রবর্তক ও একাডেমি দুটো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে তাঁর অসুবিধা হবেনা। ইতি—

কল্পতরু সেনগুপ্ত

[সূত্র] বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নজরুল-গবেষক শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত এই চিঠিটি প্রাণতোষের ভাই কৃষক-নেতা পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন। চিঠিটিতে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নজরুলের চিত্রায়নে প্রাণতোষের যথাযোগ্যতা কল্পতরুবাবু স্বীকার করেছেন।

'একাডেমি' বলতে কলকাতা নজরুল-একাডেমির কথা বলা হয়েছে। ১৯৬৯ সালে স্থাপিত। প্রাণতোষ একাডেমির সহ-সভাপতি ছিলেন। 'স্মারক পত্রিকাটি' একাডেমির স্মারক পত্রিকা।

১.

পরম শ্রদ্ধেয়,

প্রাণতোষদা, আজ অলককে লেখা চিঠিখানি পড়ে মনটা এত খারাপ হয়ে গেল, লিখে আর সেকথা কি জানাবো ?

আমার আগের মতো চলার শক্তি (মনের শক্তি নয়) থাকলে এক্ষুনি অলকের সঙ্গে চলে যেতাম আপনার কাছে। আমার বড়ো-দাদা নেই। তাতে আজ আমার দুঃখ নেই, কিন্তু কিছু মানুষ দাদা-কাকা ভাই-বোন-মা ইত্যাদি আমি পেয়েছি। অবশ্য সংখ্যায় সেগুলি খুবই কম। তা হোক্, নাম ধামের মোহ বা বালাই আমার নেইও, আর সে গুণও নেই। না থাক্। এই ছোট্ট ঘরের কোণে বসে একটু ভালোবাসা স্নেহ শ্রদ্ধা প্রেম এই নিয়েই যেন যেতে পারি।

আলো আর আনন্দের সাধনা যেন তাতেই সফল হয়। তবে জয়ী হতে পারবো কি ? বড় ভয় এই জগৎকে, সমাজকে ?

দাদা, আজ অলকের হাত দিয়ে (আপনার সামান্য যদি কাজ হয়) ১০০ টাকা পাঠালাম। যেন অন্যকিছু মনে করবেন না। আমার সাধ্য কিছুই নেই। তবু যেটুকু পারি। সাধ অনেক কিন্তু সাধ্য কিছুই নেই। ছোট বোনের এই অনুরোধ রাখবেন।

অলককে আপনি দেখেছেন, বুঝেছেন কাজেই তার কাছে আশার্কির সংকোচের কিছু নেই। আর-কেউ যেন না জানে। অলক সম্বন্ধে আপনার মতো মানুষের কাছে আর-কিছু বলার নেই।

সে-রকম বুঝলে আমি তাকে আপনার কাছে নিয়ে যেতাম না, বা পাঠাতাম না।

আমাদের বর্ষপূর্তি ও গুণীজন সংবর্ধনায় যদি আসতে পারেন বৌদিকে 'গৌরীকে নিয়ে' তাহলে কি হবে সেকথা আর লিখে জানাবার দরকার আছে কি ?

শুভ্রা, অমল গত শনিবার এসে রবিবার বিকেলে গেছে। কথাবার্তা-আলোচনা সবই হয়েছে। ওরাও ঐদিন আসছে। শুভ্রা গানও গাইছে। অলকের কাছে সব শুনবেন। শরীর বড়ো বাগড়া

দিচ্ছে কাজে। প্রেসার হয়েছে এর ওপর। হাত পা ফুলছে। বিশ্রী লাগে রোগের কথা বলতে।

বৌদি ও আপনি প্রণাম ও শ্রদ্ধা নেবেন। গৌরীকে স্নেহাশিস।

আপনার স্নেহধন্যা বোন,
—গৌরী

[সূত্র] প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসুর প্রথমা স্ত্রী গৌরী বসু প্রাণতোষকে নিজের দাদার মতো ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন।

গৌরী দেবী প্রাণতোষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। একবার প্রাণতোষের শেওড়াফুলির বাড়িতে (১. গোপীমোহন সিংহ লেন, শেওড়াফুলি- বর্তমান বাসস্থান) এসে তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নেই। এ দেখে ব্যথিত হলেন। মুখ ফুটে বলেই ফেললেন মনের কথা, দাদা, আলোর লোক অন্ধকারে থাকবে কেন ? এই ঘটনার কিছু দিন পরেই তিনি একশ টাকা প্রাণতোষকে পাঠিয়ে দিলেন অলক মিত্রের হাত দিয়ে। পরে আরও একশ। অলক মিত্র প্রখ্যাত গায়ক শ্যামল মিত্রের ভাইপো। অমল অর্থে অমল মিত্র। চন্দননগরের। নজরুলের গান নিয়ে গবেষণা-রত। নজরুলের গানের ওপর বইও লিখেছেন। শুভ্রা অমল মিত্রের স্ত্রী।

গৌরী বসু তাঁর 'ফাল্গুনী' ১৯, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড নৈহাটী, সঙ্গীত-সংস্থার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে গুণীজন-সংবর্ধনায় প্রাণতোষকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

বৌদি প্রাণতোষের স্ত্রী সুষমা দেবী এবং গৌরী—তাঁর বড়োমেয়ে।

২.

নৈহাটী

প্রাণতোষদা,

নজরুল-জীবনী পড়ে মন যন্ত্রণায়ভয়ানক ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। আমার মত অবস্থার সঙ্গে অনেক বিষয়েই খাপ খেয়ে যায় বলে, বোধহয়

এতটা বেশী। অনেক কথা বলার আছে আপনাকে। প্রথম কথা, কবে আপনি আমাকে একদিন নজরুল-দম্পতির কাছে নিয়ে যাচ্ছেন? দ্বিতীয়ত, মানুষকে এককথায় বিচার করা এত সহজ কি? সত্যি 'এই মানুষ' কি জীবনে আর ভাল হবেন না? কোন উপায় নেই? আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি কিন্তু খুব শীঘ্রই একদিন আপনার সঙ্গে ওদের দেখতে যাব।

রবিবার 'ও' যাচ্ছে। আমারও খুব যাওয়ার ইচ্ছা আছে কিন্তু সম্ভব হবে না। প্রণাম জানবেন। বৌদিকে কোটী কোটী প্রণাম। বাচ্চাদের চুমা গৌরী

[সূত্র] প্রাণতোষের 'কাজী নজরুল' গ্রন্থটি পড়ে গৌরী বসু লেখককে এই পত্রটি লেখেন। 'নজরুল-স্মৃতি' বলতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর সহধর্মিণী প্রমীলা দেবীর কথা বলা হয়েছে। 'এই মানুষ' বলতে কাজী নজরুলকে বোঝানো হয়েছে। কবি স্থবির হয়ে গিয়েছিলেন। সেই স্থবির অবস্থা থেকে তিনি আর ভাল হয়ে উঠবেন কি না, এ আকুতি গৌরী বসুর বর্তমান পত্রে প্রকাশিত। 'ও' হলেন সাহিত্যিক সমরেশ বসু! □

"নজরুলকে দিয়ে অনেক তত্ত্ব ও তথ্যহীন গবেষণায় বর্তমান বাজারটি ছেয়ে গেছে। গবেষণায় কে রীতিমত খাটতে হয় এ কথাটা কেন বর্তমান গবেষকদের কাছে অমূলক ব্যাপার।

...'থোর বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোর' বলে একটা কথা আছে। বর্তমান গবেষকদের বেশির ভাগই এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। লেখার ঢঙে উপন্যাসের সামিল হচ্ছে নজরুলের জীবন-বৃত্তান্ত. কিন্তু তথ্যাবিষ্ট দলিল পাওয়া যাচ্ছে না তাতে, অথচ বড়-বড় চমক সৃষ্টিকারী বিজ্ঞাপন বার হচ্ছে 'গবেষণামূলক পুস্তক' বিভাগে. চলেছে ভাবী-কালের গবেষকদের পথ ভ্রান্ত করার প্রয়াস।"

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। কাজী নজরুল। তৃতীয় পর্ব। পৃ ৫৮



পরিশিষ্ট—১

□ জীবনী পঞ্জী □

সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯০৫ ॥ জন্ম। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর শহরে।

ডিসেম্বর, ১৯০৫ ॥ প্রতাপপুর, হুগলি। মামা সারকেল ইনসপেক্টর তারিণীচরণ ভট্টাচার্যের আশ্রয়ে।

১৯১১ ॥ প্রাইমারী মিশনারী স্কুলে লেখাপড়া শুরু।

১৩ এপ্রিল, ১৯২১ ॥ 'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে' গোলামখানার শিক্ষা ত্যাগ। হুগলি বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিপ্লবাচার্য জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপ। হিন্দুস্থান রিপাবলিক আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ।

শেষভাগ, ১৯২১ ॥ কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ। হুগলি বিদ্যামন্দিরে।

১৯২১-২২ ॥ যুগান্তর দল। ১৯২৩ ॥ রিভোল্ড গ্রুপ।

২রা মে, ১৯২৫ ॥ ফরিদপুর সম্মেলন। সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস। নজরুলের সঙ্গে প্রাণতোষ গেলেন সম্মেলনে।

১৯২৬ ॥ সাহিত্য-সম্মেলন, ফরিদপুরে।

১৯২৭। কলকাতার কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ। সংঘটক বিজয় মোদক। সুষমা মিত্র, ইন্দ্রসুধা ঘোষ, সুশীতল রায় চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ।

পৌষ, ১৯৩১ ॥ চাঁইবাসায় গ্রেপ্তার হলেন প্রাণতোষ। তাঁর ভাই পরিতোষও গ্রেপ্তার হলেন। প্রথমে ১৪, ইলিসিয়াম রো, পরে বালিগঞ্জ থানায়।

১৯৩২ ॥ স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক আলফ্রেড ওয়াটসন ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন। তাঁকে শাস্তি দিতে গুলি করা। এই অভিযানে ছিলেন প্রাণতোষ, বিজয় মোদক, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, বীরেন রায় প্রমুখ। ওয়াটসন আহত

হলেন কিন্তু বেঁচে গেলেন। তিনি বিলেতে চলে গেলেন। অন্যান্যদের সাথে গ্রেপ্তার হলেন প্রাণতোষ। আলিপুর জেলে চালান দেওয়া হল তাঁকে।

১৯৩৮ ॥ প্রথমে আলিপুর জেল, পরে হুগলি জেল ও হুগলি চুঁচুড়ায় নজরবন্দী থাকার পর মুক্তি পেলেন। কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ।

১৯৩৯ ॥ দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকায় 'রবিবাসরীয়' ও ছোটদের পাতায় সম্পাদক হলেন।

১৯৪২ ॥ 'নবযুগ' পত্রিকায় যোগদান। প্রধান সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম। এই পত্রিকায় Part time কাজ করতেন। রবিবাসরীয় ও ছোটদের বিভাগের সম্পাদনা। আর কাজ করতেন নলিনীরঞ্জন সরকারের 'স্বরাজ' পত্রিকায়।

১৯৪২ ॥ বিবাহ। পত্নী ঢাকা-নিবাসী নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সুষমা দেবী। সংসারে অনটন। নৈহাটীর বাসন্তী কেবিনে আড্ডা। নৈহাটী কমার্শিয়াল কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপনা। বিষয় রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ। আট মাস অধ্যাপনা করেন। এরপর নীরদ মুখার্জির রেডিয়্যান্ট প্রসেস-এ পাবলিক লিয়াজোঁ অফিসারের কাজ।

২৫শে মে, ১৯৫৫ ॥ 'কাজী নজরুল' প্রকাশিত। ভারতের প্রথম প্রামাণ্য নজরুল-জীবনী গ্রন্থ। প্রকাশক—দেবদত্ত এণ্ড কোং।

১৯৬৬ ॥ করোনারী থ্রম্বসিসে আক্রান্ত ও গুরুতর অসুস্থ।

১৯৭৮ ॥ 'সাংবাদিক নজরুল' প্রকাশিত। প্রকাশক ভার্সেটাইলস্।

১৯৮১ ॥ চুরুলিয়া নজরুল-একাডেমী পুরস্কার লাভ। নজরুল-চর্চার পথিকৃৎ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংবর্ধনা।

১৯৮৩ ॥ কাজী নজরুল (২য় পর্ব) প্রকাশিত। প্রকাশক—হুগলি জিলা পরিষদ।

১৯৮৯ ॥ কাজী নজরুল (৩য় পর্ব) প্রকাশিত। প্রকাশক—হুগলি জেলা পরিষদ। —বু. ব.

পরিশিষ্ট—২

☐ *প্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকা* ☐

১) কাজী নজরুল (১ম পর্ব)। প্রথম প্রকাশ ২৬ মে, ১৯৫৫। প্রকাশক দেবদত্ত এণ্ড কোং। ৪/৬৮, চিত্তরঞ্জন কলোনী। কলিকাতা-১২। দ্বিতীয় সংস্করণ ২৫ মে, ১৯৭৩। প্রকাশক— ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ। তৃতীয় সংস্করণ- প্রকাশক এ. মুখার্জি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ।

২) সাংবাদিক নজরুল। মার্চ, ১৯৭৮। প্রকাশক দি-ভার্সে টাইলস্। ২ বি, শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলি-৭৩।

৩) কাজী নজরুল (২য় পর্ব)। ৫ আগস্ট, ১৯৮৩। প্রকাশক— হুগলি জিলা-পরিষদ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থানু-কূল্যে প্রকাশিত।

৪) প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। ১ মে, ১৯৮৮।

৫) কাজী নজরুল (৩য় পর্ব)। ৫ আগস্ট, ১৯৮৯। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট—৩

☐ *অপ্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকা* ☐

১) সংগ্রামের পথে পথে। প্রবন্ধ গ্রন্থ

২) জাগো নারী জাগো, অগ্নিশিখা। পত্রসাহিত্য

৩) মুদ্রণ-শিল্পের জয়যাত্রা। প্রবন্ধ গ্রন্থ

৪) যাকে দেখেছিলাম। কাব্যগ্রন্থ। ৫) অ-মৃত নজরুল। কাব্যগ্রন্থ

৬) যুগের ডাক। নাটিকা ৭) তুমি আর আমি। ঐ ৮) রূপনন্দা। ঐ

৯) পথ চলতে ঘাসের ফুল। কাব্যগ্রন্থ।



পরিশিষ্ট—৪

□ প্রাণতোষ-সংগ্রহশালায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-তালিকা □

[প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাটি অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য, প্রামাণিক ও সাহিত্যের নানাদিকের মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ অপরিহার্য গ্রন্থসমূহ সংরক্ষিত। এখানে যেমন আছে ১৮০১ সালে শ্রীরামপুর মিশন-প্রেসে ছাপা বই তেমনি আছে The United States Information Service-এর ছাপা বই, আছে কাজী নজরুল-স্বাক্ষরিত প্রাণতোষকে-প্রদত্ত তাঁর কিছু কাব্যগ্রন্থও। তাঁর এই বিশাল সংগ্রহশালার পূর্ণ তালিকা স্থানের অভাবে দেওয়া সম্ভব হল না। নিচে মাত্র কয়েকটি গ্রন্থের বিবরণ-সহ উল্লেখ করা হল।]

১) রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। রামরাম বসু। শ্রীরামপুর মিশন-প্রেস. ১৮০১। ১ টাকা

২) রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার। কলি, ১৮৫৬। ১ টাকা প্রতিখণ্ড

৩) বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। কলি, ১২৯২।--

৪) অক্ষয়-সাহিত্য-সম্ভার, ১ম খণ্ড। কালিদাস নাগ, সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাব. কোং। ৭ শ্রাবন ১৮৮৭ শক.। ১৫ টাকা

৫) ঐ ২য় খণ্ড। ৭ শ্রাবণ ১৮৮৮ শক। ১৫ টাকা

৬) বঙ্গের রত্নমালা, ২য় ভাগ। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। টি. এস. ব্যানার্জি এণ্ড কোং। ৩য় সং, ১৩২১। ১২ আনা

৭) যুগবার্ত্তা। অরবিন্দ ঘোষ। প্রবর্ত্তক পাব. হাউস. চন্দননগর। ১৩২৭

৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। শিশির পাব. হাউস। ফাল্গুন. ১৩২৭। ২ টাকা

৯) বিদ্যাসাগর। বিহারীলাল সরকার। ৪র্থ সং, ১৩২১।

১০) রাজমোহনের স্ত্রী (বঙ্কিমচন্দ্র)। সজনীকান্ত দাস, অনু.

ইস্টার্ণ পাবলিসার্স সিণ্ডিকেট। ভাদ্র, ১৩১৫। ২টাকা।

১১) Tagore & America. J. L. Dees. The United States Information Service ১৯৬১।

১২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত। কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জী এণ্ড কোং। ৫ম সং, ১৯২৫। ৩ টাকা।

*১৩) গুল-বাগিচা। নজরুল ইসলাম। দি গ্রেট ইস্টার্ণ লাইব্রেরি। ১৩৪০।

*১৪) সিন্ধু-হিন্দোল। ,, । ডি এম. লাইব্রেরী। ১৩৪০।

*১৫) ফণি-মনসা। ,, । বর্মণ পাব হাউস। শ্রাবণ, ১৩৩৪। পাঁচ সিকা

*১৬) জিঞ্জীর। ,, । ডি. এম লাইব্রেরি। ১৩৩৫ দেড় টাকা।

*১৭) চিত্তনামা। ,, । ,, শ্রাবণ, ১৩৩২। বারো আনা।

*১৮) চক্রবাক। ,, । ,, ১৩৩৬। দেড়টাকা

*১৯) ছায়ানট। ,, । ,, বর্মণ পাব. হাউস। ১৩৩২। পাঁচ সিকা।

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি কবি-কর্তৃক সাক্ষরিত।

সংকলক ঃ বসুমিত্র মজুমদার। □

"১৯৬৬ সালে, জুলাই মাসে, কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদকে পৃষ্ঠপোষক করে প্রথম 'পশ্চিমবঙ্গ নজরুল অকাদেমি' গঠিত হয়। সভাপতি মুখ্য বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র, কোষাধ্যক্ষ —বিচারপতি এস. এ. মাসুদ, সাধারণ সম্পাদক—কল্পতরু সেনগুপ্ত। সদস্য - কবি দুর্গাদাস সরকার, দিলীপ চক্রবর্তী, আবুল কাশেম রহিমুদ্দিন, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, জ্ঞান দত্ত, মুকুলচন্দ্র চক্রবর্তী, অমিয়কুমার হাটী প্রমুখ।

কাজী নজরুলকে প্রথম রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা-দানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে রাজ্য-সরকার কর্তৃক একটি উপদেষ্টা-কমিটি গঠন করা হয়, এগারোজন সদস্য নিয়ে। সদস্যগণ হলেন— পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, সুধী প্রধান, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কাজী অনিরুদ্ধ, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, সন্তোষ সেনগুপ্ত, নীতিশ বাগচি। আহ্বায়ক—কল্পতরু সেনগুপ্ত। পুস্তিকা-সম্পাদক—অমিয়কুমার সেন।

নজরুল-রচনাবলী প্রকাশের জন্য একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুশীলকুমার গুপ্ত, নীতিশ বাগচি প্রমুখ। মুজফ্ফর আহ্মদের পরামর্শে এই সম্পাদকমণ্ডলী তিনখণ্ড পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলেন এবং সরকার থেকে কপি-রাইটের সমস্যা সম্পর্কেও একটা উপায় বার করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙে দেওয়াতে, রচনাবলী প্রকাশ সম্ভব হয় না এবং সরকারী-দপ্তর থেকে পাণ্ডুলিপি খোয়া যায়।"

—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। কাজী নজরুল। ৩য় পর্ব। পৃঃ ৪২-৪৪



পরিশিষ্ট—৫

☐ সম্মানপত্র সংবর্ধনা পুরস্কার ☐

১৩৭৬, ২৭ মাঘ ।। সেওড়াফুলি-নিবাসী দিলীপ্রভাশংকর রায় কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানপত্রের অংশ-বিশেষ ঃ

'সত্য যাহা নিত্য যাহা, যাহা চিরন্তন
মনের মন্দিরে তারে সদা করেছ পালন।
প্রণমি তোমারে বারংবার হে চারণ-কবি
অবিশ্বাসের বিশ্বমাঝে আঁকিয়াছ বিশ্বাসের ছবি।'

১৩৭৭, ২৭ ভাদ্র ।। শেওড়াফুলি 'মধুচক্র সাহিত্য-সংসদের' পক্ষ হতে অগ্নিবীণার চিত্রসহ সম্মানপত্র প্রদান করেন সংসদ-প্রতিষ্ঠাতা

সলিলচন্দ্র ঘোষ। সম্মানপত্রটির উপরে প্রাণতোষকে 'অগ্নিমন্ত্রী স্বদেশপ্রাণ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লিখিত বাণীর কিছু অংশ ঃ

'হে বিপ্লবী বীর, কবে নবরাগে অরুণ-প্রভাতে
বার হয়ে অগ্নিতেজে পরিপূর্ণ মধ্যাহ্নের জ্বালা
দীপ্ত শিরে করেছ স্বীকার! কত সর্বনাশা খেলা
খেলেছিলে মাতৃব্রতী!
বিদ্রোহী-কবির সাথে
বজ্রকণ্ঠে বজ্রবাণী করছ ঘোষণা। দুই হাতে
বিদ্রোহের, কল্যাণের অভ্রভেদী জয়ধ্বজা তোলা।
নিপীড়িত মানুষের দিকে হৃদয়ের দ্বার খোলা।…'

১৩৭৯॥ সেওড়াফুলির নাট্য-সংস্থা নাট্যম তাঁকে 'স্বদেশপ্রাণ সংগ্রামী' সম্বোধন করে যে সম্মানপত্র প্রদান করেন তার কটি কথা ঃ

'…বিদ্রোহী কবির দোসর আর সোদর হয়ে একদিন বাংলার দিকে দিকে নতুন জীবনের বাণী শুনিয়েছিল। বাণীর সে সাধনা আজও শেষ হয়নি। বয়োভার তোমাকে ক্লান্ত করেনি। তোমার তারুণ্যের সে সাধনার ইতিকথা একালের হৃদয়ে আশা আর উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে।…'

সম্মানপত্রটি পুস্তকাকারে রচিত।

তাঁর ৭২ বৎসর জন্মদিনে সেওড়াফুলির কিছু গুণমুগ্ধ অনুরাগী যে সম্মানপত্র দিয়েছেন তাতে লেখা হয় ঃ

'হে প্রাচীন বটবৃক্ষ, আমরা যেন বর্তমান শতাব্দী অতিক্রম করি তোমার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। আজকের দিনে এই আমাদের প্রার্থনা।…'

—সম্মানপত্রটিতে সামান্য শৈল্পিক ছোঁয়া আছে।

১৯৭২, ১ জুলাই॥ শ্রীরামপুর সংগীত-ভবনের পক্ষ হতে তাঁকে যে সংবর্ধনা ও সম্মানপত্র দেওয়া হয়, তাতে লেখা হয়েছে ঃ

'হে বিদ্রোহী, হে ন্যায়ের পথিকৃত, তোমারে জানাই আমাদের অকৃত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।…'

১৩৮৪, ১৫ আশ্বিন ।। সেওড়াফুলির বাসিন্দাগণ-প্রদত্ত সম্মানপত্রে তাঁকে 'যুগসংক্রান্তির বিপ্লবী' নামে অভিহিত করেন।

১৯৭৮ ।। সেওড়াফুলি চারাবাগানের ইয়ুথ কয়্যার সম্মানপত্রে লিখলেন ঃ

' বরেণ্য, বাণী-সাধনার তুমি এক সিদ্ধকাম সাধক। নজরুল জীবনী-রচনায় তোমার সাফল্যে গর্বিত আমরা, নন্দিতও। '

—এই সম্মানপত্রটিতেও অগ্নিবীণার ছবি আঁকা আছে।

১৯৮১ ।। বৈদ্যবাটী মালীর বাগান সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রদত্ত সম্মানপত্র ঃ 'হে সংগ্রামী, আপনার স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবদান ও স্বাধীনতা-উত্তর সংগ্রামী জীবন আমাদের প্রেরণার স্বাক্ষর।'

—সম্মানপত্রটিতে জ্বলন্ত প্রদীপ আঁকা। প্রাণতোষের প্রাণময়তার প্রতীক।

১৩৫৫, ১১ জ্যৈষ্ঠ ।। চুরুলিয়ায় নজরুল-অকাদেমির পক্ষে তাঁকে সম্মানপত্র প্রদান করা হয়। সুবৃহৎ এই সম্মানপত্রে এক জায়গায় লেখা আছে ঃ

'কবিকণ্ঠ তোমার মাঝে অনুরণিত হয়ে চুরুলিয়ার আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো। আমরা সেই স্মৃতিক্ষরণ শুনে ভুলে যাবো—ভুলে যাবো—বাঙালীর প্রিয় কবি অজস্র নজরুল কথা কইছে তোমার কণ্ঠে।

'তুমি কবিতীর্থ পুরুলিয়াব মাটির মানুষ না-হলেও আমাদের মনের মানুষ। রাঢ় বাঙলার শ্যামলিমা, মধুভরা বায়ু, মধুক্ষরা নদীধারা, রাঙামাটির অনুরাগ আদিগন্ত প্রান্তরের প্রসার, সীমাহীন নীলিমার সৃষ্টির উল্লাস আর লাবণ্য তোমারও দেহে-মনে-প্রাণে ও আত্মায়।'

—এই সম্মানপত্রটিতেও অগ্নিবীণার ছবি আছে।

'বাংলা-কবিতা সম্মেলন' কর্তৃক আয়োজিত কবি-সংবর্ধনায় বলা হয়েছে ঃ

'হে শব্দের পূজারী, বাংলা-কাব্যের সুনীল নীলিমায় আপনার

উপস্থিতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত।...বাংলা কবিতার কিছু গুণমুগ্ধ অনুরাগী পাঠক আজকের অনুষ্ঠানে আপনাকে সম্মানিত করে নিজেদের ধন্য মনে করছি।'

—এই সম্মানপত্রে অশোক চট্টোপাধ্যায় ও সুশীল রায়ের স্বাক্ষর আছে।

১৩৮০, ১ বৈশাখ ।। চন্দননগর সংস্কৃতি সম্মেলন ও 'ইনস্টিটিউট দ্য চন্দননগর' প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে প্রদত্ত সম্মানপত্র ঃ

'হে বাঁধনহারা নির্ভীক প্রাণ, দেশ-জননীর বন্ধন শৃংখল ছিন্ন করতে বেরিয়েছিলে ; সঙ্গে কে এল না-এল ভাবোনি, পথে কি আছে না-আছে বিবেচনা করোনি ; তোমাদের সাহসিকতা, তোমাদের নীরব নিঃস্বার্থ দেশসেবা ও আত্মোৎসর্গ আজকের অনেকে ভুলতে বসলেও আমরা ভুলিনি, আমাদের মনে তা চির-ভাস্বর।'

১৩৮৩ ।। শ্রীরামপুরবাসী প্রদত্ত সম্মানপত্র ঃ

'হে কবি...নজরুলের বিদ্রোহী বাণীর প্রবক্তারূপে তোমার পথ-পরিক্রমা আজও শেষ হয়নি।...'

১৩৮৪ ।। কলকাতা, ডাফ স্ট্রীট, গীতিমালা মহিলা-সমিতি। প্রজ্ঞানানন্দ-ভবনে সংবর্ধনা ও সম্মানপত্র প্রদান। সমিতির অধ্যক্ষা কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় ও 'জরাসন্ধ'-ভ্রাতুষ্পুত্র রণজিৎ চক্রবর্তীর উদ্যোগ।

সুবৃহৎ সম্মানপত্রটির অংশবিশেষ ঃ

'কবির মত তুমিও শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই সেদিন দেখনি ; দেখেছ, শ্মশানের পথে গোরস্থানের পথে তার ক্ষুধাশীর্ণ মূর্তি, অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা-অত্যাচার-অবিচারের নিদারুণ ব্যথাহত রূপ।...'

৭৩ জন্মদিন। বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

'...হে বিদ্রোহী বন্ধু আমার,
তোমার ঐ প্রাচীন দেহে
তৈরী ক'রে কঠিন বজ্র
তা-ই তুমি তুলে দাও
আমাদের হাতে।...'

৭৬ জন্মদিন। শ্যামলী চট্টোপাধ্যায়।

'জীবনটা যে আলো-আঁধারে ঘেরা,
আলোর তৃষা নিয়ে এগিয়ে চল।
অদূরে পথের শেষে নিশ্চয় আছেন
তোমার জন্যে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ।'

১৩৮৮, ১১ জ্যৈষ্ঠ ।। চুরুলিয়া নজরুল অকাদেমি। 'নজরুল জীবনী-কার' হিসাবে 'নজরুল-পুরস্কার'। অকাদেমি লিখেছেন ঃ

'বরেণ্য শিল্পী, কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৮২তম জন্মতিথির পুণ্যলগ্নে আপনার অসামান্য অবদানের উজ্জ্বল স্বীকৃতিস্বরূপ এই শ্রদ্ধার্ঘ্য উৎসর্গিকৃত হইল। এই অভিজ্ঞান আপনার উত্তরকালের সাধনাকে সমৃদ্ধ করুক।'

শিল্পী কাজী লাল সিদ্দিকির আঁকা বিদ্রোহী-কবির একটি প্রতিকৃতি উপহার দেওয়া হয়। ছবির নীচে লেখা আছে ঃ

'নজরুল-জীবনীকার শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে নজরুল-পুরস্কারের নিদর্শনস্বরূপ কবিতীর্থ চুরুলিয়ার গৈরিক মৃত্তিকা-রঞ্জিত কবি-প্রতিকৃতি নিবেদিত হল।'

উপঢৌকন-স্বরূপ দেওয়া হল, স্টীলের থালা, ধুতি, চাদর, একখণ্ড নজরুল রচনা-সমগ্র ও একহাজার টাকা।

১৯৮১, ১৩ জুলাই ।। পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকার তাঁকে নজরুল-চর্চার পথিকৃৎ হিসাবে চিহ্নিত করেন। তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ আছে ঃ

'শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় সমীপে—

নজরুল-চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে আপনি শ্রদ্ধেয়। আপনার অন্তরঙ্গ রচনার মধ্য দিয়ে মানুষ ও কবি নজরুলের প্রকৃত পরিচয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। জনগণের কবি এবং রাজনৈতিক কর্মী কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভেও আপনি ধন্য। আজ সমগ্র জাতির পক্ষে আপনাকে সম্বর্ধনা জানাই। আপনার দীর্ঘ, সুস্থ ও কর্মময় জীবন কামনা করি।'

তথ্য ও সংস্কৃত বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পরিশিষ্ট—৬

☐ তথ্য ও সত্য ☐

১৯৮৩ সালে 'কলকাতা-২০০০' পত্রিকার পক্ষ হতে সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্ত সাক্ষাৎকার নিতে আসেন। একটি অন্তরঙ্গ ছবি তোলেন এবং ছবির পরিচিতি-প্রসঙ্গে লেখেন ঃ

'নজরুলের যৌবনের বন্ধু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, যাঁকে নজরুল-সম্পৃক্ত দলিল ও বইয়ের চলমান মহাফেজখানা বলে বর্ণনা করা হয়। এঁর সংগ্রহে নজরুলের অনেকগুলি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ আছে যা কোন আধুনিক শিল্প-তস্কর বহু সহস্র ডলার মূল্যে মার্কিন ও বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিক্রি করতে পারেন। প্রাণতোষ ও নজরুল একসঙ্গে বিদ্রোহের ভাবনায় দীক্ষিত হন; পরে নজরুল বদলালেও প্রাণতোষ বদলাননি। ছবিই প্রমাণ, না-আছে তাঁর আঙ্গুলে আংটি, না-আছে নধর তনুতে পৈতে।'১

এই পত্রিকাতেই সাংবাদিক রঞ্জন সেন 'নজরুল-সংস্কৃতির ভক্ষক ও রক্ষক' এক আঁটোসাটো প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

'নিতাই ঘটকের স্মৃতিচরণ সংযোজনের আগে আর-একটি আশ্চর্য মানুষের কথা বলতে চাই। তিনি হলেন—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। যাঁর ঠিকানা পেয়েছিলাম নিতাই ঘটকের ডায়েরি থেকে।' রঞ্জন আরও লিখলেন ঃ

'প্রাণতোষ নজরুল-বিষয়ে ভুল তথ্য একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না। 'নন্দন'-পত্রিকায় সরোজমোহন মিত্র লিখলেন, নজরুল মদ খেয়ে মাতলামি করতেন। কিন্তু আমরা যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি তাঁরা জানি, সাজা-পান খেলেও নজরুলের পান-দোষ ছিল না।'২

একবার কবি বিষ্ণু দে-র অনুরোধে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মী জরাসন্ধের ভাইপো রণজিৎ চক্রবর্তী-সহ তাঁর কাছে আসেন টেপ-রেকর্ডার নিয়ে। তাঁরা প্রাণতোষকে নজরুল-সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেন এবং প্রাণতোষ তার উত্তর দেন। নজরুলের 'ঝড়' ও

'মানুষ' কবিতা দুটি আবৃত্তি করেন। ছবি তোলেন। দলটি নানা গুণিজনের সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি প্রাণতোষের সাক্ষাৎকারটিও টেপ-রেকর্ডারে ধরে রেখেছেন। এ এক দুর্লভ সংগ্রহ।

---

১ কলকাতা-২০০০—প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৩

২. ঐ —পৃ. ৫২ এবং ৫৪

"শোকাচ্ছন্ন হওয়া একটা আত্মবিলাপের ব্যাপার। তাই নিজের পতাকা এবং নিজের ওপর নির্ভর করে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে যাবার কথা কবি বলেছেন। নজরুলের 'লয়' হতে পারে না। তিনি তাঁর লেখনীর মধ্যে বেঁচে থাকবেন। বেঁচে থাকবেন নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত, সর্বহারা মানুষের মধ্যে যারা, জমিতে চাষ করেও অনাহারী; কাপড় বুনেও নগ্ন, দুটি হাত যার সম্বল, তার শ্রম বিক্রয় করেও সন্তান-সন্ততি পরিবার নিয়ে পাঁকের মধ্যে বস্তির স্বাস্থ্যহীন আবহাওয়ায় বাস করছে; শিক্ষার আলো যাদের কাছে দূর অস্ত, যারা 'ব্যথার সাঁতার-পানী' পার হতে পারছে না জীবনের ভেলা ঠেলে-ঠেলে, —নজরুল তাদের কবি বলেই অ-মৃত।

—জীবনের এই অনিবার্য মৃত্যু কিছু বড় কথা নয়; বড় কথা হল সেটাই যাঁরা শ্রেষ্ঠ বানী দিয়ে যান, সেই বানীকে অনুসরণ করা। চরিত্রে-কাজে-অভ্যাসের মাধ্যমে তাকে ফুটিয়ে তোলা। তা না করে মৃত্যুকে বড় করে তোলার মধ্যে একটা আফিমের নেশা আছে। যে নেশায় কবির শোষিত মানুষকে ভালবাসার কথাটাকে ভুলিয়ে অন্যদিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা প্রকট হয়ে উঠেছে, যাতে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের জীবনের রূপান্তর না ঘটে।

আজ মৃত্যুঞ্জয়ী নজরুলের গান গেয়ে, কবিতা-প্রবন্ধ পড়ে দৃঢ়পায়ে, দৃঢ়মনে, গ্রামে-গঞ্জে-বস্তিতে গিয়ে মেহনতী মানুষকে উদ্বোধন করতে হবে। —বীরের মত মাথা তুলে যেদিন জাগ্রত মনুষ্যত্বে আমরা শোষণমুক্ত সমাজ-প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হতে পারব, সেদিনই আমাদের 'নজরুল-স্মরণ' সার্থক হবে।" —প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'মৃত্যুঞ্জয়ী নজরুল'। নজরুল অকাদেমি পত্রিকা· ৮০ জন্মজয়ন্তী সংখ্যা ১৯৭৯।

পরিশিষ্ট ৭

বংশতালিকা

□ পিতৃবংশ □

- বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় (ঢাকা)
  - মনসাচরণ
    - রাজবিহারী [দুই স্ত্রী]
      = রাজরাজেশ্বরী [দ্বিতীয় পক্ষ]
      - মণীন্দ্রনাথ
      - কুঞ্জবিহারী
      - প্রাণতোষ [১৯০৫—]
        = সুষমা (উষা) [১৯১৮—]
        - গৌরী [১৯৪৭—]
          = যাদব দে [২২-৭-১৯৪৩—]
          - নন্দিতা
          - অরিন্দম
        - ভারতী [বয়স ছয়, মৃত]
        - আরতি [১৯৫৩—]
          = মাণিক বন্দ্যোঃ [৮-১১-১৯৪৮—]
          - শিবনাথ
          - দেবরাজ
      - পরিতোষ (অবিবাহিত) [১৯১২ - ২২ মার্চ ১৯৮৯]
    - বনবিহারী
    - মধুসূদন
  - শিবচরণ

পরিশিষ্ট—৮

□ নজরুল-পুরস্কার □

[নজরুল-অকাদেমি, চুরুলিয়া]

১৯৮০ ।। দিনেশ দাস, কল্পতরু সেনগুপ্ত, আঙুরবালা দেবী

১৯৮১ ।। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, ইন্দুবালা দেবী

১৯৮২ ।। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আজাহারউদ্দীন খান

১৯৮৩ ।। নিতাই ঘটক, আবদুল কাদির (বাংলাদেশ)

১৯৮৪ ।। জগৎ ঘটক, সোহারাব হোসেন (বাংলাদেশ)

১৯৮৫ ।। ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, রফিকুল ইসলাম (বাংলাদেশ)

১৯৮৬ ।। সুপ্রভা সরকার, সেখ লুতফর রহমান (বাংলাদেশ)

১৯৮৭ ।। বিমান মুখোপাধ্যায় (নজরুল-গীতিকার)
ও সুশীলকুমার গুপ্ত (নজরুল-সাহিত্য গবেষক)

১৯৮৮ ।। সুকুমার মিত্র
জনাব শাহাবুদ্দিন আহ্‌মদ (নজরুল-সাহিত্য-গবেষণা)

১৯৮৯ ।। ধীরেন বসু, ফেরদৌসী রহমান (বাংলাদেশ) □

"নজরুল-অকাদেমি (কলকাতা) প্রতি বছর দু'তিনজন করে নজরুল-গীতির শিল্পীকে কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে সংবর্ধনা দিতেন। সংবর্ধনা দিয়েছেন—আঙুরবালা দেবী, ইন্দুবালা দেবী, কমলা ঝরিয়া, রাধারানী দেবী, যূথিকা রায়, কমল দাশগুপ্ত, জগৎ ঘটক, নিতাই ঘটক, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সুপ্রভা সরকার প্রমুখ গুণিজনকে। জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত অকাদেমির স্মারক পত্রিকাগুলি কবির মূল্যায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

অকাদেমির প্রধান সংগঠক কল্পতরু সেনগুপ্ত চুরুলিয়ায় নজরুল-স্মৃতিরক্ষা ও নজরুল-চর্চার দিকে অধিক উৎসাহ প্রকাশ করেন। চুরুলিয়ার 'নজরুল-মেলা'-র পরিকল্পনা ও উৎসাহ তাঁরই।"

—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। কাজী নজরুল, তৃতীয় পর্ব, পৃঃ ৪৪-৪৫